দেবী চৌধুরাণী

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

ভূমিকা

১. সূচনা : উৎস, পাঠান্তর, পরিমার্জন।

'ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন' প্রথম ভাগে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,

'অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সে ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 'জীবন লইয়া কি করিব?'—এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি।"

যে সময় বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে এই উত্তর খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তখন জীবনের শেষ পর্ব। যদিও তাঁহার আয়ুষ্কাল মাত্র ৫৬ বৎসর (১৮৩৮-১৮৯৪) এবং মৃত্যুকালে তিনি কেবল যৌবন অতিক্রম করিয়াছেন, তবু জীবন সম্পর্কে এই উপলব্ধি তাঁহার প্রবৃদ্ধ মননের উপলব্ধি। এই উপলব্ধির ফলস্বরূপ তিনি যে 'ত্রয়ী' [আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭)] উপন্যাস রচনা করেন, সেই ত্রিরত্নের ভিতর দেবী চৌধুরাণী মধ্যম রত্ন। এ রত্ন খনি হইতে সদ্যসমাহৃত রত্ন নয়, একজন বলিষ্ঠ চিন্তানায়কের মননের প্রাখর্যে শাণিত শিল্পিত রত্ন। দেবীরাণী যেমন অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের হাতে গড়া 'শাণিত অস্ত্র', 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসখানিও তেমনই বলিষ্ঠ জীবন-বোধে উদ্দীপ্ত বহুশ্রুত অনুশীলিত পরিণত বঙ্কিম-মানসের শাণিত অস্ত্র।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে (কটক) ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখনই এই উপন্যাস রচনার সূচনা। অনুশীলনতত্ত্ব বাদে 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের তিনটি বিশিষ্ট দিক আছে : ১. বাংলাদেশের পারিবারিক জীবন, ২. ভবানী পাঠক ও

দেবী চৌধুরাণীর ঐতিহাসিক অনুবৃত্তি, এবং ৩. উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর অঞ্চলের স্থানিক পট। উপন্যাসে পারিবারিক জীবনকে গুরুত্ব দেওয়ার পশ্চাতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রেরণা সঞ্চার করিয়া থাকিবে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গ্রন্থে লেখকের নাম ছিল না। এই সময় জাজপুর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবকে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পারিবারিক প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।[১] একটি পত্রে তিনি বলেন,

"The whole book is one grand hymn to the holiest of human affections.......The inherent excellence of our domestic institutions, and the true greatness of our women preserve our domestic life from disintegration."

আর একটি পত্রে তিনি লিখেন, "It enables a man to make his life sweeter to himself and to others."

পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলিবার যে ইঙ্গিত ভূদেব দিয়াছেন প্রবন্ধে, বঙ্কিমচন্দ্রও সেই ইঙ্গিত দিয়াছেন উপন্যাসে। উভয়ের ভাবানুষঙ্গ লক্ষ্য করিবার মত।

উপন্যাস রচনার সূচনা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হইলেও, উপন্যাসের কাহিনী-পরিকল্পনার উন্মেষ সম্ভবতঃ তাহারও অনেক পূর্বে। ১৮৭১-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরবঙ্গ রাজসাহী কমিশনারের পার্সন্যাল এ্যাসিষ্টাণ্ট ছিলেন।[২] এই সময়েই তিনি সরকারী কাগজপত্রে এবং গভর্ণমেণ্ট-প্রচারিত Statistical Accounts of Bengal হইতে উত্তরবঙ্গের ভবানীপাঠক-দেবীচৌধুরাণীর ঐতিহাসিক বিবরণ দেখিয়া থাকিবেন। ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচারের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে এডমণ্ড বার্কের বিখ্যাত বক্তৃতা 'The Impeachment of Warren Hastings' গ্রন্থ হইতে। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও উল্লেখ করিয়াছেন, "তারপর আবার দেবীসিংহের ইজারা। পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্ট্‌ মিনিষ্টর হলে দাঁড়াইয়া এদ্‌মন্দ্‌ বর্ক সেই দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্বতোদ্‌গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক, দেবীসিংহের দুর্বিবহ অত্যাচার অনন্তকাল সমীপে পাঠাইয়াছেন।" (দেবী চৌ. ১/৮)।

১. Essays and Letters (Bankimchandra Chatterjee): Centenary Edition, Bangiya Sahitya Parishad.

২. দ্রষ্টব্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্যসাধক চরিতমালা

উত্তরবঙ্গের স্থানিক পটের চিত্রাঙ্কনে, বিশেষতঃ বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের বর্ণনায় তিনি **Hunter**-এর বিবরণকেই ভিত্তি করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কিছুদিন তিনি মালদহের রোডসেস্ কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের জল-জঙ্গলের সঙ্গে এই সময়ে হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের চাক্ষুষ পরিচয় হইয়াছিল। কারণ, উপন্যাসে তিনি নিজেই বলিয়াছেন,

'যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।"

'দেবী চৌধুরাণী'র প্রথম দুইটি খণ্ড প্রথমে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, 'দেবী চৌধুরাণী' পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আকারে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র রচনার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের জন্য গ্রন্থের কোন কোন অংশের পরিবর্তন, পরিবর্জন বা পরিবর্ধন করিতেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'দেবী চৌধুরাণী' হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'দেবী চৌধুরাণী'র পার্থক্যও অল্প নয়। গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রফুল্ল। এই প্রফুল্লকে আদর্শ নারীরূপে চিত্রিত করাই ছিল লেখকের লক্ষ্য। এইজন্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রফুল্ল' হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'প্রফুল্ল' যেন আরও গভীর, গম্ভীর ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ঃ

(১) বঙ্গদর্শনে দেখা যায়, প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী যাত্রাকালে তাহার মা যখন তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলেন, তখন, "প্রফুল্ল বলিল, 'না থাক্। কি অবস্থায় আমাকে রাখিয়াছে তা তাহারা দেখুক।"

উপন্যাস-আকারে প্রকাশিত গ্রন্থে চিত্রটি এইরূপ ঃ

"তাহার মাতা বলিল, 'আয় তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।'

প্রফুল্ল বলিল, 'না, থাক্।'

মা ভাবিল, 'থাক্। আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না।'

মেয়ে ভাবিল, 'থাক্। সেজেগুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি!'

[বঙ্গদর্শনের প্রফুল্ল-চরিত্রে শ্বশুরবাড়ীর বিরুদ্ধে যে তীব্র অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রফুল্লে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। পরবর্তী প্রফুল্ল বিক্ষুব্ধা নয়, আত্মপ্রত্যয়ে অপ্রগল্‌ভা।]

(২) বঙ্গদর্শনে নয়নতারার সঙ্গে প্রফুল্লর প্রথম সাক্ষাৎকারে উভয়ের মনোভাব

এইরূপ : 'প্রফুল্ল ও নয়নতারার চারিচক্ষে দেখাদেখি হইল। যেমন ব্যাঘ্র ও শিকারী দুইজনে পরস্পরে চাহে—কে কাহার প্রাণবধ করিবে—সেইরূপ দুইজনে পরস্পরের প্রতি চাহিল, দুইজনেই বুঝিল, 'এই আমার পরম শত্রু।'

গ্রন্থাকার উপন্যাসে এই অংশ সম্পূর্ণ পরিবর্জিত। বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে আদর্শ বধূরূপে চিত্রিত করিবেন, সেই প্রফুল্ল পরিবারের কাহাকেও শত্রু ভাবিতে পারে না। উপন্যাসে প্রথম সাক্ষাতে প্রফুল্লের মুখে কোন কথাই নাই। নয়নতারাও যেন প্রফুল্লের সৌন্দর্য দেখিয়া সংশয়িত। পুস্তকাকার উপন্যাসে সাক্ষাৎকার অধিক শিল্প-সঙ্গত।

গ্রন্থাকারে 'দেবী চৌধুরাণী' প্রথম প্রকাশিত হইবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় ইহার ছয়টি সংস্করণ হইয়াছিল। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে গুরুতর কোন পরিবর্তন না থাকিলেও পরিবর্তন আছে। অনেকস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি মন্তব্য বর্জন করিয়াছেন। একটি স্থলের পরিবর্তন প্রফুল্ল-চরিত্রের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম সংস্করণে সাগরের সহিত প্রফুল্লের দেখা হইবার পরে স্বামীর সঙ্গে দেখা করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে সাগরের পক্ষ হইতে :

সা। একবার দেখা করবে না ?

প্র। কার সঙ্গে ? তোমার সঙ্গে ?

সা। দূর ! যেন হাবি। শ্বশুর বাড়ী এসে কি কেবল সতীনের সঙ্গে দেখা করতে হয়, আর কার সঙ্গে দেখা যেন করতে হয় না।

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই সে হাসি নিবিয়া গেল। বলিল, বুঝি নাই ভাই—স্বামীর সঙ্গে ? তা কি কপালে ঘটিবে ?

সা। আমি ঘটাইব।

কিন্তু ষষ্ঠ সংস্করণে স্বামীর সঙ্গে দেখা করিয়া জন্ম সার্থক করিবার সজল অনুরোধটি আসিয়াছে প্রফুল্লের দিক হইতে :

প্র। যদি তুমি আমার জন্ম সার্থক করাইতে পার।

সা। সে কিসে হবে ভাই ?

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই সে হাসি নিবিয়া গেল, চক্ষে জল পড়িল। বলিল, 'বুঝ নাই ভাই ?'

সাগর তখন বুঝিল।

[যে প্রফুল্লর নিকট স্বামিসঙ্গ তীর্থ করার সামিল, যে প্রফুল্ল নিশিকে বলিয়াছে, 'স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না'—শ্বশুর বাড়ী আসিয়া সেই স্বামি-সন্দর্শন করিবার প্রস্তাব প্রফুল্লর তরফ হইতে আসাই অধিক সঙ্গত।]

পর পর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের এই ধরনের পরিমার্জন সাহিত্যের সচেতন সাধক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসখানির ইংরাজী অনুবাদও করিয়াছিলেন। সে অনুবাদের সমগ্র অংশ পাওয়া যায় নাই। কেবল তৃতীয় খণ্ডের শেষ কয়েকটি পরিচ্ছেদের কোন কোন অংশের পাদটীকা সম্বলিত অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে।[১] মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এই অনুবাদটি করিয়াছিলেন ইংরাজ-পাঠকদিগকে লক্ষ্য করিয়া। এইজন্যই তিনি প্রয়োজনবোধে পাদটীকায় কোন কোন শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, যেমন, ***Palki*** **: native conveyance borne by men.** ***Dakini*** **: A witch.**

ইংরাজী অনুবাদে লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্‌ চরিত্রটিও একটু ভিন্নতর চিত্রিত হইয়াছে। বাংলা সংস্করণে সাহেবের বাঙালীকে হেয় করিয়া দেখিবার প্রবণতা দেখা যায় এবং সাহেব চরিত্রে ইংরাজসুলভ দম্ভ, ঔদ্ধত্য ও অহমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজী অনুবাদে সাহেব-চরিত্র অনেকটা সংযত। যথা,

(১) [হরবল্লভের কান্না শুনিয়া সাহেবের উক্তি] "সাহেব ধমকাইল, রোও মৎ উল্লুক। মর্‌না একরোজ আলবৎ হ্যায়।"

ইংরাজী তর্জমায় সেখানে আছে, **"Don't cry, you coward", thundered the lieutenant—"You are old—why can't you make up your mind to die?"**

(২) [বাংলা সংস্করণে দেখা যায়, দেবীর নির্দেশে সাহেবকে ছাড়িয়া দিবার সময় রঙ্গরাজ বলিল,] "আমরা কাহাকে ফাঁসী দিই না।...তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।"

সাহেব প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল—তারপর ভাবিল, 'ইংরেজকে ফাঁসী দেয়, বাঙালীর এত কি ভরসা?"

[তাহার পর রঙ্গরাজ সাহেবকে পাথেয় দিল এবং আহতদের সেবার্থে দেবীরাণীর দানের প্রতিশ্রুতির কথা শুনাইল।]

১ **Essays and Letters (Bankimchandra Chatterjee): Centenary Edition, Bangiya Sahitya Parishad.**

"সাহেব বিশ্বাস করিল না, ভালমন্দ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।"

ইংরাজী অনুবাদে এস্থলে সাহেবের চিন্তাধারাটি যেন স্বতন্ত্র : "The lieutenant doubted very much in his mind whether these were robbers at all."

ইংরাজী তর্জমায় বিশেষভাবে লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, বাঙালী জীবনের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতির পরিস্ফুটনে। ইংরাজের কাছে বাঙালীর সমুন্নত জীবনখানি তুলিয়া ধরাই যেন বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য। তাই কোথাও পাদটীকায় তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "According to the Hindu Shastras the wife ought to be younger than the husband." কোথাও বা গ্রন্থমধ্যেই তুলিয়া ধরিয়াছেন; বাঙালীর 'বধূবরণে'র এই তাৎপর্য,

"The arrival of a newly married bride is always an event in a Bengali Village.......It is usual, at this stage, for the lady of the house to go through certain ceremonial forms indicative of affection towards the new daughter-in-law. One of these is called *Varana.* During the *Varana* the bride stands veiled by the side of her husband. The lady of the house lifts the veil from the face to judge of the loveliness or otherwise of her face—for beauty is generally, in the eyes of the feminine portion of the Bengali population, the highest perfection which a bride can possess.

[বাংলা সংস্করণে এই ধরনের টীকা বা বর্ণনা নাই।]

নিষ্কাম ধর্মের অনুশীলন দ্বারা পারিবারিক জীবনকে কিভাবে সর্বপ্রকারে সুখী করা যায়, 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের এই মূল আদর্শটি, বাংলা সংস্করণ অপেক্ষা ইংরাজী অনুবাদে সমধিক প্রস্ফুটিত হইয়াছে। পারিবারিক জীবনে সন্তান পালন ও শিশুশিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলা সংস্করণে এই দিকটি উপেক্ষিত। কিন্তু ইংরাজী তর্জমায় প্রফুল্লের শিশু-জীবন গঠনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আছে :

"Devi had now many children whom she brought up with special care. To the boys she taught truth, manliness, courage—pretty much after the fashion Bhabani Pathak had followed in her case. To the girls she imparted the feminine culture which had been hers by nature, and which had been improved by the refining influence of her great love of the Pure and Holy."

বিভিন্ন সংস্করণের এই সকল পরিবর্তন ও পরিমার্জন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে,

বাঙালী সমাজের প্রতি একটি সুকঠিন কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। বাঙালী পরিবারকে কিভাবে সর্বতোভদ্র আদর্শ পরিবারে পরিণত করা যায়—ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য

২. "দেবী চৌধুরাণী" পারিবারিক উপন্যাস

'দেবী চৌধুরাণী' কোন্ শ্রেণীর উপন্যাস, ইহা বিচার করিতে গিয়া, অধিকাংশ সমালোচক ইহাকে 'তত্ত্বমূলক উপন্যাসে'র পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-বিচারে এই বিভাগটি বিতর্কের বিষয়। কারণ, তাঁহার সমস্ত উপন্যাসই কোন না কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত। তিনি সাহিত্যের 'কর্মযোগী'। লোকশিক্ষা বা মনুষ্যের চিত্তের উৎকর্ষ সাধনকে তিনি সাহিত্য-রচনার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহার সৃষ্টি মুহূর্তের ভাবাবেগ নয়, সুদীর্ঘ মননের ফসল; উহা শুধু সুন্দর নয়, সত্য-শিবের বিগ্রহ। মানুষের কল্যাণ-মাঙ্গল্যের গুরু দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার রচনা তত্ত্ব-প্রণোদিত হইতে বাধ্য। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা মাত্রই তাত্ত্বিক; শ্রেষ্ঠ শিল্প মাত্রই তত্ত্ববহ।

মিষ্টত্ব মধুর সাধারণ গুণ। উহার প্রকারভেদ স্বাদের তারতম্যে ও বর্ণের বৈচিত্র্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ তত্ত্ব; উহাদের শ্রেণীভেদ আবহের পার্থক্যে। প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌন্দর্য উদয়-সূর্যের কিরণে একরূপ দেখায়, সেই ফুলটিকেই ভিন্নতর দেখায় অস্তসূর্যের ম্লানিমায়। আমরা একটিকে বলি ভোরের কুসুম, আর একটিকে সন্ধ্যার ফুল। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর মনুষ্য জীবনের স্ফূর্তিকে প্রকাশ করাই বঙ্কিম-রচনার মূল লক্ষ্য। এই জীবনকে কখনও তিনি দেখাইয়াছেন ইতিহাসের রশ্মিছটায়, কখনও তাহাকে স্থাপন করিয়াছেন গৃহজীবনের পটে, কখনও বা সমাজে, কখনও রাষ্ট্রভূমিতে। পরিবেশের এই বর্ণবিন্যাসে উপন্যাসের বর্ণ বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে, স্বাদেও তাহা হইয়াছে ভিন্নপ্রকার। এই ভাবেই 'বিষবৃক্ষ' সামাজিক, 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস হইয়া উঠিয়াছে। এইদিক হইতে 'দেবী চৌধুরাণী'কে বলা যায় গার্হস্থ্য উপন্যাস।

'দেবী চৌধুরাণী'র সূচনা হইতে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত পরিবার-জীবনের কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। গ্রন্থের সূচনায় দরিদ্রা মায়ের কণ্ঠে "ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী" ডাকের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দারিদ্র্য-পীড়িত একটি গৃহের

নিদারুণ অভাবের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সে গৃহের মাতা ভিক্ষোপজীবিনী, কন্যা ভাগ্যহতা শ্বশুর-পরিত্যক্তা। সে কন্যার সব থাকিয়াও কিছুই নাই। সমস্যাটি একান্ত পারিবারিক। গার্হস্থ্য নিয়মে বধূর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শ্বশুরের ও স্বামীর। কাজেই বধূ সেই দাবী লইয়া শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিল। সেখানে সে এক রাত্রির জন্য স্বামি-সঙ্গ লাভ করিল বটে, তবু প্রত্যাখ্যাতা হইল। এইভাবেই উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে। মাঝখানে ঘটনা পরিবার-জীবন হইতে কিছুটা কেন্দ্রচ্যুত হইলেও, উপন্যাস সমাপ্ত হইয়াছে বিতাড়িতা বধূরই গৃহজীবনে প্রতিষ্ঠার বিষয় লইয়া। লেখকও গ্রন্থশেষে সিদ্ধকামা এই বধূকেই অভিনন্দিত করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন,

"এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন'।"

উপন্যাসের মধ্যপথে কাহিনী মূল পরিবাব-জীবন হইতে দূরে সরিয়া গেলেও, পারিবারিক জীবনের চিত্র সেখানেও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। বৈষ্ণব কৃষ্ণগোবিন্দের ঘরখানিতেও পরিবার-জীবনের পরিবেশ,

"সে ঘরে জলকলসী আছে, কলসীতে জল আছে, জলপাত্র আছে।"

"বাড়ীতে গোহাল আছে—গোহালে গরু আছে।"

সেখানে বৃদ্ধের তামাকু সেবনের উপকরণ 'সোলা, দিয়াশলাই' আছে, গৃহস্থঘরের ব্যবহারোপযোগী 'শাবল, কোদালি' আছে। অর্থাৎ ঘরটি গৃহস্থেরই ঘর। বৃদ্ধের সুন্দরী তরুণী ভার্যা লইয়া সে ঘরে গৃহস্বামীর চিন্তাও আছে।

ভবানী পাঠকের নিকট শিক্ষাগ্রহণকালে প্রফুল্ল যে পরিবেশে কাল কাটাইয়াছে, তাহাও গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশ। সেখানে সর্বস্ব কৃষ্ণে সমর্পণের প্রশ্নে 'হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা'—এই সত্য বড় হইয়া দেখা দেয়। অনুশীলনধর্মে শিক্ষার্থিনী প্রফুল্ল সেখানে গুরুর আদেশ অমান্য করিয়া সধবা গৃহবধূর নিয়ম পালন করে,

"একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত—গোবরার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খানা, ডোবা, বিল, খালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত, সুতরাং গোবরার মা হাট হইতে একাদশীতে মাছ আনিতে আর আপত্তি করিত না।"

ডাকাইতি করিবার কালেও দেবীরাণীর বজরায় পারিবারিক জীবনের কোলাহল উঠিয়াছে। তাঁহার বৃহৎ বজরা যেন রাণীর সংসার। সেখানে কর্ত্রী 'এক কাণা

কড়ি'র বিনিময়ে দাস ক্রয় করে, ক্রীতদাস কোন্ কোন্ কাজে পারদর্শী, তাহার হিসাব লয়। সেখানেও মানান্তে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটে; 'বোনাই-কুটুম্বকে' স্বস্থানে পাইয়া তদুপযোগী মর্যাদা দান করা হয়। এমনকি অতিশয় সঙ্কট মুহূর্তেও কুলীন কন্যাকে পালটি ঘরে বিবাহ দিবার জন্য কথা পাড়া হয়। সর্বোপরি যিনি রাণী, তাঁহার মন ডাকাইতিতে নয়—সন্তান-পালনে, স্বামিদর্শনে অশ্রুস্নানে; তাঁহার দীক্ষা সন্ন্যাসে নয়, সংসারের কর্মসন্ন্যাসে; তাঁহার বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা পতি, শ্বশুর ও পরিজন-রক্ষণে। বস্তুতঃ দেবীর দস্যু-জীবন 'প্রফুল্ল শ্বশুর বাড়ী চলিল'—এই বাক্যটিকে সার্থক করিবার জন্য।

তবে একথা ঠিক যে, 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রচারিত 'ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন'-এর প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ধর্মতত্ত্বের পাদ টীকায় বলিয়াছেন,

"লেখক-প্রণীত 'দেবী চৌধুরাণী' নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণস্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে।"[১]

এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে অনুশীলন তত্ত্বের যে অংশ উদাহৃত হইয়াছে, তাহা পারিবারিক জীবন-গঠনের অংশ। অনুশীলনের লক্ষ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ। অনুশীলিত মানুষই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভ্রান্ত পথে চালিত করিতে পারে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য মনুষ্যে প্রীতি। এই প্রীতির প্রথম স্ফুরণ পরিবারে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,

"পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেননা, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি। পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগে স্বতঃই প্রবৃত্ত, এইজন্য পরিবার হইতে প্রথম প্রীতি-বৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই।"[২]

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রীতি-অনুশীলনের প্রথম ক্ষেত্ররূপে এই পরিবার-জীবনকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পরিবার-জীবনে প্রীতি প্রতিষ্ঠিত না হইলে সম্প্রসারিত জাগতিক প্রীতি লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি ধর্মতত্ত্বে (দশম অধ্যায়) বলিয়াছেন, গৃহ নানা কারণে দূষিত হয়,

"গৃহমধ্যে যাহারা নিম্নস্থ, তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা-মাতাকে পুত্র-কন্যা বা বধূ ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে,

---

১. ধর্মতত্ত্ব (প্রথম ভাগ), অষ্টম অধ্যায়।

২. তত্রৈব—একবিংশতিতম অধ্যায়।

যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে···তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই—সে গৃহ নরক বিশেষ।”

উপন্যাস মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, জমিদার হরবল্লভ রায়ের গৃহও প্রায় নরক সদৃশ। ‘হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড’। তিনি আদর্শ গৃহকর্তা নহেন। শুধু জনাপবাদ শ্রবণে তিনি গৃহবধূকে গৃহে স্থান দেন নাই; বেহাইয়ের অর্থলোভে পুত্রের আর এক বিবাহ দিয়াছেন। লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহবধূকে তিনি বলিয়াছেন, চুরি-ডাকাইতি করিয়া পেট চালাইতে। সে গৃহে সপত্নীদের ভিতরেও সম্ভাব নাই। কথায় কথায় কোন্দল। কোন কোন পত্নীর পতির উপরেও শ্রদ্ধা নাই। স্বামীর জন্য সে ‘মুঁড়ো ঝাঁটা’ তুলিয়া রাখে। এমনকি সে গৃহে আতিথ্যেরও অভাব।

এই বিপর্যস্ত বিশৃঙ্খল-গৃহে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছে অনুশীলিতধর্মা প্রফুল্ল। সাগর প্রফুল্লকে প্রশ্ন করিয়াছিল, ‘রাণীগিরির পর কি বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে?’ প্রফুল্ল উত্তর করিয়াছিল, “এই ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম।···কঠিন ধর্মও এই সংসার ধর্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

প্রফুল্লের জীবন এই বাণীর কর্মমূর্তি; হরবল্লভ রায়ের গৃহ ইহার প্রয়োগ ক্ষেত্র। সমগ্র ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসেরও মূল লক্ষ্য সুস্থ পারিবারিক জীবনের সংগঠন ও পারিবারিক প্রীতির স্ফুরণ। অনুশীলনতত্ত্ব তাহার সহায়ক মাত্র।

৩. সামাজিক পরিবেশ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার লইয়াই সমাজ। পরিবার ও সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজের প্রথা ও মতামত দ্বারা পরিবার নিয়ন্ত্রিত হয়। ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাসের পারিবারিক জীবনও সমাজের প্রভাবে গভীরভাবে আলোড়িত হইয়াছে।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই উপন্যাসের গ্রাম্য প্রতিবাসীদের সমাজ। ‘বঙ্গে প্রতিবাসী মাত্রই দুরাত্মা’—অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের এই মন্তব্য অনুজ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যেন জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রতিবাসীরা স্বার্থান্ধ ও সঙ্কীর্ণ। স্বার্থের সামান্য প্রতিঘাতে তাহারা প্রতিবাসীর ভয়ঙ্কর ক্ষতি করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। জমিদার হরবল্লভ যে বধূ প্রফুল্লকে গৃহে স্থান দেন নাই, তাহার কারণ, প্রতিবাসীদের অপপ্রচার।

প্রফুল্লের মা যথাসাধ্য ব্যয় করিয়া বরযাত্রদিগের লুচিমণ্ডায় ফলাহার করাইয়াছিলেন, 'কিন্তু কন্যাযাত্রগণের কেবল চিড়া দই।' ইহার ফল কন্যাগৃহে প্রতিবাসীদের ভোজন প্রত্যাহার এবং কন্যার শ্বশুরগৃহে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান। শুধু তাই নয়, প্রফুল্লের মা জাতিভ্রষ্টা—এই অপবাদ প্রচার। হরবল্লভ রায় জমিদার হইলেও সমাজের অধীন। ইহার ফল শ্বশুরগৃহ হইতে প্রফুল্লের নির্বাসন (১/২)।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, গ্রাম-প্রতিবাসী দুরাত্মা হইলেও, প্রতিবাসীর মৃত্যুতে তাহারা শত্রুতা ভুলিয়া যায়। 'বাঙ্গালীরা এ সময়ে শত্রুতা রাখে না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে।' প্রফুল্লের মার মৃত্যুর পর 'পাড়ার পাঁচজন' আসিয়া তাহার সৎকার করিল। তাহারাই তাহার শ্রাদ্ধের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দিল, ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্যোগ করিল—এমনকি হরবল্লভ রায়কেও বুঝাইতে চেষ্টা করিল, প্রফুল্লের মা জাতি-ভ্রষ্টা নয়; এরূপ রটনা 'পাড়াপড়সীতে' গোলযোগের ফল মাত্র (১/৭)।

গ্রাম্য সমাজের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের অন্যত্রও দেখাইয়াছেন। জামাই শ্বশুরবাড়ী আসিলে পাড়ার জেলে-গোয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া মেয়ে মহল পর্যন্ত কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, ব্রজেশ্বরের 'সাগরের বাপের বাড়ী'তে আগমন উপলক্ষ্যে তাহা দেখানো হইয়াছে। 'মাছমহলে ভারি হুটাহুটি', 'গোয়ালার মাথা বেঠিক', 'কাপড়ের ব্যাপারী' নাজেহাল। সর্বাপেক্ষা ব্যতিব্যস্ত মহিলা সমাজ: 'পাড়ার মেয়েমহলে বড় হাঙ্গামা পড়িল' (২/২)।

যেমন জামাতার শ্বশুরালয় আগমনে, তেমনই কোন গৃহে নববধূর আগমনে বৌ দেখিবার জন্য পাড়ার মেয়েদের চঞ্চলতা। অশ্বঘোষ-কালিদাসের কাল হইতে পুরসুন্দরীদের 'ত্যক্তান্য কার্যাণি বিচেষ্টিতানি'—এই ব্যাকুল বিচেষ্টা প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী সমাজের পরিবেশে বঙ্গীয় মহিলাদের সেই ব্যাকুল বিচেষ্টার জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন (৩/১২)।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত হইয়াছে বঙ্গীয় কুলীন সমাজের আলেখ্য। কুলীন সমাজে বরের মর্যাদার প্রশ্ন ছিল প্রধানভাবে গণনীয়। 'কুলীনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচার্যের 'বিদায়' বা 'মর্যাদা' গ্রহণে লজ্জা ছিল না।" দেবীও ব্রজেশ্বরকে এই মর্যাদার কথা বলিয়াছে। 'আপনি কুলীন—আপনারও মর্যাদা রাখা আমার কর্তব্য'—এই বলিয়া সে ব্রজেশ্বরকে মোহরপূর্ণ রূপার কলসী দান করিয়াছে (২/৮)। নিশির ভগ্নীর কুলরক্ষার জন্য ব্রজেশ্বরের সঙ্গে বিবাহের কথা পাকা করিয়া হরবল্লভ পুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন, 'তুমি ছেলে মানুষ নও—কুল, শীল,

জাতি, মর্যাদা, সব আপনি দেখে শুনে বিবাহ করবে' (৩/১০)। মর্যাদার নামে কুলীন সমাজের এই অর্থলোলুপতা বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন।

কুলীনের বহুবিবাহ প্রথা লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্কিম কটাক্ষ পরিহাস-রসিকতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ব্রজেশ্বরের তিন সংসার। ব্রহ্মঠাকুরাণীর উক্তিতে শোনা যায়, 'তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল' (১/৫)। হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের তিন সংসার সত্ত্বে আর এক বিবাহ করিবার কথা বলিয়াছেন এই অজুহাতে, 'কুলীনের কুলরক্ষা কুলীনেরই কাজ' (৩/১০)। কিন্তু এই বহুবিবাহে যে গভীর বেদনার দিক ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যের অন্তরালে সে দিকেও অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছেন। অনেক বয়স পর্যন্ত কুলীন কন্যার অবিবাহিত থাকার প্রসঙ্গও বাদ যায় নাই। নববধূরূপিণী প্রফুল্লের বয়স লইয়া সমালোচনাকালে কৌলীন্য প্রথার এই অশ্রু-উচ্ছ্বাসের দিকটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে,

'ধেড়ে মেয়ে বলিয়া সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিল। আবার সকলেই বলিল, 'কুলীনের ঘরে অমন ঢের হয়।' তখন যে যেখানে কুলীনের ঘরে বুড় বৌ দেখিয়াছে, তার গল্প করিতে লাগিল। গোবিন্দ মুখুয্যা পঞ্চান্ন বৎসরের একটা মেয়ে বিয়ে করিয়াছিল, হরি চাটুয্যা সত্তর বৎসরের এক কুমারী ঘরে আনিয়াছিল, মনু বাঁড়ুয্যা একটি প্রাচীনার অন্তর্জলে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন" (৩/১২)।

গ্রাম্য সমাজ বা কুলীন সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইলেও 'দেবী চৌধুরাণী' সামাজিক উপন্যাস নয়। সমাজচিত্র এখানে পারিবারিক জীবনের অলঙ্কার মাত্র। এই সকল সামাজিক প্রসঙ্গ 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে একদিকে বাস্তবতার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, অপরদিকে পারিবারিক জীবনে প্রতিফলিত হইয়া পরিবার-জীবনের সপত্নী-কলহ ও হাসি-অশ্রুর দিকটিকেও উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

৪. ভৌগোলিক পটভূমি : প্রকৃতিচিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিভিন্ন উপন্যাসের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কোন-না-কোন পটভূমি বাছিয়া লইয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনীতে গড় মান্দারণ, কপালকুণ্ডলায় মেদিনীপুর-সপ্তগ্রাম, সীতারামে যশোহর-খুলনা এবং দেবী চৌধুরাণীতে বরেন্দ্রভূমি উত্তরবঙ্গ। মানুষের জীবনের ভাবস্থির বৃত্তিগুলি সর্বত্রই সমান, কিন্তু স্থান-ভেদে চরিত্রগুলির প্রকার হয় ভিন্ন। এক এক অঞ্চলের ভূমি-অরণ্য-নদী মানুষের জীবনকে এক এক ভাবে গঠন করে। নিসর্গ-প্রকৃতির রূঢ়তা, উদ্দামতা বা কোমলতা এবং

নদীর গতিপ্রকৃতি মানুষের জীবন-ধারায় একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দেয়। তাই আঞ্চলিক পরিবেশ উপন্যাসের আস্বাদনেও স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের ভৌগোলিক পট বরেন্দ্রভূমি। 'বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম; সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়'। ইহার ছয় ক্রোশ দূরে দুর্গাপুর গ্রামে প্রফুল্লের পিত্রালয়। বৃদ্ধ কৃষ্ণগোবিন্দের কুড়ি ঘড়া ধন পাইয়া প্রফুল্ল যেখানে ঘরবাড়ী দেবত্র সম্পত্তি করিয়াছিল, তাহার নাম 'দেবীগড়'। ত্রিস্রোতার তীরে সন্ধান-পুরে 'কালসাজির ঘাটে' দেবী ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়াছিল। সেই ঘাটেই বন্দী হইয়াছিলেন লেফ্‌টানেণ্ট ব্রেনান্‌। 'বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে' দেবীরাণীর দরবার বসিয়াছিল। হরবল্লভ ও লেফ্‌টানেণ্টকে যে স্থানে মুক্ত করা হইয়াছিল, নিশি প্রচার করিয়াছিল, তাহার নাম 'ডাকিনীর শ্মশান'।

অবশ্য উপন্যাসে উল্লিখিত এই সকল স্থান-নামের কোন ভৌগোলিক অস্তিত্ব ছিল কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু বৈষ্ণব কৃষ্ণগোবিন্দ 'পদ্মাপার' আসিয়া বৈষ্ণবীর জন্য একটি নিভৃত স্থান খুঁজিয়াছিলেন। নিবিড় জঙ্গলে যে ভগ্ন অট্টালিকায় তিনি ঘর বাঁধিয়াছিলেন এবং কুড়ি ঘড়া ধন পাইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সে স্থানটিকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন ঃ

"পূর্বকালে উত্তর বাঙ্গালায় নীলধ্বজ বংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ রাজত্ব করিতেন। সে বংশে শেষ রাজা নীলাম্বর দেব।··· গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর-বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্ব-পুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধন সকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন।"

এই ধন প্রফুল্ল পাইয়াছিল। এই ধনেই 'দেবীগড়' নির্মিত হইয়াছিল। এই 'দেবীগড়' পৌরাণিক কোটিবর্ষ বা ঐতিহাসিক দেবীকোট বা বাণগড় হইতে পারে। ইহা দিনাজপুর-গঙ্গারামপুরের সন্নিহিত। প্রফুল্লকে যে পথে দুর্লভের বাহকেরা শিবিকায় বহন করিয়া আনিতেছিল, তাহাও দিনাজপুরের পথ। 'দুইজন হিন্দুস্থানী দিনাজপুরের রাজসরকারে চাকরীর চেষ্টায় যাইতেছে।' ইহাদিগকেই দস্যু মনে করিয়া দুর্লভ চক্রবর্ত্তী ও বাহকদল প্রফুল্লকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

সন্ধানপুর, কালসাজির ঘাট, ডাকিনীর শ্মশান নামগুলি কাল্পনিক হইতে পারে;

কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের নাম Hunter-প্রদত্ত বিবরণে আছে। এবং ভবানী পাঠক-দেবী চৌধুরাণীর দস্যুতার কেন্দ্র রঙ্গপুর অঞ্চলের 'জঙ্গল' এবং ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদীটিও কাল্পনিক নয়। আচার্য যতুনাথ সরকার বলেন, 'মুঘল যুগে মোঙ্গোল জাতীয় কোচ ও আহোম রাজ্য তখন বর্তমান রঙ্গপুর জেলার উত্তরের ও পূবের অনেকাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" সুতরাং এই সীমান্তপ্রদেশ ছিল 'রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক।' বঙ্কিমের সৃষ্ট বিদ্রোহীদের পথ সুগম করিয়া দিতে 'তাঁহাকে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই।" (ভূমিকা, শত-বার্ষিক সংস্করণ)।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের 'জঙ্গল' ভূমির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা লেখকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।" লেখকের এই উক্তিকে অত্যুক্তি বা অসঙ্গত বলা যায় না। রাজসাহী কমিশনারের পার্সন্যাল এ্যাসিষ্টাণ্ট থাকাকালে বা মালদহের রোড সেস্ কার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালে এই সকল স্থান প্রত্যক্ষ দেখা অসম্ভব নয়।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের 'নিবিড় জঙ্গল' বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে জঙ্গলের নিবিড়তা, নির্জনতা ও দুর্গমতা প্রকৃতি-বর্ণনা হিসাবে সার্থক। অরণ্যের ভয়াবহতা যেন অসম সাহসী দস্যু বরকন্দাজদের চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি মনুষ্য চরিত্রের প্রতিরূপ। সাহিত্যে প্রকৃতি-বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বলেন,

"কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃ প্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়।" [১]

উত্তরবঙ্গের 'দুর্ভেদ্য জঙ্গল' যেন লাঠি-সড়কি হাতে 'কালান্তক যমের মত জওয়ান'দের প্রতিমূর্তি; ইহার রহস্যময় ভয়াল সৌন্দর্য যেন 'গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান' ব্রাহ্মণ দস্যুসর্দার ভবানী পাঠকের মতই সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিসর্গবর্ণনা আরও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত খরধার পার্বত্য নদী ত্রিস্রোতার চিত্রলিপিতে। ডাঙ্গা আর জল—এই দুই মিলিয়াই বাংলার প্রকৃতি। উত্তর-পূর্ববঙ্গে ডাঙ্গাপথে অরণ্য, আর জলপথে নদী যেন জীবনযাত্রার

১. বিবিধ প্রবন্ধ : জয়দেব ও বিদ্যাপতি (বঙ্কিমচন্দ্র)।

নিত্য সঙ্গী। রসজ্ঞ সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেন, 'দেবী চৌধুরাণীতে কাহিনীকে কায়া দিয়েছে তিস্তা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের কাহিনী ত্রিস্রোতার কাহিনী, ত্রিস্রোতা ও কাহিনী অভিন্ন।"[১] উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

বর্ষার ত্রিস্রোতার সেই অপূর্ব বর্ণনা কেহ ভুলিতে পারিবে না। উত্তরবঙ্গের এই নদীটির সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, চোখ মেলিয়া দেখিলে ও কান পাতিয়া শুনিলে, এই বর্ণনায় তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে ঃ

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না।···ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে, জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি ; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার ; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে ; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে-আঁধারে। আঁধারে-আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্তের ঘোর গর্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জন ; সর্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগন-ব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।" (২/৩)

বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিস্রোতার এই বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এই নদীতে বজরার উপরে আরোহিণী নারীটিকে (প্রফুল্লকে) তিনি নদীর সহিত এক করিয়া দেখিয়াছেন। নদীর প্রতিরূপ নারী, নারীর প্রতিরূপ নদী ঃ

"আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পূরিয়াছে।······যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে। কিন্তু জল কূলে কূলে পূরিয়া টল টল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে, নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে, নির্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী ; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী।"

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে তিস্তার বুকে কালবৈশাখী ঝড়ের যে লীলা দেখানো হইয়াছে, তাহাও উত্তর-পূর্ববঙ্গে বড় নদীর বুকে ঝড়ের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষবৎ

---

১. বঙ্কিম-সরণী ঃ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

করিয়া তুলিয়াছে। আকাশপ্রান্তের 'একখানা ছোট মেঘ' কেমন করিয়া বড় হয়, কেমন করিয়া 'বৈশাখী নবীন নীরদমালায় গগন অন্ধকার' হইয়া উঠে, কিভাবে 'সোঁ সোঁ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু গর্জন' করিয়া আসে—আর তাহারই ভিতর সুদক্ষ নাবিকদের তৎপরতায় 'প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা' চারিখানি তোলা পালে লাগায় মুহূর্ত মধ্যে গলুই ঘুরিয়া 'বজরা জলের রাশি ভাঙ্গিয়া, দুলিতে দুলিতে নক্ষত্র-বেগে' ছোটে—প্রত্যক্ষ না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, আমরাও যেন তিস্তার বুকে ঝড়ের মুখে পড়িয়াছি, ঝড়ের বেগে বজরা একবার কাত হইয়া সোজা নক্ষত্রবেগে ঝড়ের সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, আমরা কেহ কাত হইয়া পড়িয়াছি, কেহ হরবল্লভের মত মনে করিতেছি, 'নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপ করিয়া কি হইবে?' আবার পরমুহূর্তেই 'স্বপদস্থ' হইয়া শুনিতেছি তরঙ্গরাশির ভয়ঙ্কর গর্জন।

বরেন্দ্রভূমির জল-জঙ্গলের এই ভৌগোলিক পট 'দেবী চৌধুরাণী'র বিদ্রোহী দুর্ধর্ষ দস্যুদলের সম্পূর্ণ উপযোগী। এখানকার বরকন্দাজেরা ডাঙ্গার বাঘ, মাঝি-মাল্লারা যেন জলের কুমীর। অশ্রুমুখী বাঙালী গৃহবধূর পক্ষে দস্যুদলের নির্ভীক নেত্রীত্বও এই পটে বেমানান হয় নাই, বরং সার্থক সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

৫. ঐতিহাসিক উপাদান

'দেবী চৌধুরাণী' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও এই উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন,

"পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক···দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।"

আচার্য যদুনাথ সরকারও বলিয়াছেন যে, এই মহাগ্রন্থে ইতিহাস লেখা, এমনকি, ঐতিহাসিক দৃশ্যপট আঁকা পর্যন্ত বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না।

কিন্তু তবু, গ্রন্থকার নিজেও স্বীকার করিয়াছেন,

"দেবী চৌধুরাণীরও···একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে।···দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুডল্যাড সাহেব, লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্‌, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ, সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে এই পর্যন্ত।"

ইতিহাসের এই নাম ও ঘটনার বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র A Statistical Account of Bengal : Hunter, Vol. VII হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[১] যদিও উপন্যাসের দেবী চৌধুরাণী ও ইতিহাসের দেবী চৌধুরাণীর প্রকৃতি পৃথক, তথাপি ইতিহাসের সত্যতা ইহাতে আছে। আচার্য যদুনাথ বলিয়াছেন, 'নাম ও তারিখ ধরিয়া দেখিতে গেলে এই উপন্যাসে ইতিহাসকে মানিয়া চলা হয় নাই।' ইতিহাসের ভবানী পাঠক ভোজপুরী, উপন্যাসের ভবানী পাঠক বাঙালী ; ইতিহাসের ভবানী পাঠক সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়, উপন্যাসের ভবানী পাঠক অপরাজিত, যদিও পরে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়া দ্বীপান্তর গিয়াছে ; ইতিহাসে সাহেবদের জয়, উপন্যাসে সাহেব বন্দী হইয়া দেবীর দয়ায় মুক্তিলাভ করিয়াছে।

তথাপি এই উপন্যাসে যে রাষ্ট্রীয় পট চিত্রিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাসের দিক হইতে সত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে একটি গৃহস্থ বধূকে স্বকৌশলে ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর ঘটনার মধ্যে আনয়ন করিয়া তাহাকে তৎকালীন দস্যুদলের নেত্রীত্ব প্রদান করিয়াছেন। এখানে গৃহ ইতিহাসের সহিত যুক্ত হইয়াছে এবং যে পরিবেশে এই অঘটন সম্ভব হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় নিপুণতার সঙ্গে সেই ঐতিহাসিক পরিবেশটিকে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তখন এদেশে মোগল-শাসন অস্তমিত, নবাবী আমলের রাষ্ট্রীয় শান্তিও বিপর্যস্ত, কোম্পানীর শাসনও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। ইংরাজগণ এক বৎসরের জন্য জমিদারী ইজারা দিয়া অর্থগ্রহণ করিতেন। ইজারাদারেরাও জমিদারের উপর চাপ দিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করিতেন। ফলে জমিদার বিপন্ন হইতেন, প্রজারাও শোষিত হইত। দেশের শাসন-শৃঙ্খল সুদৃঢ় না থাকায় অরাজকতা ও দস্যুতা প্রশ্রয় পাইত, বিশেষতঃ সীমান্ত দেশগুলি ছিল দস্যুতার কেন্দ্র। দেশের এই 'রাজনৈতিক গোধূলিতেই' রঙ্গপুর অঞ্চলে দস্যুনেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর আবির্ভাব।

১. The tract of country lying south of the station of Dinajpur and Rangpur and west of the present district of Bogra, towards the Ganges, was a favourite haunt of these banditti, being far removed from any central authority. In 1787, Lieutenant Brenan was employed in this quarter against a notorious leader of dakaits (gang robbers), named Bhawani Pathak......We catch a glimpse from the Leiutenant's report of a female dakait, by name Debi Chaudhurani, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of barkandazs in her pay and committed dakaits on her own account...... —A Statistical Account of Bengal. Vol. VII : Hunter.

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই পরিবেশের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

"তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে ; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা।... কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে।" (১/৮)

এই সময় উত্তরবঙ্গে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল ডাকাইতের সর্দার ভবানী পাঠক : "ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান।" (১/১১)

তখন দেবী চৌধুরাণীর নামেও সকলে কম্পিত হইত : 'যে নাম তাহাদের কানে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ছেলেবুড়ো কে না শুনিয়াছিল ? সে নাম অতি ভয়ানক।" (২/২)

এই সকল কথা বিন্দুমাত্র অনুরঞ্জিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন, "আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি—কথায় কথায় ডাকাইতের কথা বলিতেছি—ইহাতে মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি।" বস্তুতঃ ইতিহাসও এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এই ধরনের অরাজকতার সময় ডাকাইতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। শুধু এই ডাকাইতি নয়, এই ডাকাইত-দলনে কোম্পানী শাসকদের ভূমিকাও ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত। 'গুডল্যাড সাহেব রঙ্গপুরের কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন"—এ তথ্যও ঐতিহাসিক। ডাকাত-দমনে কালেক্টরের নির্দেশে সিপাহীসহ লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনানের অভিযানও ইতিহাসগতভাবে সত্য।

ফলতঃ 'দেবী চৌধুরাণী' ঐতিহাসিক উপন্যাস না হইলেও ইহা ইতিহাসের রসে পুষ্ট। ইতিহাস-সচেতন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাসে (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, আনন্দমঠ) ঐতিহাসিক ঘটনার সমাশ্রয়ে কাহিনী-গ্রন্থি বন্ধন করিয়াছেন অর্থাৎ উপন্যাসকে ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত যুক্ত করিয়া পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-বৃত্ত রচনা করিয়াছেন। ইতিহাস-প্রীতিই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহা নয়—ইহা দ্বারা অন্যতর একটি উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই রোম্যান্সধর্মী। রোম্যান্সের প্রধান উপাদান কল্পনা। কল্পনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবের সীমারেখা অতিক্রম করিতে চায় ;

কল্পনাই অসম্ভব ঘটনাগুলিকে সম্ভব করিয়া দেখায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসের ধর্ম—বাস্তব-বোধ ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বাস্তব বুদ্ধিকে লঙ্ঘন করার যুগ নয়। কাজেই ইতিহাসের পটভূমিতে স্থাপন করিয়া তিনি অসম্ভব ঘটনার সম্ভাব্যতাকে যুক্তিগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ, তাহা বাস্তবকে লইয়াই গঠিত। কাজেই ইতিহাসের স্পর্শে রোম্যান্সেও বাস্তবতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং অসম্ভব অবাস্তব ঘটনাগুলিও যুক্তির সমর্থন লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রোম্যান্স ইহার ফলেই উপন্যাসের ধর্ম হইতে বিচ্যুত না হইয়া উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসেও ইতিহাস দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। ইহা গার্হস্থ্য উপন্যাস। ইতিহাসের এক তরঙ্গাঘাত এই উপন্যাসের নায়িকাবধূকে সংসার হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া ঐতিহাসিক স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং অনুশীলিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া পুনরায় আর এক তরঙ্গাঘাতে তাঁহাকে পারিবারিক জীবনে আনিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

৬. তাত্ত্বিক ভিত্তি : অনুশীলন

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের তাত্ত্বিক ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনব্যাপী অনুসন্ধান, বহুমুখী অধ্যয়ন ও নিবিড় অনুধ্যানের ফল 'ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন'। উহা 'জীবন লইয়া কি করিব'—এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ও উত্তর। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের উহাই তাত্ত্বিক ভিত্তি।

ধর্মতত্ত্ব অনুশীলনের মূল লক্ষ্য মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্তি। এই মনুষ্যত্বই স্থায়ী সুখ। 'সর্বগুণযুক্ত সর্বসুখসম্পন্ন' মনুষ্য হওয়াই চরম পরিণতি। ইহার লক্ষণ ভক্তি, প্রীতি, শান্তি—ইহার সাধন নিষ্কাম কর্ম। মানুষের কতকগুলি শক্তি বা বৃত্তি আছে। এই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরানুবর্তী করাই নিষ্কামকর্মের লক্ষ্য। ইহা অনুশীলন সাপেক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, অনুশীলন ধর্ম, মানববৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্ম। অনুশীলন দ্বারা বৃত্তিগুলির প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য ঘটে। অনুশীলিত মানুষই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভ্রান্ত পথে চালিত করিতে পারে।

কেহ কেহ মনে করেন, এই ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে অগুস্ত কোঁতের গ্রুববাদ (Positive Philosophy)। তৎকালে বঙ্গদেশে কোঁতের

একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও নানা প্রসঙ্গে কোঁতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোঁৎ-সম্পর্কে আলোচনাও করিয়াছেন।

কোঁতের ধ্রুববাদের মূল কথা—প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বিজ্ঞান-বুদ্ধি। ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া তিনি মানবধর্ম (Religion of humanity) প্রচার করেন। তাঁহার মতে জাগতিক উন্নতির একমাত্র পথ মনুষ্যত্ব। ইহাই ধর্ম। কোঁতের এই নবধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। মনুষ্যত্বের মহাসত্তাতেই সকল মূল্য নিহিত। কাজেই তিনি মনুষ্যত্বকেই পূজনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া "মানবদেবীর" পূজার বিধি দিয়াছেন।[১]

কোঁতের মানবধর্মবাদের সঙ্গে বঙ্কিম-প্রচারিত ধর্মতত্ত্বের কোন কোন দিক হইতে মিল আছে। তৎকালে ইউরোপে ধর্মবিষয়ে যে মতগুলি প্রচলিত ছিল তাহাদের অধিকাংশের মূলে ছিল মানবধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের সারাংশ বিবৃত করিয়া কোঁতের ব্যাখ্যাকেই "উৎকৃষ্ট" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কোঁতের মতে,

"Religion in itself expresses the state of perfect unity which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical are made habitually to converge towards one common purpose."[২]

বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করেন, ধর্মের মূল কথা 'The state of perfect unity'—অর্থাৎ মানবের শক্তি বা বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য। কিন্তু কোঁৎ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান পার্থক্য এইখানে যে, কোঁতের ধর্ম 'নিরীশ্বর'। আর বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেন,

'ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।'[৩]

এই ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত স্বভাব প্রাপ্তিই মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য, উহাই স্থায়ী সুখ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন,

"বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর, এইজন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত...কিন্তু হিন্দুরা পরমভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বর পাদপদ্মেই সমর্পিত।"[৪]

---

১. 'The world could be redeemed only by a new religion whose function it should be to nourish and strengthen the feeble altruism of human nature by exalting Humanity as the object of ceremonial worship.

—The Story of Philosophy : Will Durant.

২. ধর্মতত্ত্ব (প্রথমভাগ), ক্রোড়পত্র (খ)। ৩. ধর্মতত্ত্ব ১।৪। ৪. ধর্মতত্ত্ব ১।১।

জ্ঞানানুশীলনের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্তরে পাশ্চাত্যদিগকেই গুরু বলিয়া মানিতে বলিয়াছেন। বহির্বিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি কোঁতের গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব ও রসায়ন এবং জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যা শিক্ষার সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানের চরম ঈশ্বরকে জানা। ঈশ্বরকে জানিতে হইবে হিন্দুশাস্ত্রে—উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্রুব বিশ্বাস, অনুশীলন ধর্মের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ গীতায় যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অন্য কোন ধর্মশাস্ত্রে তেমন ব্যাখ্যাত হয় নাই। তিনি আরও বলেন,

"With other peoples religion is only a part of life ; there are things lay and secular. To the Hindu his whole life was religion." [১] বস্তুতঃ হিন্দুর ধর্ম ও জীবন যে ইহকাল, পরকাল, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ ও সর্বোপরি ঈশ্বরকে লইয়া, এই বিশ্বাসই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলনকে পাশ্চাত্য অনুশীলন ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে।

মানবধর্ম ও সমাজের ক্রমোন্নতিতে কোঁৎ পরিবার-জীবনের উপর গুরু গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—"Comte laid great stress upon the family as the fundamental social institution."[২] কোঁৎ এ বিষয়ে হিতবাদী পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন। কোঁতের Humanity পূজার মূলেও রহিয়াছে ইউরোপীয় হিতবাদের মূল তত্ত্ব—'Greatest good of the greatest number.'—বহুতম লোকের প্রচুরতম মঙ্গল। এই প্রীতিমাঙ্গল্যের প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র পরিবার। বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করেন, 'পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল।'

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় প্রীতি-তত্ত্বকে অনুমোদন করিতে পারেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, ইউরোপীয় অনুশীলনে "প্রীতির পূর্ণস্ফূর্তি হয় না, দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়।" 'ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্যে দেশবৎসল মাত্র।'[৩] ভারতবর্ষীয়ের চক্ষে মনুষ্যপ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত। ভারতীয়দের মতে, ঈশ্বর সর্বভূতান্তরাত্মা ও সর্বভূতময়। কোন মনুষ্য তাহা ছাড়া নহে। তাই ভারতবর্ষের আত্মপ্রীতি বা মনুষ্যপ্রীতি ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে

---

১. Letters on Hinduism : Bankimchandra.

২. Auguste Comte : H. E. Barnes (An Introduction to the History of Sociology, Chap. III).

৩. ধর্মতত্ত্ব ১/২১

যুক্ত। ঈশ্বর সর্বব্যাপ্ত এই বোধে সর্বলোককে আপনার মত দেখিতে পারিলে প্রীতিবৃত্তির পূর্ণ স্ফূর্তি ঘটে। তখন তাহা সঙ্কীর্ণ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে না, ঈশ্বরমুখী হইয়াই তাহা সর্বলোকবাৎসল্যে পরিণত হয়। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাস্থল। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য যুক্তি-বিজ্ঞানকে স্বীকার করিলেও মানবধর্মের তত্ত্বকে হিন্দুধর্ম হইতেই আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহার অনুশীলন তত্ত্বেও এদেশের গীতোক্ত নিষ্কামকর্মের আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানেই পাশ্চাত্য মতবাদ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য।

'দেবী চৌধুরাণী'উপন্যাস বঙ্কিম-প্রচারিত 'ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলনে'র ফল। এই গ্রন্থের মুখপত্রে তিনি ধর্মতত্ত্ব অনুশীলনের প্রবক্তা অধ্যাপক সীলী ও অগুস্ত কোঁতের দুইটি উদ্ধৃতি উদ্ধার করিয়াছেন।[১] ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে বলিয়াছেন,

> "লেখক প্রণীত 'দেবী চৌধুরাণী' নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণস্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে।"[২]

বস্তুতঃ দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ ও ষোড়শ পরিচ্ছেদে অনুশীলন ধর্মের শিক্ষা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের সমুদয় বৃত্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্বিধ বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব। অনুশীলন শিক্ষাসাপেক্ষ। প্রথমেই দেখা যায়, 'প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল।' এই শিক্ষার মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা প্রথম। ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য ও দর্শন। ইহা দ্বারা জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি ঘটিল। ইহার সহিত অন্য প্রকার শিক্ষাও চলিতে লাগিল। আহার, শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা সম্পর্কে কঠিন সংযমের ভিতর দিয়া প্রত্যাহার ও পরিগ্রহ সম্পর্কে প্রফুল্ল সামঞ্জস্য বিধান করিতে শিখিল। শারীরিক বৃত্তি স্ফুরণের জন্য প্রফুল্লকে মল্লবিদ্যাও শিখিতে হইল। এইরূপে,

১. 'The Substance of Religion is culture. The Fruit of it the Higher Life." Natural Religion by the Author of Ecce Homo.

"The General Law of Man's progress, whatever the point of view chosen, consists in this that Man becomes more and more Religious." Auguste Comte—Catechism of Positive Religion—Eng. Trans. by Congreve.

২. ধর্মতত্ত্ব ১/৮, পাদটীকা।

"নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানী ঠাকুর ঐশ্বর্যভোগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।" (দেবী চৌ. ১/১৫)

শিক্ষা অন্তে প্রফুল্ল কর্মের পথ অবলম্বন করিবে বলিয়া স্থির করিল। ভবানী ঠাকুর গীতার দৃষ্টান্তে বুঝাইলেন, অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলেই কর্মের সার্থকতা। সংযম ও নিরহঙ্কার অবলম্বনপূর্বক কর্মই নিরাসক্ত কর্মের লক্ষণ। তৃতীয় লক্ষণ 'সর্বকর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ।' শ্রীকৃষ্ণে অর্পণের অর্থ তাৎপর্যবোধক। ভগবান সর্বভূতস্থিত। অতএব সর্বভূতের কল্যাণে সর্ব সমর্পণ নিষ্কাম কর্মের চরম কথা। দেশে অগণিত উৎপীড়িত, শোষিত দরিদ্র দুঃখী মানুষ রহিয়াছে, তাহাদিগের দুঃখমোচন করাই নিষ্কাম কর্ম। প্রফুল্ল এ সত্য বুঝিতে পারিল এবং দুঃখীর দুঃখমোচনের ব্রত গ্রহণ করিল। এইভাবে ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে একখানি 'শাণিত অস্ত্রে' পরিণত করিলেন। অনুশীলিতধর্মা প্রফুল্ল এই শিক্ষা লইয়া 'দেবী চৌধুরাণী'তে পরিণত হইল। দেবী চৌধুরাণীর পরিচয় ইতিহাসের দিক হইতে দস্যুদলের নেত্রী (**'a female Dakait by name Debi Chaudharani'**), কিন্তু অনুশীলন ধর্মের দিক হইতে তিনি মানবরূপিণী, দেবী ভগবতীর অংশ। তিনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগে সিদ্ধকামা। তিনি দরিদ্রদের বন্ধু, পরিজন-বৎসল, প্রখর বুদ্ধির অধিকারিণী, কর্মকুশলা ও স্বামীদেবতার প্রতি প্রীতিমতী।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন, 'যে **culture** বা নিষ্কামধর্ম গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু তাহার চিত্র অতিশয় অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ।'[১] একথা অবশ্য ঠিক যে, বঙ্কিম-প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলনের পূর্ণাঙ্গ রূপ 'দেবী চৌধুরাণী'তে পাওয়া যায় না। পাঁচ বৎসর মহামহোপাধ্যায় ভবানী পাঠকের নিকট প্রফুল্লের অনুশীলন শিক্ষা এবং দস্যুতা কর্মে তাহার প্রয়োগের মধ্যেও অসঙ্গতি রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, উপন্যাসের দিক হইতে অনুশীলনতত্ত্বের প্রয়োগ অসার্থক হয় নাই। উপন্যাস তত্ত্বগ্রন্থ নয়। উপন্যাসে তত্ত্বের প্রয়োগ অনেকটা সাহিত্যে অলঙ্কার প্রয়োগের মত। অলঙ্কারের স্বল্পতায় তাহার তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগেই অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্য। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের তাত্ত্বিক অংশ এইভাবেই উপন্যাসের সৌন্দর্য ও মূল অভিপ্রায়কে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এবং ডঃ সেনগুপ্তও স্বীকার করিয়াছেন, 'প্রফুল্লের

১. বঙ্কিমচন্দ্র : শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

গৃহধর্ম পালনই উপন্যাসের প্রধান বিষয়।' 'দেবী চৌধুরাণী' গার্হস্থ্য উপন্যাস। ইতিহাসের সঙ্গে কাহিনীর সংযুক্তি এবং অনুশীলন ধর্মের শিক্ষা ও দেবীরাণীর ডাকাইতি এই গার্হস্থ্য উপন্যাসের ভূমিকা মাত্র। প্রফুল্লকে আদর্শ গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই গ্রন্থের মূল অভিপ্রায়। শিক্ষাকালেও প্রফুল্ল এই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হইতে চ্যুত হয় নাই। নিষেধ সত্ত্বেও প্রফুল্ল শিক্ষাকালে একাদশীর দিনমাছ খাইত, নিশার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব সমর্পণের আলোচনাতেও দেখা যায়, প্রফুল্ল বলিতেছে, 'স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।' গ্রন্থকারও মন্তব্য করিয়াছেন,

'ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান।" (দেবী চৌ. ১।১৪)

ডাকাইতের দলে নেত্রীত্ব করিবার কালেও প্রফুল্ল এই মহাসত্য বিস্মৃত হয় নাই। প্রফুল্লের সমগ্র ডাকাতি-পর্ব 'প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী চলিল' এই বাক্যটিকে সার্থক করিবার জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে এই কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে পাঠককে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন।

প্রফুল্লের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কেও কেহ কেহ বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। গৃহবধূরূপে প্রফুল্লকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আড়ম্বরপূর্ণ-শিক্ষা-দীক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল? 'ইহা যেন পর্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় হাস্যজনক'। তাহা ছাড়া, সাগর-বৌয়ের গৃহস্থালী ও নিষ্কামকর্মে দীক্ষিতা অনুশীলিতা প্রফুল্লের গৃহস্থালীর মধ্যে মৌলিক প্রভেদই বা কোথায়?

অবশ্য এসকল প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়াই দিয়াছেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন, 'উৎকর্ষের পরিণতি কতকগুলি চেষ্টার ফল···ধান তৃণ জাতীয়।···ধানের পাট হইবার পূর্বে ধানও এইরূপ ছিল। কেবল কর্ষণজন্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে।···উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই।" (ধর্মতত্ত্ব ১।৪)

তিনি আরও বলিয়াছেন, 'এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি যে কোন নূতন সংবাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি মনে একপ্রকার স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন, নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ আমি ধর্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। ধর্ম পুরাতন, নূতন নহে। আমি নূতন ধর্ম কোথায় পাইব?" (ধর্মতত্ত্ব, ১।৫)

প্রফুল্ল সম্পর্কেও লেখক এই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন, একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন।" (দেবী চৌ. ৩।১৪)

বস্তুতঃ ভারতীয় জীবনে গার্হস্থ্য আশ্রমে পরার্থপরতার আদর্শ গৃহবধূর পক্ষে নূতন কিছু নয়। বেদের কাল হইতে এদেশের বধূ 'সুমঙ্গলী'; তিনি গার্হপত্যব্রতের সঙ্গিনী। 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব' প্রভৃতি বিবাহ-মন্ত্রে তাহার পরিচয় আছে। শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালে কণ্বমুনিও এদেশের গৃহবধূর এই আদর্শ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন,

"তুমি পতিগৃহে গিয়া, গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও, রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ।" (অনুবাদ : বিদ্যাসাগর)[১]

আমাদের দেশের গৃহবধূদের মধ্যে এই আদর্শ অনেকটা সংস্কাররূপেই বিদ্যমান থাকে বা আছে। আদর্শ বধূরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার 'অশিক্ষিত পটুত্বও' দুর্লভ নয়। ব্রজেশ্বরের মাতার ভিতরেও খানিকটা এ গুণ ছিল; তিনি স্বামীর ভোজনকালে নিজে ব্যজনহস্তে উপস্থিত থাকিতেন। সাগর-বৌয়ের ভিতরেও আংশিক ভাবে বধূর গুণ ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, অনুশীলিত ধর্মা প্রফুল্লের ভিতর মনুষ্যত্বের আদর্শ পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাই তাহার আগমনে শাশুড়ী সুখী হইলেন, শ্বশুর প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন, নয়নতারাও কোন্দল ভুলিয়া প্রফুল্লের বশীভূত হইল। সংসারের বিষয়কর্ম সুচারুরূপ নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল, দিন দিন লক্ষ্মীশ্রী বাড়িতে লাগিল। দেশের লোকের নিকট প্রফুল্ল ছিল যথার্থ মাতা। তাহার কারণ,

"প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ

---

১. মূল : শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে।
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী।
যান্ত্যেব গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।
(কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ : ৪র্থ অঙ্ক)

কর্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোনা হইত। প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র—সংসারগ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। অথচ কেহই হরবল্লভের গৃহে জানিতে পারিল না যে, প্রফুল্ল এমন শাণিত অস্ত্র। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত—সে কথা দূরে থাক্—কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর পরিচয়ও আছে। গৃহধর্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহধর্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়।" (দেবী চৌ. ৩/১৪)

এইখানেই অনুশীলন ধর্মের সার্থকতা। এইখানেই প্রফুল্ল ও সাগর-বৌয়ের গৃহস্থালীর মধ্যে মৌলিক প্রভেদ। একজন উৎকর্ষণের ফল, অপরজন প্রচলিত সংস্কারের অপূর্ণাঙ্গ প্রতিমা।

অনুশীলন তত্ত্ব প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগের কথাও বিচার্য। অনেকেই মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তত্ত্বভূমিকা বা প্রচারধর্মিতা প্রাধান্য অর্জন করায় উপন্যাসের শিল্প-সৌন্দর্য ক্ষুন্ন হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসেও তাত্ত্বিক বঙ্কিম শিল্পী বঙ্কিমকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-শিল্পকে লঘু শিল্প-সৌন্দর্যের দিক হইতে বিচার করা অসঙ্গত। একটি তৃণশীর্ষে সূর্যকিরণপাতে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাহা তুচ্ছ না হইতে পারে—কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশীর্ষে প্রভাত অরুণের স্পর্শে যে মহিমান্বিত ভাবগাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়, তাহার মহিমাকে কে উপেক্ষা করিবে? বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা মহৎশিল্পীর মহৎ প্রেরণার ফল। তাহা খদ্যোতের ক্ষণিক দীপ্তি নয়, তাহা প্রজ্বলিত হোমশিখা। হোমশিখার পাবনী শক্তিতে তাহা কল্যাণ-মাঙ্গল্যের প্রতীক। মহত্ত্ব ও ভারত্বের দিক হইতে যেমন মহাভারতের বিচার, বঙ্কিম-সাহিত্যের বিচারও তেমনই মহৎ প্রেরণার দিক হইতে।

তাহা ছাড়া 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে তাত্ত্বিক পটকে অতিক্রম করিয়া মানবিকতাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্পর্কে সুধী সমালোচকের মন্তব্য দিয়াই আমরা এ-প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি,—

"যদিও প্রথম দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক ধর্মতত্ত্ববিদের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে এই দ্বন্দ্বে ঔপন্যাসিকেরই জয় হইয়াছে; কলা-কৌশলের দিক দিয়া ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি ধর্মতত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হইতে পারে নাই।"[১]

১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা: ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭. বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা তাঁহার স্বদেশপ্রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভাবান্ শিল্পী, এই শিল্পের প্রধান প্রেরণা তাঁহার স্বদেশপ্রেম। এই জন্যই তাঁহার রচনায় নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস অল্প। যদিও তিনি মনে করেন, "সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য', তথাপি তিনি বলেন, সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য 'চিত্তশুদ্ধি-বিধান'।[১]

সাহিত্য সৃষ্টিতে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। একটি গুরু দায়িত্ব লইয়াই তিনি সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিয়োগ-বেদনায় যেমন ঋষি-কণ্ঠে 'মা-নিষাদ' শ্লোক ধ্বনিত হইয়া রামায়ণ রচনার প্রেরণা দিয়াছিল, ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ ও দেশের অধঃপতনে তেমনই বঙ্কিম-হৃদয় বিগলিত হইয়া সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তাই তিনি সাহিত্যের 'কর্মযোগী'। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি কর্মযোগ।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতিও বিরাট কর্মযোগের একটি অংশ। এইজন্য প্রচলিত অর্থে ইউরোপীয় স্বদেশপ্রেম বলিতে যাহা বুঝায়, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ইউরোপীয় স্বদেশপ্রেম সঙ্কীর্ণ; তাহা ঠিক জাগতিক প্রীতি বা ঈশ্বর প্রীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,

"ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি জাগতিক প্রীতি ও ঈশ্বর ভক্তির সঙ্গে অভিন্ন। তাই স্বদেশের কল্যাণ মনস্কামনায় বিভোর সন্ন্যাসীর কাছে তিনি দাবী করিয়াছেন, জীবন নয়, ভক্তি। (আনন্দমঠ)।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ভক্তিমূলক বলিয়াই তাহা সঙ্কীর্ণতার সীমানায় আবদ্ধ নয়। দেশকে তিনি ভালবাসিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন দেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে। স্বদেশের ভূপ্রকৃতি, স্বদেশের বীরত্ব, স্বদেশী পরিবার ও সমাজের আদর্শ তাই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সকল ত্রুটি হইতে মুক্ত করিয়া তিনি স্বদেশকে দশভুজার মহামহিমান্বিত

১. বিবিধ প্রবন্ধ : উত্তরচরিত। ২. ধর্মতত্ত্ব ১/২৪

পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম লোপ করিতেছে? গৃহিণীর পাঁচজন দাসী আছে—কিন্তু স্বামি-সেবা—আর কার সাধ্য করিতে আসে! যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?" (দেবী চৌ. ১/৫)

এই সকল প্রসঙ্গের ভিতর বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির স্বাক্ষর অতিশয় স্পষ্ট। তিনি চাহিয়াছিলেন এই আত্মভোলা দেশকে আত্মপ্রবুদ্ধ করিতে। নিজেকে চিনিয়া নিজের গৌরব সম্পর্কে সচেতন হইয়া দেশ মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হউক—ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের শুভ কামনা। এই জন্যই এ দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি নিজে কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সেই ইতিহাস উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং তাহারই ফল উপহার দিয়াছেন প্রবন্ধে ও উপন্যাসে। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এদেশের অতীত কীর্তি, ঐশ্বর্য, বীরত্ব ও জীবনের সমুন্নত আদর্শের চিন্তায় পূর্ণ। শুধু তাই নয়, কিরূপে ভাবী কালেও এই দেশ, পরিবার ও সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক হইতে—ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সমুন্নত হইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত তিনি দিয়া গিয়াছেন। এই কল্যাণী চিন্তাই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির শ্রদ্ধাপূর্ণ অর্ঘ্য।

৮. কাহিনী: গঠন-রীতি

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের কাহিনী সরল। ইহাতে তিনটি খণ্ড। তিন খণ্ডে মোট ৪২টি পরিচ্ছেদ। প্রথম খণ্ডে ষোল, দ্বিতীয় খণ্ডে বার এবং তৃতীয় খণ্ডে চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ। শ্বশুরপরিত্যক্তা বধূর শ্বশুরগৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠাই মূল কাহিনী অর্থাৎ 'পোড়ারমুখী' প্রফুল্লের গৃহিণীপদে দৃঢ় প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রতিপাদ্য। মধ্যপথে কাহিনী ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। প্রফুল্লের পরিচয় হইয়াছে দস্যুনেত্রী 'দেবী চৌধুরাণী'। ইতিহাসের এই তরঙ্গাঘাত প্রকৃতপক্ষে প্রফুল্লকে আদর্শ গৃহলক্ষ্মী-রূপে গঠন করার প্রয়োজনেই আসিয়াছে। কাজেই 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস আদ্যন্ত প্রফুল্লেরই জীবন-কাহিনী।

প্রথম খণ্ডের সূচনাতেই দেখা যায় স্বামি-পরিত্যক্তা প্রফুল্ল ও তাঁহার দুঃখিনী মায়ের কথোপকথন এবং শ্বশুরগৃহে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রফুল্লর ভূতনাথ গ্রামে যাত্রা। তাহার পর ছয়টি পরিচ্ছেদে শ্বশুরগৃহে একরাত্রির জন্য প্রফুল্লের স্বামি-সঙ্গ, শ্বশুর

কর্তৃক প্রত্যাখ্যান, স্বগৃহে আগমন ও মাতার মৃত্যু। অষ্টম-নবম পরিচ্ছেদে লম্পট দুর্লভ কর্তৃক প্রফুল্লকে অপহরণ, নির্জন অরণ্যে মুমূর্ষু কৃষ্ণগোবিন্দের গৃহে প্রফুল্লের আশ্রয়লাভ, বৃদ্ধের মৃত্যু ও প্রফুল্লের সুবর্ণ-হীরক-রত্নে পূর্ণ 'কুড়ি ঘড়া' গুপ্তধন লাভ। দশম পরিচ্ছেদে প্রফুল্লের মৃত্যুর গুজব রটনা, একাদশে দস্যুসর্দার ভবানী পাঠকের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ, দ্বাদশে-ত্রয়োদশে ভবানী পাঠকের প্রফুল্লকে 'শাণিত অস্ত্র'রূপে গড়িবার মন্ত্রণা; চতুর্দশ পরিচ্ছেদে প্রফুল্ল-বিরহে ব্রজেশ্বরের অবস্থা ও 'পিতা স্বর্গঃ' মন্ত্র শ্রবণে ধৈর্যধারণ। পঞ্চদশ-ষোড়শ পরিচ্ছেদে কঠিন সংযমে প্রফুল্লের শারীরিকী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা নিষ্কাম ধর্ম শিক্ষা এবং 'শাণিত অস্ত্র' রূপে ভবানী ঠাকুরের দলে যোগদান।

প্রথম খণ্ডে দেখা গেল, প্রফুল্ল শ্বশুরগৃহ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ঘটনাক্রমে ঐতিহাসিক আবর্তের সহিত যুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এই ঐতিহাসিক আবর্তের মধ্যেই আবার শ্বশুরগৃহ তথা স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রফুল্ল দস্যুদলের নেত্রী 'দেবী চৌধুরাণী'। বারটি পরিচ্ছেদে লেখক সুকৌশলে ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচারে জমিদার হরবল্লভের বিপন্ন অবস্থা, অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্রজেশ্বরের সাগরের পিতৃগৃহে গমন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে দেবী চৌধুরাণীর বজরায় আটক ও ঋণ বাবদ অভীপ্সিত অর্থ ও সাগর-বৌসহ মুক্তি এবং দেবীই যে প্রফুল্ল এই পরিচয় লাভের বিবরণ দিয়াছেন। এই সঙ্গে 'দেবীরাণীর দরবার' (একাদশ পরিচ্ছেদ) এবং পিতা হরবল্লভের নিকট ব্রজেশ্বরের ঋণস্বরূপ দেবী চৌধুরাণীর নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির বিবরণ (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ) প্রদত্ত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড 'দেবী চৌধুরাণীর অবসান', 'প্রফুল্ল শ্বশুর বাড়ী চলিল' এবং প্রফুল্লের সংসার ও গৃহিণীপনার কাহিনী। কথা ছিল বৎসরান্তে ব্রজেশ্বর 'বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে' 'সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে' দেবী চৌধুরাণীর ঋণের টাকা পরিশোধ করিবে। হরবল্লভ এই সুযোগে দেবীকে ধরাইয়া দিবার কৌশল করিলেন এবং রঙ্গপুরের কালেক্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সিপাহী ও লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্ সহ যাত্রা করিলেন (প্রথম পরিচ্ছেদ)। দ্বিতীয় হইতে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের ক্রিয়াযোগ, কোম্পানীর সিপাহীদের সঙ্গে বরকন্দাজ লাঠিয়ালদের লড়াই এবং দেবীর অপূর্ব বুদ্ধিমত্তায় সাহেবের পরাজয়, শ্বশুরকে রক্ষা এবং ব্রজেশ্বরের স্ত্রীরূপে প্রফুল্লের শ্বশুরগৃহে যাত্রার বিবরণ। এই পরিচ্ছেদগুলি নিষ্কামকর্মে দীক্ষিতা দেবী চৌধুরাণীর কর্মকুশলতায় পূর্ণ। সংশয়, রোমাঞ্চ, বিস্ময় ও উত্তেজনায় এই অংশ

ঐতিহাসিক গতিতে উদ্বেল। 'দেবী চৌধুরাণী মরিয়াছে।' দ্বাদশ পরিচ্ছেদে নববধূরূপী প্রফুল্লের বরণ এবং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ পরিচ্ছেদে সংসারক্ষেত্রে প্রফুল্লের কর্মযোগের ফলাফল বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের কাহিনী সরল। কাহিনীতে বৈচিত্র্য থাকিলেও জটিলতা নাই। প্রায় দশবৎসর কালের ঘটনা ইহাতে বিধৃত হইয়াছে। ঘটনাগুলি যেন অতি দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে লেখক এখানে নাটকীয় কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কবিত্বময় বর্ণনা থাকিলেও ইহাতে ক্রিয়ার অংশই প্রধান। নাটকীয় ঐক্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা শুধু স্থান বা কালের ঐক্য নয়। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে স্থান বা কালগত ঐক্য রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ঘটনাগুলি একাভিপ্রায়ী। সমস্ত ঘটনার আয়োজন প্রফুল্লকে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। লেখক অতি নিপুণতার সঙ্গে ঘটনাজাল বিস্তার করিয়া উপসংহারে সেই ঘটনাগুলিকে গুটাইয়া আনিয়া লক্ষ্যকেন্দ্রে মিলাইয়া দিয়াছেন।

এই উপন্যাসে একাধিক কাহিনী নাই। কিন্তু একই কাহিনী দুইটি ভিন্ন পরিবেশে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে : একটি সংসারের কাহিনী, অপরটি ইতিহাসের কাহিনী। সংসার-জীবন ও ইতিহাসের এই সাযুজ্য সংস্থাপনে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নিপুণ নাট্যকারের পরিচয় এইখানেই। নিস্তরঙ্গ সংসার-জীবনে ইতিহাসের তরঙ্গাঘাত, ইহাকে বর্ষাকালের ত্রিস্রোতার মতই তরঙ্গমুখর করিয়া তুলিয়াছে। মধ্যপথে হরবল্লভের মতই মনে হয়, সংসার-জীবন-তরণী বুঝি ইতিহাসের স্রোতে ডুবিয়া গেল : 'নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে?' কিন্তু কুশলী কর্ণধার বঙ্কিম। তাঁহার কৌশলে নৌকা ডুবিল না—কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল। ঝড় থামিল, নৌকাও থামিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ভূতনাথ গ্রামের বধূর বজরা আবার ভূতনাথের ঘাটেই ফিরিয়া আসিয়াছে।

'দেবী চৌধুরাণী'র কাহিনী সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র কোন-কোন স্থলে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ অভিযোগ করিয়াছেন।

(১) ফুলমণি-প্রচারিত প্রফুল্লের ভৌতিক তিরোধান বৃত্তান্ত লোকে বিশ্বাস করিয়াছে। শুধু তাই নয়, এই ভৌতিক বৃত্তান্ত লোকের মুখে মুখে পরিবর্তিত হইয়া যখন প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইয়াছে, তখন তাহা স্বাভাবিক মৃত্যুসংবাদেই রূপান্তরিত হইয়াছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ইহা অবিশ্বাস্য।

(২) ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত মনে করেন, প্রাকৃতিক ঝড়ের আনুকূল্যে শ্বশুর ও সাহেবসহ দেবীর উদ্ধারলাভের ঘটনাটিও স্বাভাবিক নয়। 'সময়ে মেঘোদয়' দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহের প্রকাশ 'রূপকথা অপেক্ষাও অলীক।'

(৩) কোম্পানীর বন্দুকধারী সিপাহীদের সঙ্গে লাঠিয়াল বরকন্দাজদের লড়ায়ে বরকন্দাজদের হাতে সিপাহীর কাবু হওয়ার ঘটনাটিও বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে।

সামগ্রিকভাবে উপন্যাসের বাস্তবতা বিচারে এই ত্রুটিগুলি তেমন গণনীয় নয়। তাহা ছাড়া, রটনার ঘটনা যে বাস্তবে ঘটিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাংলায় 'হাঁ'কে 'না' এবং 'না'কে 'হাঁ'তে পরিণত করা খুব কঠিন ছিল না। তাহাতে বাস্তব ঘটনাও ভৌতিক হইতে পারিত এবং ভৌতিক ঘটনারও বাস্তবে রূপান্তরিত হইতে বাধা ছিল না। যে গাঁয়ের লোক প্রফুল্লের মাকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া প্রচার করিয়া আবার তাহা সারিয়া লইতে অগ্রসর হয়, তাহাদের রটনায় সবই সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ ঝড়ের আনুকূল্য। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে ধর্মতত্ত্বে বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরানুকম্পায় নৈসর্গিক ঘটনাও অনুশীলিতধর্মা মানুষের সহায়ক হইতে পারে; দেবী চৌধুরাণীতে সময়ে মেঘোদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ' (ধর্মতত্ত্ব ১।১৯)। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র যাহাই বলুন, উপন্যাসে মেঘোদয় প্রাকৃতিক নিয়মেই হইয়াছে। বৈশাখী অপরাহ্নে বৈশাখী ঝড়ের উদয় অনৈসর্গিক নয়। উত্তর-পূর্ববঙ্গের নদীপথে ইহা নিত্য ঘটনা। তাহা ছাড়া, উপন্যাসমধ্যে মেঘোদয়কে অবলম্বন করিয়া মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে দেবী চৌধুরাণীর কর্মদক্ষতা—তাঁহার চতুর পরিকল্পনা, অনমনীয় আত্মপ্রত্যয়, নেত্রীসুলভ দৃঢ়তা ও নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিতা নারীর অশেষ কর্মনৈপুণ্য। এগুলি ক্ষণেকের জন্যও বাস্তববোধকে ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় না।

তৃতীয় প্রসঙ্গের সম্ভাব্যতা বিষয়ে দেশী লাঠিয়াল সৈন্যদলের নিকট বন্দুকধারী সিপাহী সৈন্যের পরাজয়ের একাধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়াছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার।[১] তিনি দেখাইয়াছেন, এরূপ ঘটনা অসম্ভব নয়, ইতিহাসে তাহার নজীর আছে। তাহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রও এইরূপ পরাজয়ের কারণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "দূর হইতে লড়াই হইলে সিপাহীর কাছে লাঠিয়ালরা অধিকক্ষণ টিকিত না—কেন না, দূরে লাঠি চলে না। কিন্তু ছিপের উপর থাকিতে হওয়ায় সিপাহীদের বড় অসুবিধা হইল।...যাহারা জলে লড়াই করিতেছিল, তাহারা

১. দ্রষ্টব্য ভূমিকা, দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, সাহিত্য পরিষৎ)

বরকন্দাজদিগের লাঠিসড়কিতে হাত পা বা মাথা ভাঙ্গিয়া কাবু হইতে লাগিল।" (দেবী চৌ. ৩/৫)

কাজেই দেবী চৌধুরাণীর কাহিনী-নির্মাণে বাস্তবতার দাবী লঙ্ঘিত হইয়াছে, এ অভিযোগ সত্য নয়। ইহাকে 'রূপকথা' বলিয়া কটাক্ষ করিবারও সঙ্গত হেতু নাই।

৯. গ্রন্থনাম বিচার

নায়িকার নামে গ্রন্থের নামকরণ নূতন নয়। ভারতীয় সাহিত্যে সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' ও বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে নায়িকার নামেই গ্রন্থের নামকরণ করা হইয়াছে। অলঙ্কারশাস্ত্রেও কবির নাম, বর্ণনীয় বিষয়, নায়ক অথবা নায়কেতর ব্যক্তির নামে কাব্যের নামকরণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।[১] বঙ্কিমচন্দ্রও 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'রজনী', 'ইন্দিরা' প্রভৃতি গ্রন্থনাম নায়িকার নাম অনুসারেই করিয়াছেন। 'দেবী চৌধুরাণী' নামটিও নায়িকার নামানুসারী।

বস্তুতঃ একটি গ্রন্থের যে চরিত্রটি গ্রন্থোক্ত সমগ্র ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, অথবা যাহাকে কেন্দ্র করিয়া মূল কাহিনী প্রধানভাবে আবর্তিত হয়, গ্রন্থের নামভূমিকা তাঁহারই প্রাপ্য। সে হিসাবে 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থনাম সার্থক।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই উপন্যাসে একই নায়িকার দুই নামঃ প্রফুল্ল ও দেবী চৌধুরাণী। গ্রন্থের আরম্ভ 'প্রফুল্ল' নামটি লইয়া এবং গ্রন্থের শেষেও প্রফুল্লই সংসার জুড়িয়া বসিয়াছে এবং লেখককর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছে। প্রফুল্ল 'দেবী চৌধুরাণী' নামে পরিচিত হইয়াছে শুধু গ্রন্থের মাঝখানে। দেবী নিজেও শেষের দিকে একাধিকবার বলিয়াছে।

'দেবী মরিয়াছে, তার নাম এ পৃথিবীতে মুখেও আনিও না। প্রফুল্লের কথা বল।' (দেবী চৌ. ৩/১০)

'দেবী চৌধুরাণী'র আবির্ভাব কাহিনীর মধ্যপথে, 'দেবী চৌধুরাণী'র অবসানও কাহিনী ফুরাইবার আগে। প্রফুল্ল-ভূমিকাটিই মুখ্য। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, গৃহলক্ষ্মীরূপে বধূর প্রতিষ্ঠাও সার্থক হইয়াছে প্রফুল্লকে লইয়া। তাহা হইলে গ্রন্থের নাম 'প্রফুল্ল'

১. 'কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা'—সাহিত্য-দর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

না হইয়া 'দেবী চৌধুরাণী' হইল কেন? গৃহকে ছাড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে প্রধান করিলেন কেন?

ইহার কারণ,—বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-সচেতন মন ঘরের মহিমা দেখাইতে গিয়াও ইতিহাসকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। ইতিহাস বহুজন-পরিচিত, আর গৃহ প্রায় অলক্ষ্য। গৃহের মৃৎপ্রদীপ কল্যাণবাহী হইলেও ইতিহাসের মশালের তুলনায় তাহা প্রভাহীন; গৃহসন্নিহিত 'পুকুরঘাট' ত্রিস্রোতার প্রবল তরঙ্গ-কল্লোলের তুলনায় ম্লান। তাই গ্রন্থের নামকরণে তিনি ঐতিহাসিক নামটিই নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন। ইতিহাসের মশাল-দীপ্তিতে তিনি গৃহের মৃৎপ্রদীপকে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখাইয়াছেন; ত্রিস্রোতার গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ তুলিয়া তিনি 'পুকুরঘাটে'র মহিমাকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ইতিহাসের দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া গৃহলক্ষ্মী প্রফুল্লকে তিনি আরও সজীব, তৎপর ও কর্মকুশলা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া, 'প্রফুল্লকুমারী'কে অনুশীলনের উদাহরণস্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী' নামের সঙ্গে যুক্ত হইবার পূর্বে প্রফুল্ল ছিল 'অশিক্ষিতপটু'। সাংসারিক ভোগে অনুৎসেকিনী হইলেও নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষা ও নিষ্কাম কর্মে শিক্ষা তাহার হয় নাই। 'দেবী চৌধুরাণী'রূপেই তাহার 'কর্মশিক্ষা' হইয়াছে। ভবানী পাঠকের 'শাণিত অস্ত্র' প্রয়োগক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছে 'দেবী চৌধুরাণী'র মধ্যেই। অমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইয়াও দেবী সন্ন্যাসিনী। শ্বশুর হরবল্লভ তাহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত, 'তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী', কারণ, "যার ধর্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।" নিজের রক্ষার সুযোগ থাকিতেও সে বরকন্দাজদের প্রাণনাশের আশঙ্কায় সে সুযোগ গ্রহণ করে নাই, এমন কি স্বামীর প্রাণ বাঁচাইতেও সে সুযোগ উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছে, 'আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই।'—ইহাই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম। 'দেবী চৌধুরাণী'রূপে প্রফুল্ল এই নিষ্কাম কর্ম শিক্ষা করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়া সংসারের সকলকে সুখী করিয়াছে। অদ্বিতীয়া মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা হইয়াও যে সে গৃহধর্মে বিদ্যা ফলায় নাই, ইহা 'দেবী চৌধুরাণী'র অনুশীলনের ফল। কাজেই উপন্যাস মধ্যে 'দেবী চৌধুরাণী'র ভূমিকা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। প্রফুল্লের ত্যাগ, উপস্থিতবুদ্ধি, কর্মকুশলতা, পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার অধিকাংশই দেবী চৌধুরাণীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। প্রফুল্ল পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে। এই সকল দিক হইতে গ্রন্থের 'দেবী চৌধুরাণী' নাম যথাযোগ্যই হইয়াছে।

১০ 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে কৌতুক-হাস্য

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যে নয়টি ভাবকে স্থায়ী ভাবের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের ভিতর হাস্য একটি। রস পর্যায়ে হাস্যের স্থান মুখ্য না হইলেও, তাহার প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। 'সর্বং দুঃখম্'—জীবনের এই সংজ্ঞায় হাস্য যেন দুর্লভ আশ্রয়। ইহা দুঃখের ভারকে লঘু করে, সমস্যাপীড়িত জীবনে মুহূর্তে একটি 'ছুটি'র আমেজ সৃষ্টি করিয়া আমাদের সঙ্কোচ-আবরণকে মুক্ত করিয়া দেয়। হাস্য যেন জীবন-আকাশে স্বচ্ছ শুভ হাল্‌কা মেঘের সঞ্চরণ।

হাস্যের ভার লঘু বা হাল্‌কা হইলেও হাস্যরস সৃষ্টি সহজ নয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, বিকৃত আকৃতি, বিকৃত বাক্য, বিকৃত বেশ ও চেষ্টাদি হইতে হাস্যের উদ্ভব হয়।[১] বিদ্বান্ Aristotleও মনে করেন, হাস্যের উপাদান **'some defect or ugliness'**; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহির হইতে কতকগুলি বিকৃত বিভাব সৃষ্টি করিলেই হাস্যরস হয় না। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন, জীবনের গভীরে লেখকের অনুপ্রবেশ।

হাস্যেরও আবার প্রকারভেদ আছে। কোন-কোন হাসি বিদ্রূপ-প্রধান, তাহাতে থাকে ব্যঙ্গের কশাঘাত; কোন-কোন হাসি স্থূল ভাঁড়ামি, তাহা প্রায়ই রুচির সীমা লঙ্ঘন করে; কোন-কোন হাসির উপকরণ শব্দের মারপ্যাঁচ বা উক্তির চাতুর্য। সত্যকারের হাস্যরস (Humour) এগুলি হইতে স্বতন্ত্র। চিন্তা নায়ক লীকক বলেন, **'Humour may be defined as the kindly contemplation of life and the artistic expression there of.'**[২]

বস্তুতঃ জীবনের সঙ্গে সুগভীর পরিচয় ও জীবনের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি হইতেই প্রকৃত হাস্যরসের উদ্ভব। কেহ কেহ মনে করেন, খাঁটি হাস্য অশ্রুর সগোত্র। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, কৌতুক ও দুঃখ পীড়নের মাত্রাভেদ মাত্র:

"অর্থাৎ, অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে, তখনি আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়।"[৩]

বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম রুচিসম্মত হাস্যরসের প্রয়োগ ছিল সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাস্যরস ছিল স্থূলতা-নির্ভর ও বিদ্রূপাত্মক। ঈশ্বরগুপ্ত-দীনবন্ধুর হাস্যও

---

১. বিকৃতাকার বাগ্বেশ চেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ভবেৎ।—সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিঃ।
২. Humour and Humanity.
৩. পঞ্চভূত (কৌতুকহাস্যের মাত্রা)—রবীন্দ্রনাথ

শ্লীলতার সীমা রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু উত্তরসূরী বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"নির্মল শুভ সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন।...বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথমে দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে।"[১]

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের হাস্যরস বিচারে উপরি-উক্ত মন্তব্যটির গুরুত্ব অসাধারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে হাস্য ব্যঙ্গ-প্রধান, তাহাতে কশাঘাত অতি তীব্র। কিন্তু উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্য উজ্জ্বল ও শুভ্র। ইহারই আলোকে চরিত্র ও ঘটনা দীপ্যমান। গভীর বিষয়বস্তুও ইহার সংস্পর্শে সুন্দর ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

এই উপন্যাসের হাস্য-কৌতুকের প্রধান বিভাব—গোবরার মা ও ব্রহ্মঠাকুরাণী। উভয়েই বৃদ্ধা। উপরন্তু গোবরার মা কানে খাট। এক বলিতে আর শুনিলে, বা এক কথার উত্তরে অবান্তর অন্য কথা বলিলে সহজেই হাস্যের উদ্রেক হয় এবং হইয়াছেও তাহাই। কিন্তু রসিক বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রের অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছেন আরও গভীরে। সংসারে একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা নিতান্ত অকেজো হইয়াও কৃতকার্যতার ভাণ করে। গোবরার মাও সেই শ্রেণীর। আসলে সে অকর্মা, অথচ বলে, 'আমি একাই তোমার কাজ করে দেব।' এইখানেই হাস্য উত্তাল হয় এবং প্রফুল্লের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে হয়, 'বাছা, তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।' গোবরার মার আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণাও উপভোগ্য।

ব্রহ্মঠাকুরাণীও হাস্যরসের সার্থক বিভাব। তাঁহার তিনকাল গিয়া এককাল বাকী; তাঁহার পুরুষার্থ গঙ্গালাভ, সাধন তদ্গতচিত্তে মালা জপ। কিন্তু সংসারের নাতি-নাতবৌদের আবদারে-অত্যাচারে তিনি অস্থির। কেউ তাহার চরকা ভাঙে, কেউ অসময়ে রূপকথা শুনিবার আবদার তোলে। ইহকাল ও পরকালের দ্বন্দ্বদোলায় সন্ত্রস্ত বৃদ্ধার এই ভাবটিই হাস্যের উপাদান। অবশ্য ব্রহ্মঠাকুরাণী নিজেও রসের

১, আধুনিক সাহিত্য (বঙ্কিমচন্দ্র): রবীন্দ্রনাথ।

নির্ঝর। তাই লেখক তাঁহার মহলকে বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মঠাকুরাণীর নিকুঞ্জ'। এই নিকুঞ্জে কুলীন বর ও কুলীন বধূদের অনেক কীর্তির কথাই শোনা যায়, আর শোনা যায় রূপকথার ছলে 'অনেক বিরহ-সন্তপ্ত এবং বিবাহ-প্রয়াসী রাজপুত্রের উপকথা।' কিন্তু হাসির বিষয় এই যে, এই অদ্ভুত রূপকথা শুনিতে শুনিতে কোন শ্রোতা ঘুমাইয়া পড়ে, কোন শ্রোতার মনে সে উপকথা বিন্দুমাত্র দাগও কাটিতে পারে না।

দুষ্ট চরিত্রের নষ্টামি বর্ণনাতেও হাস্যরস বঙ্কিমকটাক্ষে বিলসিত। 'কৃতাভিসারা, তাম্বূল রাগরক্তাধরা, রাঙ্গাপেড়ে শাড়ীরপড়া, হাসিতে মুখভরা' ফুলমণির বিশেষণ গুলি কৌতুককর। সর্বাপেক্ষা কৌতুককর বাবু দুর্লভ চক্রবর্ত্তীর পলায়ন দৃশ্যটি। এই প্রসঙ্গে দুর্লভসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দ্রুতপদ জীব' অভিধাটি তির্যক হাস্যের একটি সার্থক দৃষ্টান্ত। কাছারি বাড়ীতে যাহার দোর্দণ্ড প্রতাপ, ডাকাতের নাম শুনিয়াই তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে বেগে ধাবমান। কাঁটাবনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া মানী বীরের এই চলন্ত ছবি—হাসির চিত্র হিসাবে অমর। এই প্রসঙ্গে দেবীর বজরায় হরবল্লভের চিত্রটিও স্মরণীয়। হরবল্লভ জমিদার, মানী ব্যক্তি। কিন্তু দেবীর বজরায় দেবীকে নিশানবন্দী করিতে গিয়া তাঁহার নাকাল অবস্থা। তিনি "সাহেবকে সেলাম্ করিতে গিয়া, ভুলিয়া নিশিকে সেলাম করিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া নিশি কহিল, 'বন্দেগী খাঁ সাহেব! মেজাজ সরিফ?' শুনিয়া দিবা বলিল, 'বন্দেগী খাঁ সাহেব! আমায় একটা কুর্ণিস হলো না—আমি হলেম এদের রাণী।' প্রমাদগ্রস্ত হরবল্লভ। "তাঁহার ঊর্দ্ধ চতুর্দশ পুরুষের ভিতর কখনও দেবীকে দেখেন নাই। কি করেন, ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিশিকে দেখাইয়া দিলেন। নিশি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া, 'ভুল হইয়াছে' বলিয়া হরবল্লভ দিবাকে দেখাইলেন। দিবা লহর তুলিয়া হাসিল। বিষণ্ণ মনে হরবল্লভ আবার নিশিকে দেখাইল। সাহেব তখন গরম হইয়া উঠিয়া, হরবল্লভকে বলিলেন, "টোম্ বড় জাটৃ—শূওর! তোম্ পছান্‌টে নেহি?"

অবস্থা বিশেষে মানীর এই অপমান হাস্যকর। হরবল্লভের ধর্মকর্ম বাইরের চাল মাত্র। বিপদের সময় 'পদচ্যুত' হইয়া তাঁহার দুর্গানাম জপের নিষ্ফলতা সম্পর্কে ভাবনাটিও কৌতুক কর। হরবল্লভ ভাবিলেন, 'নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গা নাম জপিয়া কি হইবে?" তিস্তার বুকে প্রচণ্ড ঝড়ের গর্জনে প্রাণান্তকর বিপদের মুখে জীবনের অসঙ্গত আচরণ লইয়া হাস্যের লহর তুলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অশেষ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এ সকল হাসি সুগভীর জীবন-বোধের পরিচয় বহন করে।

ইহা ছাড়া ব্রজেশ্বরের পরিহাস-রসিকতা, সন্ন্যাসিনী নিশার হাস্যকৌতুকও এই উপন্যাসে রসের প্রবাহ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্য শুধু ব্যষ্টি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হয় নাই, সমষ্টিগত ভাবে গ্রামবাসীদের চরিত্র, ব্রজেশ্বরের সাগরের পিত্রালয়ে গমনোপলক্ষ্যে তত্রত্য জেলে, গোয়ালা, কাপড়ের ব্যাপারী ও পাড়ার মেয়েমহলের চেষ্টা-চরিত্রেও হাসির লহর উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বৌ দেখা উপলক্ষ্যে ভূতনাথ গ্রামের প্রতি-বাসিনীদের বিচেষ্টা ও মন্তব্যও কৌতুকের খোরাক জোগাইয়াছে। কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মানুষের চিন্তা ও চেষ্টা কিরূপে অসঙ্গত হইয়া উঠিয়া আমাদের স্বাভাবিক পরিমিতিবোধের সীমা অতিক্রম করে, লোক-চরিত্রজ্ঞ বঙ্কিম তাহা দেখিয়াছেন এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই হাস্য-কৌতুক সৃষ্টিতে প্রধান উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। স্রষ্টার গাম্ভীর্য ও নিরপেক্ষতা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। কৌতুক স্রষ্টা হিসাবে এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে হাস্যের ক্ষেত্রটা একটু বেশি প্রসারিত, কৌতুকের আয়োজনও তুলনায় প্রচুর। ইহার কারণ কি?

'দেবী চৌধুরাণীর' কাহিনী বিয়োগান্ত নয়, মিলনান্ত। কিন্তু এই মিলনান্ত উপন্যাসের সূচনা কারুণ্যে পূর্ণ। একটি দুঃখময় ঘটনা লইয়া এই কাহিনীর আরম্ভ। রূপ ও গুণ থাকিতেও একটি গৃহবধূ এখানে শ্বশুরগৃহ হইতে নির্বাসিতা। বধূর মায়ের সংসারটিও দারিদ্র্য-দুঃখে ভরা। শ্বশুরের আশ্রয় লইতে গিয়া বধূ প্রত্যাখ্যাতা হইল। উপরন্তু তাহার মায়ের মৃত্যুতে সে আরও অনাথ হইয়া পড়িল। দুঃখের বোঝা নামিল না। অনাথা বধূ অপহৃতা হইল। ঘটনাক্রমে বহুধনের মালিক হইয়াও সে ডাকাতের হাতে পড়িল। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে দুঃখের ভার অত্যন্ত গুরু। উপরন্তু এই খণ্ডেই চাপিয়াছে অনুশীলন তত্ত্বের গুরু ভার। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভারগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। শিল্পীর দায়িত্ববোধও তাঁহার ছিল। তাই শুদ্ধ হাস্যের জ্যোতি বিকিরণ করিয়া তিনি দুঃখ ও তত্ত্বের অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডও ডাকাইতি, ষড়্‌যন্ত্র ও তিস্তার বুকে কালবৈশাখীর ঝড়ে উত্তাল। ইতিহাসের খরস্রোত যেন ত্রিস্রোতার মতই বেগবান্ ও ক্ষুরধার। সেই স্রোতে ঘটনার গতিবেগও অতিশয় প্রচণ্ড। পাঠকের মন যেন মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম লইবার অবকাশ পায় না। দক্ষ শিল্পী বঙ্কিম তাই ফাঁকে ফাঁকে কৌতুক দীপ্তি ছড়াইয়া হাস্যের দীপাবাসে বিরামের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে তত্ত্বের

সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া জানে—কেন না, তুমি সন্ন্যাসিনী, যার মত পরের মঙ্গল কামনা কর, অকাতরে ধন দান কর।" (দেবী চৌ. ২/১০)

শুধু তাই নয়, দেবীর নিষ্কাম কর্মের পরীক্ষা অন্যভাবেও হইয়াছে। দেবী জানে, শ্বশুর তার অমঙ্গলকারী, 'তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কারণ, যার ধর্ম নিষ্কাম সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।' বরকন্দাজদের প্রাণ বিনষ্টির আশঙ্কায় সে আত্মরক্ষাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে, এমন কি স্বামীর প্রাণ রক্ষার প্রশ্নেও সে বলিয়াছে, 'আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার অধিকার আমার নাই।' স্বাভাবিক পরার্থপরতা বশেই দৃঢ়সঙ্কল্পে সে বলিতে পারিয়াছে, 'আমি একা ধরা দিব, আমি একা ফাঁসি যাব।' দেবী চৌধুরাণীর ভূমিকাতেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহার অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা, অকুতোভয়তা ও আশ্চর্য কর্মকুশলতা। ইতিহাসের এই তেজস্বিতার ভূমিকা দেখিয়াই, কেহ কেহ তাহার মধ্যে 'বাঙ্গালীয়ানা'র অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, পাঠকজীর নির্দেশ সত্ত্বেও প্রফুল্ল একাদশীতে মাছ খাইয়া সধবার ধর্ম-রক্ষা করিত। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব সমর্পণের কথায় সে বলিত, 'স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।' স্বামীর সঙ্গে ছলনা করিতে তাহার গলা ধরিয়া আসিয়াছে, ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে আঙ্গটি পরাইতে গিয়া দেবীর মুখ চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। অশ্রুমুখী পতি-পরায়ণা কমনীয়-স্বভাব এই বধূ কি বাঙ্গালীর ঘরের বধূ নয়?

প্রফুল্ল আগাগোড়াই 'বঙ্গের বধূ বুকভরা মধু'র প্রতীক। ত্যাগে, ধৈর্যে, সেবায় ও পরার্থপরতায় প্রফুল্ল আদর্শ গৃহলক্ষ্মী। অনুশীলনে গৃহলক্ষ্মীর গুণ পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। দেবী চৌধুরাণীর কর্মজীবন তাহাকে আরও স্থিরবুদ্ধি, কর্তব্য-পরায়ণ, তেজস্বী ও কর্মকুশল করিয়া তুলিয়াছে। তাই দেবী চৌধুরাণীর ভূমিকার অবসানে যখন আবার সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তখন গৃহকে সে সুখশান্তি ও প্রীতির আধার করিয়া তুলিয়াছে। সাগর প্রশ্ন করিয়াছিল, "রাণীগিরির পর কি বাসন মাজা ঘরঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে?" স্বীয় প্রত্যয়ে স্থির প্রফুল্ল উত্তর করিয়াছে, 'ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম……কঠিন ধর্মও এই সংসারধর্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।" প্রফুল্ল এই সংসারধর্ম পুনসংস্থাপনে সার্থক হইয়াছে। 'প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল।' গ্রন্থকারও গার্হস্থ্য আশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য

প্রফুল্ল-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব প্রফুল্ল-চরিত্রে অসঙ্গতি নাই, উহা অবাস্তবও নয়।

কেহ কেহ প্রফুল্লকে 'অবতার' রূপে ঘোষণা করার বিরুদ্ধেও আপত্তি তুলিয়াছেন। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের অবতার-তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম না করার ফলেই এই বিভ্রান্তি। বঙ্কিমের মতে, অনন্ত-প্রকৃতি ঈশ্বরের অনুকরণকারী মনুষ্য বা গুণাধিক্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহারাই ঈশ্বরাংশ বা মানবদেহধারী ঈশ্বর বা অবতার। গীতার দশম অধ্যায়ও এই মতের পরিপোষক।[১] গার্হস্থ্য আশ্রম ধর্মের দিক হইতে প্রফুল্লের ভূমিকা ঈশ্বরাংশের স্ফূর্তি। এই হিসাবেই প্রফুল্ল অবতার। প্রফুল্ল নূতন নয়, পুরাতন। বঙ্কিমচন্দ্র নব্যযুগে সংসার আশ্রম ধর্মের বিপর্যয়ের ভিতর[২] তাই প্রফুল্লকে গার্হস্থ্য আশ্রম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে 'অবতার' রূপে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন উঠিয়াছে, অবতাররূপে প্রফুল্ল কোন্ দুষ্কৃতকে বিনাশ করিয়াছে, কোন্ নূতন ধর্মের সংরক্ষণ বা সংস্থাপন করিয়াছে। এ প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দিয়াছেন ঃ

"ধর্মসংরক্ষণ কি কেবল দুই একটা দুরাত্মা বধ করিলেই হয়। ধর্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে? আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম। এই ধর্ম অনুশীলন সাপেক্ষ এবং অনুশীলন কর্মসাপেক্ষ। অতএব কর্মই ধর্মের প্রধান উপায়। এই কর্মকে স্বধর্মপালন (Duty) বলা যায়।" (কৃষ্ণচরিত্র, ১।১৩)।

অনুশীলিতধর্মা প্রফুল্লও এই স্বধর্মপালন করিয়া চিরন্তন গার্হস্থ্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

১. যদ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্। গীতা ১০/৪১

২. 'পিতা এখন 'My dear father'—অথবা বুড়ো বেটা। মাতা বাপের পরিবার। বড় ভাই জ্ঞাতিমাত্র, শিক্ষক মাস্টার বেটা।...যে স্বামী দেবতা ছিলেন তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধুমাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে পারি না,—কেননা লক্ষ্মীই আর মানি না।' (ধর্মতত্ত্ব ঃ ১/১০)

॥ ব্রজেশ্বর ॥

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য চরিত্র ব্রজেশ্বর। পুরুষ-চরিত্রগুলির ভিতর ব্রজেশ্বরই মুখ্য। এই চরিত্রটি সম্পর্কেও সমালোচক মহলে বিরুদ্ধ মত উত্থিত হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'ব্রজেশ্বর ব্যক্তিত্বহীন'।[১] ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ব্রজেশ্বরকে……ব্যক্তিত্বহীন করিয়া ফেলেন নাই।" কোন্ মতটি গ্রহণযোগ্য ?

ব্রজেশ্বরের চরিত্র-বিচারে মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'দেবী চৌধুরাণী' নায়ক-প্রধান উপন্যাস নয়, নায়িকা-প্রধান। নায়িকার কার্যকারিতার তুলনায় ব্রজেশ্বরের কর্মভূমিকা অল্প। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে এই একটি চরিত্র, যাহাকে বিচিত্র দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, মানসিক সংঘাতও দেখান হইয়াছে এই চরিত্রেই। এই সংঘাতের ফলে ব্রজেশ্বরের যে চরিত্রটি বিকশিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে ব্যক্তিত্ববর্জিত বলা চলে না। ব্রজেশ্বর সাংখ্যের পুরুষের মত শুধু সাক্ষী, দ্রষ্টা বা ভোক্তা নয় ; বিষমভার্য গৃহে ব্রজেশ্বর আদর্শ পতি, প্রতিকূল অবস্থার ভিতর ব্রজেশ্বর পিতৃভক্ত পুত্র, বিপদে সে নির্ভীক। ব্রজেশ্বর উদ্ধত নয়, অপিচ বিনয়ী ও পরিহাসপ্রিয়।

বাংলাদেশেরই একজন কবি প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বলিয়াছিলেন, সপত্নীসঙ্কুল গৃহে কোন পত্নীর প্রতি বিষম ব্যবহার করিলে বিষম ভারবাহী ভারীর মত পতির পক্ষে গৃহবাস সুদুর্বহ হইয়া উঠে।[২] কিন্তু সতীন লইয়া ঘর করিলেও ব্রজেশ্বরের পক্ষে গৃহবাস দুর্বহ হয় নাই। তাহার ভিতর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার একটি ক্ষমতা ছিল। ব্রজেশ্বর কলহপরায়ণা নয়নতারাকে লইয়াও ঘর করিয়াছে, সাগরবৌয়ের সঙ্গে মান-অভিমানে রসের সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছে। প্রফুল্ল সম্পর্কেও সে নিষ্ঠুর হইতে পারে নাই। স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিলেও সে বুঝিয়াছে, একটি সোনার প্রতিমাকে তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইয়াছে। একে প্রফুল্লের রূপে ব্রজেশ্বর মুগ্ধ, উপরন্তু একদিনেই সে বুঝিয়াছিল 'প্রফুল্লের বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর।' কাজেই উন্মাদকর মোহের সঙ্গে করুণার মিশ্রণে তাহার অনুরাগ প্রগাঢ়। তাই সে সকলের অলক্ষ্যে প্রফুল্লের খোঁজে গিয়াছে,

১. বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : ডঃ সুকুমার সেন।
২. আর্যা সপ্তশতী : গোবর্ধন আচার্য।

প্রফুল্লের মৃত্যুসংবাদে অন্তর্দ্বন্দ্বে শয্যা আশ্রয় করিয়াছে। প্রফুল্ল ডাকাত—এই কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বরের অন্তরে যুগপৎ যে ভাবের তরঙ্গ খেলিয়া গিয়াছে, তাহাতেও ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু ক্রমে এই দ্বন্দ্ব অপসারিত হইয়াছে। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের সত্য পরিচয় পাইয়া বুঝিয়াছে, প্রফুল্ল দস্যুনেত্রী মাত্র নয়, সে 'মহামহিমময়ী,' 'যথার্থ দেবী বটে।'

আর একটি দিক হইতেও ব্রজেশ্বরের ভিতর সহিষ্ণুতা ও সমীকরণী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। হঠকারী পিতার পুত্র হইয়াও ব্রজেশ্বর পিতৃভক্তি হারায় নাই। 'পিতা স্বর্গঃ' মন্ত্র তাহাকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ধৈর্য ধরিতে শিখাইয়াছে। পিতাকে 'গোইন্দা' জানিয়াও সে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারায় নাই, বরং পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য দেবীকে অনুরোধ করিয়াছে। কেহ কেহ ব্রজেশ্বরের এই আচরণের মধ্যে তাহার প্রতিবাদহীন নিস্তরঙ্গ ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রজেশ্বরকে বিচার করিয়াছেন আধুনিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে, যেখানে ধূর্ত পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের উদ্ধত প্রতিবাদ স্বভাবসঙ্গত। ভারতীয় গার্হস্থ্যনীতিতে এ ঔদ্ধত্য অবাঞ্ছিত। ব্রজেশ্বর হিন্দু পরিবারের পুত্র। প্রতিকূল পরিবেশে পিতার প্রতি শ্রদ্ধাকে চিরজাগ্রৎ রাখার মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রনীতি প্রকট

ব্রজেশ্বরের নির্ভীকতাও প্রশংসনীয়। 'ঘোড়ায় চড়িতে ব্রজেশ্বর খুব মজ্‌বুত'। বন্দুক, ঘুষি ও তরবারি চালনাতেও সে সুদক্ষ। রঙ্গরাজের নিকট সে সহজে বশ্যতা স্বীকার করে নাই, বন্দী হইয়া ডাকাত দেবী চৌধুরাণীর কাছে যাইতেও সে ভীত হয় নাই। সর্বোচ্চ সাহসের কাজ, 'সাহেবের গালে বিরাশী সিক্কার এক চপেটাঘাত।'

পরিহাস-প্রিয়তাও ব্রজেশ্বরের চরিত্রের বিশেষ গুণ। ব্রহ্মঠাকুরাণীর সহিত আলাপে, রঙ্গরাজ-ব্রজেশ্বর সংবাদে ও দেবীরাণীর বজরায় নিশি বা ছদ্মবেশিনী সাগরের সহিত আলাপ-ব্যবহারে এই পরিহাস-প্রিয়তার পরিচয় সুস্পষ্ট। ব্রজেশ্বরের ব্যক্তিত্ব প্রকট হইয়াছে তাহার ধৈর্যে, নির্ভীকতায় ও আত্ম-সংবরণে।

॥ হরবল্লভ ॥

"হরবল্লভবাবু খুব বড় মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারী আছে, দোতলা বৈঠকখানা, ঠাকুর বাড়ী, নাটমন্দির, খিড়কিতে বাগান, পুকুর প্রাচীরে বেড়া।"

ইনি ব্রজেশ্বরের পূজনীয় পিতা, প্রফুল্লের শ্বশুর। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী হিন্দু

জমিদার তখন অবক্ষয়ের মুখে। জমিদার ইজারাদারের অধীন, সমাজেরও মুখাপেক্ষী। হরবল্লভের চরিত্র-নিয়ন্ত্রণে প্রথম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সমাজ। সমাজনিন্দাভয়েই তিনি লোকের মিথ্যা প্রচারে পুত্রের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীকে বাগ্দীর মেয়ে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, পাড়াপড়শীর পুনরায় অনুরোধ সত্ত্বেও তাহাকে গ্রহণ করেন নাই। প্রফুল্লের প্রতি হরবল্লভের নিষ্ঠুরতার ইহাই প্রধান কারণ। নিষ্ঠুরতা জাত-ক্রোধে পরিণত হইয়াছিল। এ ক্রোধের কাছে হৃদয়ধর্মের কোন মূল্য ছিল না। অসহায় গৃহবধূকে তিনি ঝাঁটা মারিয়া বিদায় দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এ সম্পর্কে স্ত্রীর অনুরোধও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

হরবল্লভ ছিলেন বিষয়ী ও স্বার্থান্বেষী। অর্থবান্ শ্বশুরের টাকার লোভে তিনি পুত্রের তৃতীয় বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সমস্ত দিক হইতে হরবল্লভ 'পাষণ্ড'। অথচ ধর্মের ঠাটও তাঁহার ছিল। বাড়ীতে দোলদুর্গোৎসব, ক্রিয়াকর্ম, দানধ্যানও ছিল। নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদিও তিনি করিতেন। পিতৃশ্রাদ্ধও বাদ যাইত না। কিন্তু এই ধর্ম-কর্মের সঙ্গে তাহার অন্তরের কোন যোগ ছিল না। ধর্মকর্ম আনুষ্ঠানিক, উহা যেন জমিদারীর 'চাল' মাত্র।

হরবল্লভের জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় কলঙ্ক স্বার্থান্ধ হইয়া পরোপকারী দেবীচৌধুরাণীকে ইংরাজের নিকট ধরাইয়া দিবার চক্রান্ত। এই হীন গোইন্দাগিরি বিড়ালতপস্বীর মুখোস খুলিয়া দিয়াছে। এই ঘটনা তৎকালীন সুযোগসন্ধানী জমিদার চরিত্রকে অনাবৃত করিয়া দেখাইয়াছে। দেবী চৌধুরাণীর কৌশলে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু এ হীনতার কোন ক্ষমা নাই।

অবশ্য হরবল্লভের হৃদয় বলিয়া কোন বস্তু ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। মেঘে বিদ্যুৎরেখা থাকে। ব্রজেশ্বরের প্রাণান্ত পীড়ায় তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 'আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোন কাজ করিব না।' পুত্রের মস্তকে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করার প্রস্তাবে হরবল্লভ গর্জিয়া উঠিয়াছেন।

মুখে যাহাই বলুন, কার্যতঃ হরবল্লভ স্বার্থপর, হীন ও ইংরাজের তাঁবেদার। নিশি ঠিকই বলিয়াছেন, 'তুমি জুয়াচোর, কৃতঘ্ন, পামর।' অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ী জমিদার-চিত্র ও তাহার দোষ-গুণ হরবল্লভে প্রতিফলিত হইয়াছে।

॥ ভবানী পাঠক ॥

ইতিহাসের বিখ্যাত দস্যু ভবানী পাঠক বঙ্কিম-হৃদয়ের স্বদেশ প্রেমের অনুরঞ্জনে স্বদেশ প্রেমিকে পরিণত হইয়াছেন। নিবিড় জঙ্গলে প্রফুল্লের সঙ্গে এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল—

'ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলী, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়।" ইনিই ভবানী পাঠক। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। অন্যের চোখে ইনি ডাকাত—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যে অভিপ্রায়ে ডাকাতি, তাহা মন্দ কাজ নয়—তাহা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। দেশের অরাজক অবস্থায় ইহার দল দুরাত্মাদিগের দণ্ডদাতা ও দুর্বলের রক্ষাকর্তা।

অতি অদ্ভুত ভবানী পাঠকের সংগঠন-শক্তি। সহস্র সহস্র বরকন্দাজ তাঁহার বশ। নিমেষে তিনি দলকে একত্র করিতে পারেন। তাঁহার একটি নাগরা বা দামামার ঘায়ে মুহূর্তে কালান্তক যমের মত জওয়ান লাঠি-সড়কি লইয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার নির্দেশে এক রাত্রির মধ্যে 'পিপীলিকা শ্রেণীবৎ বরকন্দাজের দল' সমবেত হইয়া প্রাণ তুচ্ছ করিয়া বন্দুকধারী সিপাহী-সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ায়ে অগ্রসর হয়। জলে ও জঙ্গলে তাহারা সমভাবে অজেয়। ভবানী পাঠকের বিচক্ষণতাও অসাধারণ, মানুষ চিনিবার শক্তিও অপরিসীম।

ভবানী পাঠকের এই শক্তির উৎস তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম। তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টা পরার্থে। তিনি নিজে অনুশীলিত, অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়। তাই তাঁহার কর্ম অভ্রান্ত। তিনিই প্রফুল্লকে অনুশীলন ধর্মে দীক্ষা দিয়া শিক্ষাদ্বারা তাহাকে 'শাণিত অস্ত্রে' পরিণত করিয়াছেন। যেন একটি বহ্নিশিখা হইতে আর একটি বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে।

দস্যুর ভিতর এই অসাধারণত্বের আরোপ বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব দেশপ্রেমিকতার ফল। উপন্যাসের ভবানী পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের মানস সৃষ্টি। ইতিহাসের ভবানী পাঠক হইতে ইনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ধীরতায়, বাগ্মিতায়, শিক্ষকতায়, কর্মকুশলতায় ও লোকপ্রেমে এ চরিত্র অপূর্ব। তাঁহার সকল কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে গীতোক্ত কর্মযোগের মহান্ আদর্শ। দেশের অরাজকতার সময় তিনি দুষ্টের দণ্ডদাতা, শিষ্টের রক্ষাকর্তা। আবার প্রয়োজনের অবসানে তিনি প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনে নিজে ধরা দিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাসের ভবানী পাঠক দস্যু নন, যেন দিব্য সাধক।

॥ রঙ্গরাজ ॥

ভবানী পাঠকের আজ্ঞাবহ সহকারী রঙ্গরাজ। 'তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌ গোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে।' এইজন্য তাহাকে 'দাড়ি বাবাজী'ও বলা হইত। সে দীর্ঘকায়। সেও ব্রাহ্মণ। উপন্যাসে ভবানী পাঠক অপেক্ষা তাহার ভূমিকা অধিকতর সক্রিয়। দেবীর আজ্ঞায় ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া হাজির করিয়াছে রঙ্গরাজ। অতি নিপুণ তাহার ক্রিয়াকলাপ। কেহ জখম হইল না, খুন হইল না, অথচ কৌশলে ডাকাতি সম্পন্ন হইল। রঙ্গরাজ, ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী উভয়েরই 'আজ্ঞাকারী'। কিন্তু দেবীকে সিপাহী সৈন্যেরা ধরিতে আসিয়াছে শুনিয়া দেবীর আদেশ অমান্য করিয়া ভবানী ঠাকুরের সহায়তায় বরকন্দাজ সৈন্যদলকে সংগ্রহ করিয়া সে দেবীর রক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। দেবীকে সে দেখিত মায়ের মত। দেবীর আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্পে সে ক্ষুন্ন হইয়াছে, দ্বিধাগ্রস্তও হইয়াছে। দেবীর গূঢ় কৌশল বুঝিবার মত সাধ্য রঙ্গরাজের ছিল না। এইজন্য সন্ধির নিশানায় সে বিভ্রান্ত হইয়াছে। সাদা নিশানধারী ব্রজেশ্বরকে গোয়েন্দা ভাবিয়া সে সন্দেহও করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবীর ইচ্ছার কাছেই তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। ডাকাতি-পর্বে রঙ্গরাজই দূত, রঙ্গরাজই বরকন্দাজ সৈন্যদের চালক, সকলদিকে সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহারই। এই দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ গঠনের মানুষটিই দেবীকে বিদায় দিতে গিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে এবং দেবীর আদেশ শিরোধার্য-করিয়া ডাকাতি ত্যাগ করিয়া দেবীগড়ে দেবতার প্রসাদভোগী হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছে। আগাগোড়া রঙ্গরাজ কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মতৎপর। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর নিষ্কাম কর্মযজ্ঞে রঙ্গরাজ অধ্বর্যু।

॥ দুর্লভ চক্রবর্তী ॥

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে প্রকৃত দুষ্ট চরিত্র গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তী। ভবানী ঠাকুর-বর্ণিত কাছারির অত্যাচারী কর্মচারীদের জীবন্ত প্রতীক দুর্লভ। সে নিজে নষ্ট, নারীকে নষ্ট করিতেও সে ওস্তাদ। কূট বুদ্ধিতেও সে পারঙ্গম। এই ধরনের লোক ভীরুর ভীরু। প্রাণের ভয় তাহাদের অত্যন্ত বেশী। বঙ্কিমচন্দ্র এ হেন লোকের নাকাল অবস্থা দক্ষহস্তে চিত্রিত করিয়াছেন উপন্যাসের প্রথমখণ্ড দশম পরিচ্ছেদে :

'কাঁটা বনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ

ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, এক পায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটাবনে বিঁধিয়া তাঁহার বীরত্বের নিশান স্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে।'

দুর্লভের আবির্ভাব গ্রন্থের মধ্যপথে, অন্তর্ধানও মধ্যপথে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে দিয়া গ্রন্থের বিরাট উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন। শ্বশুর পরিত্যক্তা, মাতৃহীনা সরলা প্রফুল্লকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে দুর্লভ। দুর্লভই 'দেবী চৌধুরাণী' অধ্যায়ের সূচনা করিয়া দিয়া ধূমকেতুর পুচ্ছাঘাতের মত প্রফুল্লের জীবনে প্রচণ্ড পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে।

॥ লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্‌ ॥

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্‌ ইংরাজচরিত্রের প্রতিনিধি। ইংরাজচরিত্রের সাহসিকতা, আত্মম্ভরিতা ও বুদ্ধিমত্তা তাহাতে প্রতিফলিত। ডাকাইত দলকে ধরিবার জন্য রঙ্গপুরের কালেক্টরের নির্দেশে পাঁচশত সিপাহীসহ তিনি গোয়েন্দা হরবল্লভকে লইয়া অগ্রসর হন। ডাকাইত দল যাহাতে জলপথে বা স্থলপথে—কোনপথেই পলায়ন করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে সিপাহী সৈন্য দ্বারা ব্যূহসজ্জা ব্রেনানের সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। ব্রেনান্‌ রণকুশল হইলেও তাঁহার দাম্ভিকতাই তাঁহার পরাজয়ের কারণ। রঙ্গরাজ তাঁহাকে দেবীর বজরায় উঠিতে বারণ করিয়াছিল। সাহেব বলিল, 'পুঃ! পাঁচশ সিপাহী লইয়া তোমাদের জন দুই চারি লোকের কাছে বিপদ্‌!'—এই বলিয়া একজন মাত্র সিপাহী লইয়া তিনি সশস্ত্রে বজরায় উঠিলেন। ইহা সাহসের কাজ নয়, খানিকটা স্থূলবুদ্ধির কাজ। দেবীর শাণিত স্থিরবুদ্ধিকে বুঝিবার মত গভীরতা সাহেবের ছিল না। তাহার ফলেই তিনি দেবীর বজরায় বন্দী হইয়াছিলেন। দেবীর বজরায় বন্দী হইয়া সাহেব ভাবিলেন,

"ডাকাইতের হাত হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? যাহাকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, তাহারই কাছে ধরা পড়িলাম—স্ত্রীলোকের কাছে পরাজিত হইলাম, ইংরেজ মহলে আর কি বলিয়া মুখ দেখাইব? আমার ফিরিয়া না যাওয়াই ভাল।"

এই ভাবনার ভিতর ইংরেজজাতিসুলভ পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পৌরুষ অপেক্ষা ঔদ্ধত্যের পরিচয়ই ব্রেনান্‌চরিত্রে পরিস্ফুট। সাহেব শক্তের ভক্ত, নরমের যম। ব্রজেশ্বরের 'বিরাশী সিক্কার চপেটাঘাত' লাভ করিয়াও তাঁহাকে স্বল্প ক্ষমা প্রার্থনাতেই সন্ধি করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালী চরিত্রের প্রতি ভাল ধারণা

তাঁহার ছিল না। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া হরবল্লভের কান্নায় তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, 'রোও মৎ উল্লুক। মর্‌না একরোজ আলবৎ হ্যায়।' অন্যত্র বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী এমনই মিথ্যাবাদী বটে।" রঙ্গরাজ যখন সাহেবকে মুক্ত করিয়া দেয়, তখনও তিনি ভাবিয়াছেন, 'ইংরেজকে ফাঁসি দেয়, বাঙ্গালীর এত কি ভরসা?' আহত সিপাহীদের চিকিৎসার্থ দেবীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতিকেও তিনি বিশ্বাস করেন নাই?

উপন্যাসে ব্রেনান্‌ অল্প সময়ের জন্য পাঠকের কাছে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এই অল্পসময়ের ভিতরেও তাঁহার সক্রিয় চরিত্রটি রঙে-রেখায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

॥ অন্যান্য নারীচরিত্র ॥

হরবল্লভের গৃহিণী বা ব্রজেশ্বরের মাতা : একটি পরিবারের প্রধান নিয়ন্ত্রী শক্তি গৃহিণী। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি?' হরবল্লভের গৃহিণীর ভিতর গিন্নীপনা থাকিলেও, স্বামীর স্বাধিকার প্রমত্ততায় তিনি অনেকক্ষেত্রে অকৃতকার্য হইয়াছেন। গৃহিণী-সুলভ কোমলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, অতিথিবাৎসল্য ও বুদ্ধিমত্তা থাকিলেও কর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি অনেকসময় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে পারেন নাই। প্রফুল্লকে তিনি গৃহে স্থান দিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তবু প্রফুল্লের রূপে ও গুণে তিনি মুগ্ধ। প্রফুল্লের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিতেও তাঁহার গৃহিণী-ধর্মে বাঁধিয়াছে। স্বামীর কার্কশ্যে ও নিষ্ঠুরতায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রস্নেহও উল্লেখযোগ্য। প্রফুল্লের অভাবে পুত্রের হৃদয়-বেদনা তিনি বুঝিয়াছেন। নয়ান-বৌ ছেলের যোগ্য বৌ নয়, সাগর-বৌ ঘর করে না—এ তথ্য তাঁহার অজানা ছিল না। তাই ব্রজেশ্বরের পুনরায় বিবাহ দিবার প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিলে নববধূ যে প্রফুল্ল, ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রফুল্লের প্রতি দুর্বলতা তাঁহার পূর্বেই ছিল, এখন পুত্রের সমর্থনে তিনি যেন গৃহিণীর তেজ ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহারই দৃঢ়তায় হরবল্লভও নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। পুরাতন বধূই নববধূরূপে গৃহে স্বীকৃতি লাভ করিল। গিন্নীপনায় পাকা মাঝির হাত না থাকিলেও, ব্রজেশ্বরের মাতাকে আনাড়ী বলা চলে না।

নয়ান-বৌ ও সাগর-বৌ : ব্রজেশ্বরের তিন পক্ষের দুই পক্ষ—নয়ান-বৌ ও সাগর-বৌ। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, পুরুষ ব্রজেশ্বরের "তৃপ্তি ও

তুষ্টি সাগর-বৌ, বিরক্তি ও বিধৃতি নয়ান-বৌ এবং ঐশ্বর্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণী।" নয়ান-বৌ হিংসুটে, ঝগড়াটে ও স্বার্থপর। সাগর-বৌয়ের চোখে সে 'কালপেঁচা'। গিন্নীও বুঝিতেন, 'নয়ান-বৌ ছেলের যোগ্য বৌ নয়।' সে অতিশয় ঈর্ষ্যাকাতর—সপত্নী তাহার দুই চক্ষের বিষ। স্বামীর সঙ্গেও বিরূপ ব্যবহার। স্বামীর জন্য সে 'মুড়ো ঝাঁটা' তুলিয়া রাখিতে দ্বিধা বোধ করে না। বশ করার কৌশল না জানিলে এইরূপ বৌ সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে। ছেলেপেলেদেরও সে মানুষ করিয়া গড়িতে পারে না। প্রফুল্লের অনুশীলিত গিন্নীপনায় নয়ান-বৌ বশীভূত হইয়াছে। গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রফুল্ল-অবতারে নয়ান-বৌয়ের পরিবর্তনকে দুষ্কৃতবিনাশের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সংসার-আকাশে সাগর-বৌ যেন লঘুচপল শারদ মেঘ—স্বচ্ছ, শুভ্র, ভারহীন। বয়ঃসন্ধির চাপল্য ও মন্থরতায় অপূর্ব। সে বড়লোকের মেয়ে। বালাবধূরূপে ব্রজেশ্বরের সংসারে তাহার আবির্ভাব। সে রূপকথা শোনে, ব্রহ্মঠাকুরাণীর চরকা ভাঙ্গে।

> 'মুখখানা বড় সুন্দর। কালো কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাপটায় বেড়া··· তার উপর একটু ঘোমটা টানা। ঘোমটার ভিতর দুইটা পদ্ম-পলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙ্গা ঠোঁটে মিঠে মিঠে' হাসি।

সাগরের আকৃতিই তাহার অন্তর-প্রকৃতিরপরিচয়। বাইরে চঞ্চল, অভিমানী—অন্তরখানি মধুমাখা। সংসারে তাহার বনে নাই শুধু নয়ান-বৌয়ের সঙ্গে। প্রফুল্লকে সে প্রথম দর্শনেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রফুল্লকে স্বামি-সঙ্গের প্রথম সুযোগও করিয়া দিয়াছে সে। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে ব্রজেশ্বরের যোগাযোগের সূত্রও সাগর-বৌ। নিষ্কাম কর্মে সাগরের দীক্ষা বা অনুশীলন হয় নাই বটে, তবে গার্হস্থ্য ধর্মে অশিক্ষিত পটুতা তাহার কম ছিল না। গ্রন্থ শেষে সাগর-বৌ মনে-প্রাণে অনুশীলিতধর্মা প্রফুল্লের অনুশিষ্যা।

দিবা ও নিশি : দিবা ও নিশি ভবানী ঠাকুরের অপর দুই শিষ্যা, দেবী চৌধুরাণীর জীবনে দুই সহচরী। ইহাদের মধ্যে দিবার ভূমিকা গৌণ, নিশির ভূমিকা মুখ্য। দিবা অশিক্ষিতা। শাস্ত্রজ্ঞান তাহার নাই। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়—ইহা তাহার কাছে অবিশ্বাস্য। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলেও পরিহাস-রসিকতায় সেও সুপটু। দেবীর প্রতি তাহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল। তাই প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী যাত্রাকালে সেই বেশী কাঁদিয়াছে। তবুও দিবার আলোতে কাহিনী আলোকিত হয় নাই।

তুলনায় নিশির চরিত্র জীবন্ত। নিশিও ভবানী ঠাকুরের শিষ্যা। তাহার একটি পূর্ব ইতিহাস আছে। ছেলেবেলায় তাহাকে ছেলে ধরায় চুরি করিয়া লইয়া যায়। সেই দলেই তাহার মল্লবিদ্যা শিক্ষা। অতঃপর তাহাকে এক রাজবাড়ীতে বিক্রয় করা হয়। রাজবাড়ীতে সে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে। রাজমহিষী তাহাকে কিছু গয়না দেয়। কিন্তু রাজপুত্রের অত্যাচারের ভয়ে সে গহনাসমেত পলাইয়া আসে ও ভবানী ঠাকুরের হাতে পড়ে। ভবানী ঠাকুরের শিক্ষায় নিশি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণা। প্রফুল্লের শিক্ষাকালে সে তাহার নিত্যসঙ্গিনী। নিশির কাছেই প্রফুল্লের বর্ণশিক্ষা ও মল্লবিদ্যা শিক্ষা হয়। দেবী চৌধুরাণীর বজরাতেও নিশি দেবীর সঙ্গিনী। নিশি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতপ্রাণা হইলেও 'ঈশ্বরভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি'—এ শিক্ষা প্রফুল্লের নিকট লাভ করিয়াছে। প্রফুল্লের চোখের জলে সে আন্তরিক সমবেদনা অনুভব করিয়াছে।

দেবীর বজরায় নিশির ভূমিকা সপ্রতিভ ও সক্রিয়। ব্রজেশ্বরের বিরহে প্রফুল্লকে কাঁদিতে দেখিয়া সে বলিয়াছে, 'এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম?' নিশির কাছে 'ব্রজেশ্বর ও বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।' কিন্তু প্রফুল্লের ভিতর তাহার অভাব দেখিয়া সে বলিয়াছে, 'তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।' আবার এই দেবীই যখন অনেক লোকের প্রাণের বিনিময়ে স্বামীর প্রাণ বাঁচাইতে অস্বীকার করিয়াছে, তখন নিশি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছে, 'এই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম শিখিয়াছিল।' নিশি সংসারত্যাগী বৈষ্ণবী হইলেও সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কম নয়। সংসারের লোক-লৌকিকতা, ঘটকালি তাহার জানা। এ যেন শকুন্তলা নাটকের অনসূয়া-প্রিয়ংবদা। সন্ন্যাসিনী হইয়াও সংসারবিষয়ে সহানুভূতিসম্পন্না।

সর্বোপরি নিশির কৌতুকপ্রিয়তা। ত্রিস্রোতার কলকল্লোল, সিপাহী-বরকন্দাজদের 'মারামারি কাটাকাটি', তুফানের মুখে তরঙ্গরাশির ঘোরগর্জনে নিশির পরিহাস-প্রিয়তা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ করিয়া দিয়াছে। দেবী চৌধুরাণীর অবসানে নিশিরও অবসান হইয়াছে। তাহাতে সে অসুখী হয় নাই, বরং উহাকেই তাহার 'সুপ্রভাত' বলিয়া মানিয়া, রাজমহিষী-প্রদত্ত অলঙ্কারে প্রফুল্লকে সাজাইয়া, চোখের জলে তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়াছে। নিশি-চরিত্র সন্ন্যাসিনীর নির্মোহ ত্যাগ ও সংসারীর মমত্ববোধের অপূর্ব সমন্বয়।

গোবরার মা ও ব্রহ্মঠাকুরাণী: কাহিনীর প্রয়োজন সামান্য, শুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুইটি চরিত্র 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে আনা হইয়াছে: গোব্‌রার মা ও ব্রহ্মঠাকুরাণী। উভয়েই বাহাত্তর উত্তীর্ণা বৃদ্ধা, গোব্‌রার মা উপরন্তু 'কোন কোন

কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন কথা শুনিতে পায় না।' ইহাই হাস্য কৌতুকের উপাদান-কারণ। সে নাকি সব কাজই পারে—তুই একটা বাদে। আসলে সে অকেজো। হাট করিতে সে পারে, তবে বেসাতির হিসাব দিতে পারে না। এই উপলক্ষে প্রফুল্লের মৃদুমধুর কটাক্ষটি উপভোগ্য, 'বাছা, তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।' গোবরার মার স্বরূপ-পরিচয়ও রহিয়াছে এই উক্তিটির মধ্যে। তাহার 'আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা'ও উপভোগ্য। খুব সম্ভব প্রফুল্লকে স্বাবলম্বী করিয়া গঠন করিবার উদ্দেশ্যেই ভবানী ঠাকুর তাহাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, নচেৎ তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি হাস্যরসেরই পরিপোষক।

হরবল্লভের সংসারে ব্রহ্মঠাকুরাণী বুড়ী ঠাকুরমা। নাতি-নাত-বৌদের রূপকথা শোনানো ও তদ্গতচিত্তে মালা জপ করাই তাহার কাজ। তবে তাহার নিকুঞ্জ সংসারের সংবাদ-সরবরাহের আস্তানাও বটে। তাই সেখানে সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে সাগর বৌ, নয়ান বৌ, ব্রজেশ্বরেরও আবির্ভাব ঘটে। ফলে সংসারের কোলাহলে মালা জপা বড় হয় না। ব্রহ্মঠাকুরাণীর মুখে কুলীন ঘরের অনেক কথাও শোনা যায়। বর্তমানের সংবাদও তাহার অজানা নয়। 'দেশে বড় ডাকাতের ভয়'—কথাটা ব্রহ্মঠাকুরাণীর মুখেই প্রথম শোনা গিয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে ব্রহ্মঠাকুরাণী যে একেবারে অসংলগ্ন, তাহা বলা চলে না। ব্রজেশ্বরের ভাবান্তর তাহার চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু কারণ সবটুকু বুঝিতে পারে নাই। সাগরেরও অনেক অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছে ব্রহ্মঠাকুরাণী। ব্রজেশ্বরের পুনরায় বিবাহে মত আছে কিনা, তাহা জানিবারও ভার পড়িয়াছে ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপর। একদিন ব্রজশ্বরের মুখে যে ব্রহ্মঠাকুরাণীর রান্না বিস্বাদ লাগিয়াছে, প্রফুল্লের সংসারে আবির্ভাবের পর তাহা 'বেশ' লাগিয়াছে। ইহা লইয়া নাতি-ঠান্দিতে রসিকতাও হইয়াছে। মোটের উপর ব্রহ্মঠাকুরাণী গ্রন্থের অনেকখানিই জুড়িয়া আছেন। বৃদ্ধা ঠানদির চিত্রহিসাবে তাহার চরিত্রটিও সজীব ও বাস্তব। তবু রঙ্গ-রসিকতার ভূমিকাটুকু বাদে, গ্রন্থমধ্যে তাহার ভূমিকা গৌণ।

॥ গ্রামবাসীদের চিত্র ॥

গ্রামবাসীদের চিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাসে এই চিত্র যেমন জীবন্ত, তেমনই কাহিনীর দিক হইতেও প্রয়োজনীয়। গ্রামের লোক সঙ্কীর্ণ ও রটনা প্রিয়। সামান্য কারণে তাহারা মিথ্যার আশ্রয় লয় ও মিথ্যাকথা রটায়। প্রফুল্লের শ্বশুর গৃহ হইতে নির্বাসন এই মিথ্যা রটনার ফল। দরিদ্রা প্রফুল্লের মা বিবাহের রাত্রে কন্যাযাত্রদের কেবল চিড়া-দই দিয়া আপ্যায়ন করিতে চাহিয়াছে—এই অপরাধে,

তুলনায় নিশির চরিত্র জীবন্ত। নিশিও ভবানী ঠাকুরের শিষ্যা। তাহার একটি পূর্ব ইতিহাস আছে। ছেলেবেলায় তাহাকে ছেলে ধরায় চুরি করিয়া লইয়া যায়। সেই দলেই তাহার মল্লবিদ্যা শিক্ষা। অতঃপর তাহাকে এক রাজবাড়ীতে বিক্রয় করা হয়। রাজবাড়ীতে সে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে। রাজমহিষী তাহাকে কিছু গয়না দেয়। কিন্তু রাজপুত্রের অত্যাচারের ভয়ে সে গহনাসমেত পলাইয়া আসে ও ভবানী ঠাকুরের হাতে পড়ে। ভবানী ঠাকুরের শিক্ষায় নিশি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণা। প্রফুল্লের শিক্ষাকালে সে তাহার নিত্যসঙ্গিনী। নিশির কাছেই প্রফুল্লের বর্ণশিক্ষা ও মল্লবিদ্যা শিক্ষা হয়। দেবী চৌধুরাণীর বজরাতেও নিশি দেবীর সঙ্গিনী। নিশি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতপ্রাণা হইলেও 'ঈশ্বরভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি'—এ শিক্ষা প্রফুল্লের নিকট লাভ করিয়াছে। প্রফুল্লের চোখের জলে সে আন্তরিক সমবেদনা অনুভব করিয়াছে।

দেবীর বজরায় নিশির ভূমিকা সপ্রতিভ ও সক্রিয়। ব্রজেশ্বরের বিরহে প্রফুল্লকে কাঁদিতে দেখিয়া সে বলিয়াছে, 'এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম?' নিশির কাছে 'ব্রজেশ্বর ও বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।' কিন্তু প্রফুল্লের ভিতর তাহার অভাব দেখিয়া সে বলিয়াছে, 'তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।' আবার এই দেবীই যখন অনেক লোকের প্রাণের বিনিময়ে স্বামীর প্রাণ বাঁচাইতে অস্বীকার করিয়াছে, তখন নিশি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছে, 'এই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম শিখিয়াছিল।' নিশি সংসারত্যাগী বৈষ্ণবী হইলেও সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কম নয়। সংসারের লোক-লৌকিকতা, ঘটকালি তাহার জানা। এ যেন শকুন্তলা নাটকের অনসূয়া-প্রিয়ংবদা। সন্ন্যাসিনী হইয়াও সংসারবিষয়ে সহানুভূতিসম্পন্না।

সর্বোপরি নিশির কৌতুকপ্রিয়তা। ত্রিস্রোতার কলকল্লোল, সিপাহী-বরকন্দাজদের 'মারামারি কাটাকাটি', তুফানের মুখে তরঙ্গরাশির ঘোরগর্জনে নিশির পরিহাস-প্রিয়তা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ করিয়া দিয়াছে। দেবী চৌধুরাণীর অবসানে নিশিরও অবসান হইয়াছে। তাহাতে সে অসুখী হয় নাই, বরং উহাকেই তাহার 'সুপ্রভাত' বলিয়া মানিয়া, রাজমহিষী-প্রদত্ত অলঙ্কারে প্রফুল্লকে সাজাইয়া, চোখের জলে তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়াছে। নিশি-চরিত্র সন্ন্যাসিনীর নির্মোহ ত্যাগ ও সংসারীর মমত্ববোধের অপূর্ব সমন্বয়।

গোবরার মা ও ব্রহ্মঠাকুরাণী: কাহিনীর প্রয়োজন সামান্য, শুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুইটি চরিত্র 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে আনা হইয়াছে: গোব্‌রার মা ও ব্রহ্মঠাকুরাণী। উভয়েই বাহাত্তর উত্তীর্ণা বৃদ্ধা, গোব্‌রার মা উপরন্তু 'কোন কোন

কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন কথা শুনিতে পায় না।' ইহাই হাস্য কৌতুকের উপাদান-কারণ। সে নাকি সব কাজই পারে—তুই একটা বাদে। আসলে সে অকেজো। হাট করিতে সে পারে, তবে বেসাতির হিসাব দিতে পারে না। এই উপলক্ষে প্রফুল্লের মৃদুমধুর কটাক্ষটি উপভোগ্য, 'বাছা, তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।' গোবরার মার স্বরূপ-পরিচয়ও রহিয়াছে এই উক্তিটির মধ্যে। তাহার 'আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা'ও উপভোগ্য। খুব সম্ভব প্রফুল্লকে স্বাবলম্বী করিয়া গঠন করিবার উদ্দেশ্যেই ভবানী ঠাকুর তাহাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, নচেৎ তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি হাস্যরসেরই পরিপোষক।

হরবল্লভের সংসারে ব্রহ্মঠাকুরাণী বুড়ী ঠাকুরমা। নাতি-নাত-বৌদের রূপকথা শোনানো ও তদ্গতচিত্তে মালা জপ করাই তাহার কাজ। তবে তাহার নিকুঞ্জ সংসারের সংবাদ-সরবরাহের আস্তানাও বটে। তাই সেখানে সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে সাগর বৌ, নয়ান বৌ, ব্রজেশ্বরেরও আবির্ভাব ঘটে। ফলে সংসারের কোলাহলে মালা জপা বড় হয় না। ব্রহ্মঠাকুরাণীর মুখে কুলীন ঘরের অনেক কথাও শোনা যায়। বর্তমানের সংবাদও তাহার অজানা নয়। 'দেশে বড় ডাকাতের ভয়'—কথাটা ব্রহ্মঠাকুরাণীর মুখেই প্রথম শোনা গিয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে ব্রহ্মঠাকুরাণী যে একেবারে অসংলগ্ন, তাহা বলা চলে না। ব্রজেশ্বরের ভাবান্তর তাহার চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু কারণ সবটুকু বুঝিতে পারে নাই। সাগরেরও অনেক অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছে ব্রহ্মঠাকুরাণী। ব্রজেশ্বরের পুনরায় বিবাহে মত আছে কিনা, তাহা জানিবারও ভার পড়িয়াছে ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপর। একদিন ব্রজেশ্বরের মুখে যে ব্রহ্মঠাকুরাণীর রান্না বিস্বাদ লাগিয়াছে, প্রফুল্লের সংসারে আবির্ভাবের পর তাহা 'বেশ' লাগিয়াছে। ইহা লইয়া নাতি-ঠান্দিতে রসিকতাও হইয়াছে। মোটের উপর ব্রহ্মঠাকুরাণী গ্রন্থের অনেকখানিই জুড়িয়া আছেন। বৃদ্ধা ঠানদির চিত্রহিসাবে তাহার চরিত্রটিও সজীব ও বাস্তব। তবু রঙ্গ-রসিকতার ভূমিকাটুকু বাদে, গ্রন্থমধ্যে তাহার ভূমিকা গৌণ।

॥ গ্রামবাসীদের চিত্র ॥

গ্রামবাসীদের চিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাসে এই চিত্র যেমন জীবন্ত, তেমনই কাহিনীর দিক হইতেও প্রয়োজনীয়। গ্রামের লোক সঙ্কীর্ণ ও রটনা প্রিয়। সামান্য কারণে তাহারা মিথ্যার আশ্রয় লয় ও মিথ্যাকথা রটায়। প্রফুল্লের শ্বশুর গৃহ হইতে নির্বাসন এই মিথ্যা রটনার ফল। দরিদ্রা প্রফুল্লের মা বিবাহের রাত্রে কন্যাযাত্রদের কেবল চিড়া-দই দিয়া আপ্যায়ন করিতে চাহিয়াছে—এই অপরাধে,

গ্রামবাসীরা প্রফুল্লের মাতাকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া প্রচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই। সঙ্কীর্ণতার ফলে হৃদয়হীনতা চরমে উঠিয়াছে। সর্বাপেক্ষা ক্ষতি হইয়াছে প্রফুল্লের। শ্বশুরের অন্ন তাহার কপালে জোটে নাই। পুনরায় শ্বশুরের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াও সে প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছে।

গ্রামবাসীদের মন ফিরিয়াছে প্রফুল্লের মাতার মৃত্যুতে। এখানে গ্রামবাসী সহৃদয়। যাহারা একদিন কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই প্রফুল্লের মার সৎকার করিয়া আবার শ্রাদ্ধকালে হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। অতি অদ্ভুত গ্রাম্যলোকের চরিত্র। কিন্তু একদিন যাহারা মিথ্যা বলিয়াছে, তাহাদের সত্যপ্রচার কার্যকরী হয় নাই। বরং হরবল্লভ প্রফুল্লের প্রতি আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাজ হইয়াছে অন্যদিকে। ব্রজেশ্বর এই সংবাদে প্রফুল্লের খবর লইতে উদ্যোগী হইয়াছে।

প্রফুল্লের অপহরণ সংবাদ গোপন করিয়া তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করাও গ্রাম্য লোকেরই কীর্তি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসী নিঃসংশয়ে কুট্টনী ফুলমণির আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করিয়াছে, প্রফুল্লের মরা মা নাকি আসিয়া প্রফুল্লকে লইয়া গিয়াছে। ভৌতিক অন্তর্ধান-কাহিনী শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হইয়া প্রফুল্লের 'স্বাভাবিক' মৃত্যু সংবাদ রূপেই হরবল্লভের গৃহে পৌঁছিয়াছে।

এই মিথ্যা রটনা ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে সত্যরূপেই প্রতিফলিত হইয়াছিল। প্রফুল্লের রূপমোহে সে মুগ্ধ ছিল, উপরন্তু তাহার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে—এই ভাব করুণার সঞ্চার করিয়াছে। প্রেম ও করুণার মিশ্রণে প্রগাঢ় অনুরাগে ব্রজেশ্বরের যে হৃদয় প্রফুল্লময় হইয়া গিয়াছিল, মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে সে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; ব্রজেশ্বর শয্যা আশ্রয় করিয়াছে।

গ্রামবাসীদের রটনাপ্রিয়তা এইভাবে গল্পের নানা উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের হীনতার প্রতিও বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছেন বঙ্কিম-হাস্যে। গ্রামবাসিনীদের নূতন-বৌ দেখার কৌতূহল, নববধূর বয়স সম্পর্কে নানা মন্তব্য এবং কুলীনের ঘরের মেয়েদের সত্তর বৎসরে, এমন কি অন্তর্জলির কালেও বিবাহের প্রসঙ্গে এই ব্যঙ্গপ্রিয়তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। পরচর্চা করিতে, তিলকে তাল করা ও অসম্ভবকে সম্ভব করিতে বঙ্গের প্রতিবাসীদের তুলনা মেলা ভার।

সম্পূর্ণ

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৭৮

পোঃ—গড়িয়া (২৪ পরগণা)

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়াওমুখী।"

"যাই মা।"

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল। বলিল, "কেন মা?"

মা বলিল' "যা না ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।"

প্রফুল্লমুখী বলিল, "আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।"

মা। তবে খাবি কি? আজ ঘরে যে কিছু নেই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা?

মা। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলি। কাঙ্গাল গরিবের চাইতে লজ্জা কি?

প্রফুল্ল কথা কহিল না। মা বলিল, "তুই তবে ভাত চড়াইয়া দে, আমি কিছু তরকারির চেষ্টায় যাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার মাথা খাও, আর চাইতে যাইও না। ঘরে চাল আছে, নুন আছে, গাছে কাঁচা লঙ্কা আছে—মেয়ে মানুষের তাই ঢের।"

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল। ভাতের জল চড়াইয়াছিল, মা চাল ধুইতে গেল। চাল ধুইবার জন্য ধুচুনী হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলিল, "চাল কই?" প্রফুল্লকে দেখাইল, আধ মুটা চাউল আছে মাত্র—তাহা একজনেরও আধপেটা হইবে না।

মা ধুচুনী হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রফুল্ল বলিল, "কোথা যাও?"

মা। চাল ধার করিয়া আনি—নইলে শুধু ভাতই কপালে যোটে কই?

প্র। আমরা লোকের কত চাল ধারি—শোধ দিতে পারি না—তুমি আর চাল ধার করিও না।

মা। আবাগীর মেয়ে, খাবি কি? ঘরে যে একটি পয়সা নাই।

প্র। উপস্ করিব।

মা। উপস্ করিয়া কয়দিন বাঁচিবি?

প্র। না হয় মরিব।

মা। আমি মরিলে যা হয় করিস্, তুই উপস্ করিয়া মরিবি, আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। যেমন করিয়া পারি, ভিক্ষা করিয়া তোকে খাওয়াইব।

প্র। ভিক্ষাই বা কেন করিতে হইবে? একদিনের উপবাসে মানুষ মরে না। এসো না, মায়ে ঝিয়ে আজ পৈতে তুলি। কাল বেচিয়া কড়ি করিব।

মা। সুতা কই?

প্র। কেন, চরকা আছে।

মা। পাঁজ কই?

তখন প্রফুল্লমুখী অধোবদনের রোদন করিতে লাগিল। মা ধুচুনী হাতে আবার চাউল ধার করিয়া আনিতে চলিল, তখন প্রফুল্ল মার হাত হইতে ধুচুনী কাড়িয়া লইয়া তফাতে রাখিল। বলিল, "মা, আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে?"

মা চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল, "সবই ত আছে মা—কপালে ঘটিল কৈ?"

প্র। কেন ঘটে না মা—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বশুরের অন্ন থাকিতে আমি খাইতে পাইব না?

মা। এই অভাগীর পেটে হয়েছিলে, এই অপরাধ—আর তোমার কপাল। নহিলে তোমার অন্ন খায় কে?

প্র। শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে যোটে, তবে খাইব—নইলে আর খাইব না। তুমি চেয়ে চিন্তে যে প্রকারে পার, আনিয়া খাও। খাইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আইস।

মা। সে কি মা! তাও কি হয়?

প্র। কেন হয় না মা?

মা। না নিতে এলে কি শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে?

প্র। পরের বাড়ী চেয়ে খেতে আছে, আর না নিতে এলে আপনার শ্বশুরবাড়ী যেতে নেই?

মা। তারা যে কখনও তোমার নাম করে না।

প্র। না করুক—তাতে আমার অপমান নাই। যাহাদের উপর আমার ভরণ-পোষণের ভার, তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব—তাহাতে আমার লজ্জা কি?

মা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "তোমাকে একা রাখিয়া আমি যাইতে চাহিতাম না—কিন্তু আমার দুঃখ ঘুচিলে তোমারও দুঃখ কমিবে, এই ভরসায় যাইতে চাহিতেছি।"

মাতে মেয়েতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মা বুঝিল যে, মেয়ের পরামর্শই ঠিক।

তখন মা, যে কয়টি চাউল ছিল, তাহা রাঁধিল। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই খাইল না। কাজেই তাহার মাতাও খাইল না। তখন প্রফুল্ল বলিল, "তবে আর বেলা কাটাইয়া কি হইবে? অনেক পথ।"

তাহার মাতা বলিল, "আয় তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।"

প্রফুল্ল বলিল, "না, থাক্।"

মা ভাবিল, "থাক্। আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না।"

মেয়ে ভাবিল, "থাক্। সেজে গুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি!"

তখন দুইজনে মলিন বেশে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম; সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়। প্রফুল্লের দশা যেমন হউক, তাহার শ্বশুর হরবল্লভবাবু খুব বড়মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারী আছে, দোতালা বৈঠকখানা, ঠাকুরবাড়ী, নাটমন্দির, দপ্তরখানা, খিড়কিতে বাগান, পুকুর প্রাচীরে বেড়া। সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মাতা ও কন্যা অনশনে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশকালে প্রফুল্লের মার পা উঠে না। প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া যে হরবল্লভবাবু তাহাকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে। বিবাহের পরে একটা গোল হইয়াছিল। হরবল্লভ কাঙ্গাল দেখিয়াও ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি পরম সুন্দরী, তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন। এদিকে প্রফুল্লের মা, কন্যা বড়মানুষের ঘরে পড়িল, এই উৎসাহে সর্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বিবাহতেই—তাঁর যাহা কিছু ছিল, ভস্ম হইয়া গেল। সেই অবধি এই অন্নের কাঙ্গাল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও—সর্ব্বস্বই তার কত টাকা?—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক্ কুলান করিতে পারিল না। বরযাত্রদিগের লুচি-মণ্ডায়, দেশকাল-পাত্র বিবেচনায়, উত্তম ফলাহার করাইল। কিন্তু কন্যাযাত্রগণের কেবল চিঁড়া দই। ইহাতে প্রতিবাসী কন্যাযাত্রেরা অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা খাইলেন না—উঠিয়া গেলেন। ইহাতে প্রফুল্লের মার সঙ্গে তাঁহাদের কোন্দল বাধিল; প্রফুল্লের মা বড় গালি দিল। প্রতিবাসীরা একটা বড় রকম শোধ লইল।

পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভ বেহাইনের প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা কেহ গেল না—একজন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে কুলটা, জাতিভ্রষ্টা, তাহার সঙ্গে হরবল্লভবাবুর কুটুম্বিতা করিতে হয় করুন,—বড়মানুষের সব শোভা পায়, কিন্তু আমরা কাঙ্গাল গরিব, জাতই আমাদের সম্বল—আমরা জাতিভ্রষ্টার কন্যার পাকস্পর্শে জলগ্রহণ করিব না। সমবেত সভামধ্যে এই কথা প্রচার লইল। প্রফুল্লের মা একা বিধবা, মেয়েটি লইয়া ঘরে থাকে—তখন বয়সও যায় নাই—কথা অসম্ভব বোধ হইল না, বিশেষ, হরবল্লভের মনে হইল যে, বিবাহের রাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহ-বাড়ীতে খায় নাই। প্রতিবাসীরা মিথ্যা বলিবে কেন? হরবল্লভ বিশ্বাস করিলেন। সভার সকলেই বিশ্বাস করিল। নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিল বটে—কিন্তু কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না। পরদিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি প্রফুল্ল ও তাহার মাতা তাঁহার পরিত্যাজ্য হইল। সেই অবধি আর কখন তাহাদের সংবাদ লইলেন না; পুত্রকে লইতেও দিলেন না। পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। প্রফুল্লর মা দুই একবার কিছু সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছিল, হরবল্লভ তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আজ সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে প্রফুল্লর মার পা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন্যা ও মাতা সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কর্ত্তা অন্তঃপুরমধ্যে আপরাহ্নিক নিদ্রার সুখে অভিভূত। গৃহিণী—অর্থাৎ প্রফুল্লের শাশুড়ী, পা ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেছিলেন। এমন সময়ে, সেখানে প্রফুল্ল ও তাহার মা উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল মুখে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার বয়স এখন আঠার বৎসর।

গিন্নী ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কে গা?"

প্রফুল্লের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি বলিয়াই বা পরিচয় দিব?"

গিন্নী। কেন—পরিচয় আবার কি বলিয়া দেয়?

প্রফুল্লের মা। আমরা কুটুম্ব।

গিন্নী। কুটুম্ব? কে কুটুম্ব গা?

সেখানে তারার মা বলিয়া একজন চাকরাণী কাজ করিতেছিল। সে দুই একবার প্রফুল্লদিগের বাড়ী গিয়াছিল—প্রথম বিবাহের পরেই। সে বলিল, "ওগো, চিনেছি গো! ওগো চিনেছি! কে! বেহান?"

(সেকালে পরিচারিকারা গৃহিণীর সম্বন্ধ ধরিত।)

গিন্নী। বেহান? কোন্ বেহান?

তারার মা। দুর্গাপুরের বেহান গো—তোমার বড় ছেলের বড় শাশুড়ী।

গিন্নী বুঝিলেন। মুখটা অপ্রসন্ন হইল। বলিলেন, "বসো।"

বেহান বসিল—প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে গো?"

প্রফুল্লের মা বলিল, "তোমার বড় বউ।"

গিন্নী বিমর্ষ হইয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তোমরা কোথায় এসেছিলে?"

প্রফুল্লের মা। তোমার বাড়ীতেই এসেছি।

গিন্নী। কেন গা?

প্র, মা। কেন, আমার মেয়েকে কি শ্বশুরবাড়ীতে আসিতে নাই?

গিন্নী। আসিতে থাকিবে না কেন? শ্বশুর শাশুড়ী যখন আনিবে, তখন আসিবে। ভাল মানুষের মেয়েছেলে কি গায়ে প'ড়ে আসে?

প্র, মা। শ্বশুর শাশুড়ী যদি সাতজন্মে নাম না করে?

গিন্নী। নামই যদি না করে—তবে আসা কেন?

প্র, মা। খাওয়ায় কে? আমি বিধবা অনাথিনী, তোমার বেটার বউকে আমি খাওয়াই কোথা থেকে?

গিন্নী। যদি খাওয়াইতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন?

প্র, মা। তুমি কি খাওয়া পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে? তা হলে সেই সঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক-পোষাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই?

গিন্নী। আ মলো! মাগী বাড়ী ব'য়ে কোঁদল কর্‌তে এসেছে দেখি যে?

প্র, মা। না, কোঁদল করতে আসি নাই। তোমার বউ একা আস্‌তে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌঁছিয়াছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া প্রফুল্লের মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অভাগীর তখনও আহার হয় নাই।

মা গেল, কিন্তু প্রফুল্ল গেল না। যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল, তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিল, "তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। নড় না যে?

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। কি জ্বালা! আবার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে না কি?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল; চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর করতে পেলেম না!" মন একটু নরম হলো।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নী। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে, তোমায় নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে কর্‌বে বলে, কাজেই তোমায় ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ীর মন আরও নরম হলো। বলিলেন, "কি কর্‌ব মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?"

গিন্নী আর যুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে, তিনি কি বলেন। তুমি এখানে বসো মা, বসো।"

প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল। সেই সময়ে, একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা—সেও সুন্দরী, মুখে আড়ঘোমটা—সে প্রফুল্লকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

প্রফুল্ল ভাবিল, এ আবার কি? উঠিয়া বালিকার কাছে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যখন গৃহিণী ঠাকুরাণী হেলিতে দুলিতে হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্ত্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা, তখন কর্ত্তামহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; হাতে মুখে জল দেওয়া হইয়াছে—হাত মুখ মোছা হইতেছে। দেখিয়া, কর্ত্তার মনটা কাদা করিয়া ছানিয়া লইবার জন্য গৃহিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "কে ঘুম ভাঙ্গাইল? আমি এত ক'রে বারণ করি, তবু কেউ শোনে না।"

কর্ত্তামহাশয় মনে মনে বলিলেন, "ঘুম ভাঙ্গাইবার আঁধি তুমি নিজে—আজ বুঝি কি দরকার আছে?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কেউ ঘুম ভাঙ্গায় নাই। বেশ ঘুমাইয়াছি—কথাটা কি?"

গিন্নী মুখখানা হাসি-ভরাভরা করিয়া বলিলেন, "আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। তাই বল্‌তে এসেছি।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া এবং একটু একটু নথ ও বাউটি নাড়া দিয়া—কেন না, বয়স এখনও পঁয়তাল্লিশ বৎসর মাত্র—গৃহিণী, প্রফুল্ল ও তার মাতার আগমন ও কথোপকথন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন। বধূর চাঁদপানা মুখ ও মিষ্ট কথাগুলি মনে করিয়া, প্রফুল্লর দিকে অনেকটা টানিয়া বলিলেন। কিন্তু মন্ত্র তন্ত্র কিছুই খাটিল না। কর্ত্তার মুখ বৈশাখের মেঘের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এত বড় স্পর্দ্ধা। সেই বাগ্দী বেটী আমার বাড়ীতে ঢোকে? এখনই ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি! ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে—হাজার হোক্, বেটার বউ—আর বাগ্দীর মেয়ে বা কিরূপে হলো? লোকে বললেই কি হয়?"

গিন্নী ঠাকরুণ হার কাত নিয়ে খেল্‌তে বসেছেন—কাজে কাজেই এই রকম বদ রঙ্গ চালাইতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। "বাগ্দী বেটীকে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।" এই হুকুমই বহাল রহিল।

গিন্নী শেষে রাগ করিয়া বলিলেন, "ঝাঁটা মারিতে হয়, তুমি মার; আমি আর তোমার ঘরকন্নার কথায় থাকিব না।" এই বলিয়া গিন্নী রাগে গর্‌গর্ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যেখানে প্রফুল্লকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল সেখানে নাই।

প্রফুল্ল কোথায় গিয়াছে, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। একখানা কপাটের আড়াল হইতে ঘোমটা দিয়ে একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে তাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল। প্রফুল্ল সেখানে গেল। প্রফুল্ল সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল বলিল, "দ্বার দিলে কেন?"

মেয়েটি বলিল, "কেউ না আসে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কব, তাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

সে বলিল, "আমার নাম সাগর, ভাই।"

প্র। তুমি কে, ভাই?

সা। আমি, ভাই, তোমার সতীন।

প্র। তুমি আমায় চেন নাকি?

সা। এই যে আমি কপাটের আড়াল থেকে সব শুনিলাম।

প্র। তবে তুমিই ঘরণী গৃহিণী—

সা। দূর, তা কেন? পোড়া কপাল আর কি—আমি কেন সে হ'তে গেলেম? আমার কি তেমনই দাঁত উঁচু, না আমি তত কালো?

প্র। সে কি—কার দাঁত উঁচু?

সা। কেন? যে ঘরণী গৃহিণী।

প্র। সে আবার কে?

সা। জান না? তুমি কেমন ক'রেই বা জানবে? কখন ত এসো নি, আমাদের আর এক সতীন আছে জান না?

প্র। আমি ত আমি ছাড়া আর এক বিয়ের কথাই জানি—আমি মনে করিয়াছিলাম, সেই তুমি।

সা। না। সে সেই,—আমার ত তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

প্র। সে বুঝি বড় কুৎসিত?

সা। রূপ দেখে আমার কান্না পায়!

প্র। তাই বুঝি আবার তোমায় বিবাহ করেছে?

সা। না, তা নয়। তোমাকে বলি, কারও সাক্ষাতে ব'লো না। (সাগর বড় চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল) আমার বাপের ঢের টাকা আছে। আমি বাপের এক সন্তান। তাই সেই টাকার জন্য—

প্র। বুঝেছি, আর বলিতে হবে না। তা তুমি সুন্দরী। যে কুৎসিত, সে ঘরণী গৃহিণী হলো কিসে?

সা। আমি বাপের একটি সন্তান, আমাকে পাঠায় না; আর আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের বড় বনে না। তাই আমি এখানে কখন থাকি না। কাজে কর্ম্মে কখন আনে। এই দুই চারিদিন এসেছি, আবার শীঘ্র যাব।

প্রফুল্ল দেখিল যে, সাগর দিব্য মেয়ে—সতীন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না। প্রফুল্ল বলিল, "আমায় ডাক্‌লে কেন?"

সা। তুমি কিছু খাবে?

প্রফুল্ল হাসিল, বলিল, "কেন, এখন খাব কেন?"

সা। তোমার মুখ শুক্‌নো, তুমি অনেক পথ এসেছ, তোমার তৃষ্ণা পেয়েছে। কেউ তোমায় কিছু খেতে বল্‌লেন না। তাই তোমাকে ডেকেছি।

প্রফুল্ল তখনও পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু উত্তর করিল, "শাশুড়ী গেছেন শ্বশুরের কাছে মন বুঝ্‌তে। আমার অদৃষ্টে কি হয়, তা না জেনে আমি এখানে কিছু খাব না। ঝাঁটা খেতে হয় ত তাই খাব, আর কিছু খাব না।"

সা। না না, এদের কিছু তোমার খেয়ে কাজ নাই। আমার বাপের বাড়ীর সন্দেশ আছে—বেশ সন্দেশ।

এই বলিয়া সাগর কতকগুলা সন্দেশ আনিয়া প্রফুল্লের মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। অগত্যা প্রফুল্ল কিছু খাইল। সাগর শীতল জল দিল, পান করিয়া প্রফুল্ল শরীর স্নিগ্ধ করিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমি শীতল হইলাম, কিন্তু আমার মা না খাইয়া মরিয়া যাইবে।"

সা। তোমার মা কোথায় গেলেন ?

প্র। কি জানি ? বোধ হয়, পথে দাঁড়াইয়া আছেন।

সা। এক কাজ করব ?

প্র। কি ?

সা। ব্রহ্ম ঠানদিদিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব ?

প্র। তিনি কে ?

সা। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসী—এই সংসারে থাকেন।

প্র। তিনি কি করবেন ?

সা। তোমার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন।

প্র। মা এ বাড়ীতে কিছু খাবেন না।

সা। দূর ! তাই কি বল্‌ছি ? কোন বামুন-বাড়ীতে।

প্র। যা হয় কর, মার কষ্ট আর সহ্য হয় না।

সাগর চকিতের মত ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে যাইয়া সব বুঝাইয়া বলিল। ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিল, "মা, তাই ত ! গৃহস্থবাড়ী উপবাসী থাকিবেন ! অকল্যাণ হবে যে।" ব্রহ্ম প্রফুল্লের মার সন্ধানে বাহির হইল। সাগর ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লকে সংবাদ দিল। প্রফুল্ল বলিল, "এখন ভাই, যে গল্প করিতেছিলে, সেই গল্প কর।"

সা। গল্প আর কি ? আমি ত এখানে থাকি না—থাকৃতে পাবও না। আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মত—তাকে তোলা থাকব, দেবতার ভোগে কখন লাগিব না। তা, তুমি এয়েচ, যেমন করে পার, থাক। আমরা কেউ সেই কালপেঁচাটাকে দেখিতে পারি না।

প্র। থাকৃব বলেই ত এসেছি। থাকৃতে পেলে ত হয়।

সা। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয়, তবে এখনই চলে যেও না।

প্র। না গিয়া কি করিব ? আর কি জন্য থাকিব ?—থাকি, যদি—

সা। যদি কি ?

প্র। যদি তুমি আমার জন্ম সার্থক করাইতে পার।

সা। সে কিসে হবে ভাই ?

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল, চক্ষে জল পড়িল। বলিল "বুঝি নাই ভাই ?"

সাগর তখন বুঝিল। একটু ভাবিয়া, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি সন্ধ্যার পর এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও। দিনের বেলা ত আর দেখা হবে না।"

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখিতেছি না। আমাদের গল্পের তারিখ একশত বৎসর পূর্ব্বে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও যুবতীরা কখন দিনমানে স্বামিদর্শন পাইতেন না।

প্রফুল্ল বলিল, "কপালে কি হয়, তাহা আগে জানিয়া আসি। তার পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। কপালে যাই থাকে, একবার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। তিনি কি বলেন, শুনিয়া যাইব।"

এই বলিয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিল। দেখিল, তাহার শাশুড়ী তাহার তল্লাস করিতেছেন। প্রফুল্লকে দেখিয়া গিন্নী বলিলেন, "কোথা ছিলে মা ?"

প্র। বাড়ী ঘর দেখিতেছিলাম।

গিন্নী। আহা! তোমারই বাড়ী ঘর, বাছা—তা কি করব ? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।

প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ীর বড় দয়া হইল। গিন্নী মনে মনে কল্পনা করিলেন —আর একবার নথনাড়া দিয়া দেখিব। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না—কেবল বলিলেন, "আজ আর কোথায় যাইবে ? আজ এইখানে থাক। কাল সকালে যেও।"

প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া বলিল, "তা থাকিব—একটা কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাহাতে একজন মানুষের একবেলা আহার কুলায় না। জিজ্ঞাসা করিও—আমি কি করিয়া খাইব ? আমি বাগ্দীই হই—মুচিই হই— তাঁহার পুত্রবধূ। তাঁহার পুত্রবধূ কি করিয়া দিনপাত করিবে ?"

শাশুড়ী বলিল, "অবশ্য বলিব।" তারপর প্রফুল্ল উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর সেই ঘরে সাগর ও প্রফুল্ল, দুইজনে দ্বার বন্ধ করিয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া কপাটে ঘা দিল। সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "কে গো?"

"আমি গো।"

সাগর প্রফুল্লের গা টিপিয়া চুপি চুপি বলিল, "কথা ক'স্‌নে; সেই কালপেঁচাটা এসেছে।"

প্র। সতীন?

সা। হ্যাঁ—চুপ!

যে আসিয়াছিল, সে বলিল, "কে গা ঘরে, কথা ক'স্‌নে কেন? যেন সাগর বোয়ের গলা শুনিলাম না?"

সা। তুমি কে গা—যেন নাপিত বোয়ের গলা শুনিলাম না?

"আঃ মরণ আর কি! আমি কি নাপিত বোয়ের মতন?

সা। কে তবে তুমি?

"তোর সতীন! সতীন! সতীন! নাম নয়ান বৌ।"

(বউটির নাম—নয়নতারা—লোকে তাহাকে "নয়ান বৌ" বলিত—সাগরকে "সাগর বৌ" বলিত।)

সাগর তখন কৃত্রিম ব্যস্ততার সহিত বলিল, "কে! দিদি! বালাই, তুমি কেন নাপিত বৌয়ের মতন হতে যাবে? সে যে একটু ফরসা।"

নয়ন। মরণ আর কি—আমি কি তার চেয়েও কালো? তা সতীন এমনই বটে—তবু যদি চৌদ্দ বছরের না হতিস্‌!

সা। তা চৌদ্দ বছর হলো তা কি হলো—তুমি সতের—তোমার চেয়ে আমার রূপও আছে, যৌবনও আছে।

ন। রূপ যৌবন নিয়ে বাপের বাড়ীতে বসে বসে ধূয়ে খাস্‌। আমার যেমন মরণ নাই, তাই তোর কাছে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলেম।

সা। কি কথা, দিদি?

ন। তুই দোরই খুল্‌লি নে, তার কথা কব কি? সন্ধ্যে রাত্রে দোর দিয়েছিস্‌ কেন লা?

সা। আমি ভাই লুকিয়ে ছুটো সন্দেশ খাচ্চি। তুমি কি খাও না?

ন। তা খা খা। (নয়ন নিজে সন্দেশ বড় ভালবাসিত) বলি, জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, আবার একজন এয়েছে না কি?

সা। আবার একজন কি? স্বামী?

ন। মরণ আর কি! তাও কি হয়?

সা। হ'লে ভাল হতো—ছুইজনে ভাগ করিয়া নিতাম। তোমার ভাগে নূতনটা দিতাম।

ন। ছি! ছি! ও সব কথা কি মুখে আনে?

সা। মনে?

ন। তুই আমায় যা ইচ্ছা তাই বলিবি কেন?

সা। তা ভাই, কি জিজ্ঞাসা করবে, না বুঝাইয়া বলিলে কেমন করিয়া উত্তর দিই?

ন। বলি, গিন্নীর না কি আর একটি বউ এয়েছে?

সা। কে বউ।

ন। সেই মুচি বউ।

সা। মুচি? কই, শুনি নে ত।

ন। মুচি, না হয় বাগ্দী?

সা। তাও শুনি নে।

ন। শোন নি—আমাদের একজন বাগ্দী সতীন আছে।

সা। কই? না।

ন। তুই বড় ছুষ্ট। সেই যে, প্রথম যে বিয়ে।

সা। সে ত বামুনের মেয়ে।

ন। হঁ্যা, বামুনের মেয়ে! তা হলে আর নিয়ে ঘর করে না?

সা। কাল যদি তোমায় বিদায় দিয়ে, আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি বাগ্দীর মেয়ে হবে?

ন। তুই আমায় গাল দিবি কেন লা, পোড়ারমুখী?

সা। তুই আর একজনকে গাল দিচ্ছিস্ কেন্ লা, পোড়ারমুখী?

ন। মর্গে যা—আমি ঠাকুরুণকে গিয়া বলিয়া দিই, তুই বড়মানুষের মেয়ে ব'লে আমায় যা ইচ্ছে তাই বলিস্।

এই বলিয়া নয়নতারা ওরফে কালপেঁচা ঝমর ঝমর করিয়া ফিরিয়া যায়—তখন

সাগর দেখিল প্রমাদ! ডাকিল, "না দিদি, ফের ফের। ঘাট হয়েছে, দিদি, ফের!—এই দোর খুলিতেছি।"

নয়নতারা রাগিয়াছিল—ফিরিবার বড় মত ছিল না। কিন্তু ঘরের ভিতর দ্বার দিয়া সাগর কত সন্দেশ খাইতেছে, ইহা দেখিবার একটু ইচ্ছা ছিল, তাই ফিরিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল—সন্দেশ নহে—আর একজন লোক আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কে?"

সা। প্রফুল্ল।

ন। সে আবার কে?

সা। মুচি বৌ।

ন। এই সুন্দর?

সা। তোমার চেয়ে নয়।

ন। নে, আর জ্বালাস্ নে। তোর চেয়ে ত নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে কর্ত্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারীধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে? গৃহিণীর পাঁচজন দাসী আছে—কিন্তু স্বামিসেবা—আর কার সাধ্য করিতে আসে! যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?

কর্ত্তা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগ্দী বেটী গিয়াছে কি?"

গৃহিণী মাছি তাড়াইয়া নথ নাড়িয়া বলিলেন, "রাত্রে আবার সে কোথা যাবে? রাত্রে একটা অতিথ এলে তুমি তাড়াও না—আর আমি বৌটাকে রাত্রে তাড়িয়ে দেব?"

কর্ত্তা। অতিথ হয়, অতিথশালায় যাক্ না? এখানে কেন?

গিন্নী। আমি তাড়াতে পার্‌ব না, আমি ত বলেছি। তাড়াতে হয়, তুমি তাড়াও। বড় সুন্দর বৌ কিন্তু—

কর্ত্তা। বাগ্দীর ঘরে অমন দুটো একটা সুন্দর হয়। তা আমি তাড়াচ্চি। ব্রজকে ডাক্ ত রে।

ব্রহ্ম। ভাই, আমি বুড়ো মানুষ—কৃষ্ণনাম জপ করি, আর আলো চাল খাই। রূপকথা শোন ত বল্‌তে পারি। বাগ্দীর কথাতেও নাই, বামনীর কথাতেও নাই।

ব্রজ। হায়! বুড়ো বয়সে কবে তুমি ডাকাতের হাতে পড়িবে!

ব্রহ্ম। অমন কথা বলিস্ নে—বড় ডাকাতের ভয়! কি, দেখা কর্‌বি?

ব্রজ। তা নহিলে কি তোমার মালাজপা দেখ্‌তে এসেছি?

ব্রহ্ম। সাগর বৌয়ের কাছে যা।

ব্রজ। সতীনে কি সতীনকে দেখায়?

ব্রহ্ম। তুই যা না। সাগর তোকে ডেকেছে, ঘরে গিয়ে বসে আছে। অমন মেয়ে আর হয় না।

ব্রজ। চরকা ভেঙ্গেছে ব'লে? নয়ানকে বলে দেব—সে যেন একটা চরকা ভেঙ্গে দেয়।

ব্রহ্ম। হাঁ—সাগরে, আর নয়ানে! যা যা!

ব্রজ। গেলে বাগ্দিনী দেখ্‌তে পাব?

ব্রহ্ম। বুড়ীর কথাটাই শোন্ না; কি জ্বালাতেই পড়লেম গা? আমার মালা জপা হলো না। তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক্—আর চুয়াত্তর বছরই হোক্—কই, কেউ ডাক্‌লে ত কখন 'না' বলিত না!

ব্রজ। ঠাকুরদাদার অক্ষয় স্বর্গ হোক্—আমি চৌদ্দ বছরের সন্ধানে চলিলাম। ফিরিয়া আসিয়া চুয়াত্তর বছরের সন্ধান লইব কি?

ব্রহ্ম। যা যা যা! আমার মালা জপা ঘুরে গেল। আমি নয়নতারাকে বলে দিব, তুই বড় চেঙ্গড়া হয়েছিস্।

ব্রজ। ব'লে দিও! খুসি হ'য়ে দুটো ছোলা ভাজা পাঠিয়ে দেবে।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর সাগরের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দুইটি ঘর পাইয়াছিল, একটি নীচে, একটি উপরে।

নীচের ঘরে বসিয়া সাগর পান সাজিত, সমবয়স্কদিগের সঙ্গে খেলা করিত, কি গল্প করিত। উপরের ঘরে রাত্রে শুইত; দিনমানে নিদ্রা আসিলে সেই ঘরে গিয়া দ্বার দিত। অতএব ব্রজেশ্বর, ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপকথার জ্বালা এড়াইয়া সেই উপরের ঘরে গেলেন।

সেখানে সাগর নাই—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আর একজন কে আছে। অনুভবে বুঝিলেন, এই সেই প্রথম স্ত্রী।

বড় গোল বাধিল। দুই জনে সম্বন্ধ বড় নিকট—স্ত্রী পুরুষ—পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু কখনও দেখা নাই। কখনও কথা নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে? কে আগে কথা কহিবে? বিশেষ একজন তাড়াইতে আসিয়াছে, আর একজন তাড়া খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রাচীনা পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কথাটা কি রকমে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল?

উচিত যাই হউক—উচিতমত কিছুই হইল না। প্রথমে দুইজনের একজনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষে প্রফুল্ল অল্প, অল্পমাত্র হাসিয়া, গলায় কাপড় দিয়া ব্রজেশ্বরের পায়ের গোড়ায় আসিয়া টিপ করিয়া এক প্রণাম করিল।

ব্রজেশ্বর বাপের মত নহে। প্রণাম গ্রহণ করিয়া অপ্রতিভ হইয়া বাহু ধরিয়া প্রফুল্লকে উঠাইয়া পালঙ্কে বসাইল। বসাইয়া আপনি কাছে বসিল।

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ এ কাল! তা সে ঘোমটাটুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে সরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিল যে, প্রফুল্ল কাঁদিতেছে। ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া—আ ছি! ছি! ছি! বাইশ বছর বয়সেই ধিক্! ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া, না ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় ডব্‌ডবে চোখের নীচে দিয়া একফোটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল সেই স্থানে—আ! ছি! ছি!—ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বন করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি, মার্জ্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।

যখন ব্রজেশ্বর এই ঘোরতর অশ্লীলতা-দোষে নিজে দূষিত হইতেছিলেন, এবং গ্রন্থকারকে সেই দোষে দূষিত করিবার কারণ হইতেছিলেন—যখন নির্ব্বোধ প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিতেছিল যে, বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই, সেই সময়ে দ্বারে কে মুখ বাড়াইল। মুখখানা বুঝি অল্প একটু হাসিয়াছিল—কি যার মুখ, তার হাতের গহনার বুঝি একটু শব্দ হইয়াছিল—তাই ব্রজেশ্বরের কান সেদিকে গেল। ব্রজেশ্বর সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মুখখানা বড় সুন্দর। কালো কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাপটায় বেড়া—তখন মেয়েরা ঝাপটা রাখিত—তার উপর একটু ঘোমটা টানা—ঘোমটার ভিতর দুইটা পদ্ম-পলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙা ঠোঁট মিঠে মিঠে হাসিতেছে। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, মুখখানা সাগরের। সাগর স্বামীকে একটা চাবি ও কুলুপ দেখাইল। সাগর

ছেলেমানুষ; স্বামীর সঙ্গে জিয়াদা কথা কয় না। ব্রজ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বুঝিতে বড় বিলম্বও হইল না। সাগর বাহির হইতে কপাট টানিয়া দিয়া শিকল লাগাইয়া কুলুপের চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া দুড়দুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজেশ্বর, কুলুপ পড়িল শুনিতে পাইয়া, "কি কর, সাগর! কি কর, সাগর!" বলিয়া চেঁচাইল। সাগর কিছুতেই কান না দিয়া দুড়্‌দুড়্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া ছুটিয়া একেবারে ব্রহ্মঠাকুরাণীর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিলেন, "কি লা সাগর বৌ? কি হয়েছে? এখানে এসে শুলি যে?"

সাগর কথা কয় না।

ব্রহ্ম। তোকে ব্রজ তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

সা। তা নইলে আর তোমার আশ্রমে আসি? আজ তোমার কাছে শোব।

ব্রহ্ম। তা শো শো! এখনই আবার ডাক্‌বে এখন! আহা! তোর ঠাকুরদাদা এমন বার মাস ত্রিশদিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার তখনই ডেকেছে—আমি আরও রাগ করে যেতাম না—তা মেয়েমানুষের প্রাণ ভাই! থাকতেও পারিতাম না। একদিন হলো কি—

সা। ঠান্‌দিদি, একটা রূপকথা বল না।

ব্র। কোন্‌টা বল্‌বো, বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর কথা বল্‌বো? একলা শুন্‌বি, তা নূতন বৌটা কোথায়? তাকে ডাক্‌ না—দুজনে শুন্‌বি।

সা। সে কোথা, আমি এখন খুঁজতে পারি না। আমি একাই শুন্‌বো। তুমি বল।

ব্রহ্মঠাকুরাণী তখন সাগরের কাছে শুইয়া বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিলেন। সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরাণী সে সংবাদ অনবগত, দুই চারি দণ্ড গল্প চালাইলেন; পরে যখন জানিতে পারিলেন, শ্রোত্রী নিদ্রামগ্না, তখন দুঃখিতচিত্তে মাঝখানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই সাগর আসিয়া, ঘরের কুলুপ খুলিয়া দিয়া গেল। তারপর কাহাকে কিছু না বলিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর ভাঙ্গা চরকা লইয়া, সেই নিদ্রামগ্না বর্ষীয়সীর কানের কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিল।

"কটাশ—ঝনাৎ" করিয়া কুলুপ শিকল খোলার শব্দ হইল—প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল। প্রফুল্ল বসিয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "সাগর শিকল খুলিয়াছে, আমি চলিলাম। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার কর না কর, দাসী বলিয়া মনে রাখিও।"

ব্র। এখন যাইও না। আমি একবার কর্ত্তাকে বলিয়া দেখিব।

প্র। বলিলে কি তাঁর মন ফিরিবে ?

ব্র। না ফিরুক, আমার কাজ আমায় করিতে হইবে। অকারণে তোমায় ত্যাগ করিয়া, আমি কি অধর্ম্মে পতিত হইব ?

প্র। তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই—গ্রহণ করিয়াছ। আমাকে একদিনের জন্য তোমার পাশে ঠাঁই দিয়াছ—আমার সেই ঢের। তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না। তাতে আমি সুখী হইব না।

ব্র। নিতান্ত পক্ষে, তিনি যাহাতে তোমার খোরপোষ পাঠাইয়া দেন, তা আমায় করিতে হইবে।

প্র। তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা লইব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা লইব।

ব্র। আমার কিছুই নাই, কেবল আমার এই আঙ্গটিটি আছে। এখন এইটি লইয়া যাও। আপাততঃ ইহার মূল্যে কতক দুঃখ নিবারণ হইবে। তারপর যাহাতে আমি দু' পয়সা রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণপোষণ করিব।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনার অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লকে দিল। প্রফুল্ল আপনার আঙ্গুলে আঙ্গটিটি পরাইতে পরাইতে বলিল, "যদি তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও।"

ব্র। সকলকে ভুলিব—তোমায় কখনও ভুলিব না।

প্র। যদি এর পর চিনিতে না পার ?

ব্র। ও মুখ কখনও ভুলিব না।

প্র। আমি এ আঙ্গটিটি বেচিব না। না খাইয়া মরিয়া যাইব, তবু কখন বেচিব না। যখন তুমি আমাকে না চিনিতে পারিবে, তখন তোমাকে এই আঙ্গটি দেখাইব। ইহাতে কি লেখা আছে ?

ব্র। আমার নাম খোদা আছে।

দুইজনে অশ্রুজলে নিষিক্ত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিলে সাগর ও নয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পোড়ারমুখী নয়ান বলিল, "দিদি, কাল রাত্রে কোথায় শুইয়াছিলি ?"

প্র। ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে কথা আপনার মুখে বলে না।

ন। সে আবার কি?

সাগর। বুঝতে পারিস্ নে? কাল উনি আমাকে তাড়াইয়া আমার পালঙ্কে বিষ্ণুর লক্ষ্মী হইয়াছিলেন। মিন্সে আবার সোহাগ ক'রে আঙ্গটি দিয়েছে।

সাগর নয়ানকে প্রফুল্লের হাতে ব্রজেশ্বরের আঙ্গটি দেখাইল। দেখিয়া নয়ানতারা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল। বলিল, "দিদি, ঠাকুর তোমার কথার কি উত্তর দিয়াছেন, শুনেছ?"

প্রফুল্লের সে কথা আর মনে ছিল না, সে ব্রজেশ্বরের আদর পাইয়াছিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথার উত্তর?"

ন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কি করিয়া খাইবে?

প্র। তার আর উত্তর কি?

ন। ঠাকুর বলিয়াছেন, চুরি ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিও।

"দেখা যাবে" বলিয়া প্রফুল্ল বিদায় হইল।

প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। একেবারে বাহিরে খিড়কীদ্বার পার হইল। সাগর পিছু পিছু গেল। প্রফুল্ল তাহাকে বলিল, "আমি, ভাই, আজ চলিলাম। এ বাড়ীতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ী গেলে, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী চেন?

প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী যাবে?

প্র। আমার আর লজ্জা কি?

সা। তোমার মা তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফুল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখাইয়া দিল। প্রফুল্ল মার কাছে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মা বাড়ী আসিল। প্রফুল্লের মার যাতায়াতে বড় শারীরিক কষ্ট গিয়াছে—মানসিক কষ্ট ততোধিক। সকল সময় সব সয় না। ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লের মা জ্বরে পড়িল। প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, বামনের ঘরের মেয়ে—তাতে বিধবা, প্রফুল্লের মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না। তারই উপর

দুবেলা স্নান, জুটিলে আহার, পূর্ব্বমত চলিল। প্রতিবাসীরা দয়া করিয়া কখনও কিছু দিত, তাইতে আহার চলিত। ক্রমে জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইল—শেষে প্রফুল্লের মা শয্যাগত হইল। সেকালে সেই সকল গ্রাম্য প্রদেশে চিকিৎসাপত্র বড় ছিল না—বিধবারা প্রায়ই ঔষধ খাইত না—বিশেষ প্রফুল্লের এমন লোক নাই যে, কবিরাজ ডাকে। কবিরাজও দেশে না থাকারই মধ্যে। জ্বর বাড়িল—বিকার প্রাপ্ত হইল, শেষে প্রফুল্লের মা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন।

পাড়ার পাঁচ জন, যাহারা তাহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লের মার সৎকার করিল। বাঙ্গালীরা এ সময়ে শত্রুতা রাখে না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে।

প্রফুল্ল একা। পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া বলিল, "তোমাকে চতুর্থের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" প্রফুল্ল বলিল, "ইচ্ছা, পিণ্ডদান করি—কিন্তু কোথায় কি পাইব?" পাড়ার পাঁচজন বলিল, "তোমায় কিছু করিতে হইবে না—আমরা সব করিয়া লইতেছি।" কেহ কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামগ্রী দিল, এইরূপ করিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের উদ্যোগ হইল। প্রতিবাসীরা আপনারাই সকল উদ্যোগ করিয়া লইল।

একজন প্রতিবাসী বলিল, "একটা কথা মনে হইতেছে; তোমার মার শ্রাদ্ধে তোমার শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কি না?"

প্রফুল্ল বলিল, "কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে?"

দুইজন পাড়ার মাতব্বর লোক অগ্রসর হইল। সকল কাজে তাহারাই আগু হয়—তাদের সেই রোগ। প্রফুল্ল বলিল, "তোমরাই আমাদের কলঙ্ক রটাইয়া সে ঘর ঘুচাইয়াছ।"

তাহারা বলিল, "সে কথা আর মনে করিও না। আমরা সে কথা সারিয়া লইব। তুমি এখন অনাথা বালিকা—তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোন বিবাদ নাই।"

প্রফুল্ল সম্মত হইল। দুই জন হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। হরবল্লভ বলিলেন, "কি ঠাকুর! তোমরাই বিহাইনকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া তাকে একঘ'রে ক'রেছিলে—আবার তোমাদেরই মুখে এই কথা?"

ব্রাহ্মণেরা বলিল, "সে কি জানেন—অমন পাড়াপড়সীতে গোলযোগ হয়—সেটা কোন কাজের কথা নয়।"

হরবল্লভ বিষয়ী লোক—ভাবিলেন, "এ সব জুয়াচুরি। এ বেটারা বাগ্দী বেটীর কাছে টাকা খাইয়াছে। ভাল, বাগ্দী বেটী টাকা পাইল কোথা?" অতএব হরবল্লভ

নিমন্ত্রণের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্লের প্রতি বরং আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর এ সকল শুনিল। মনে করিল, "একদিন রাত্রে লুকাইয়া গিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিব। সেই রাত্রেই ফিরিব।"

প্রতিবাসীরা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল যথারীতি মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন সম্পন্ন করিল। ব্রজেশ্বর যাইবার সময় খুঁজিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলমণি নাপিতানীর বাস প্রফুল্লের বাসের নিকট। মাতৃহীন হইয়া অবধি প্রফুল্ল একা গৃহে বাস করে। প্রফুল্ল সুন্দরী, যুবতী, রাত্রে একা বাস করে, তাহাতে ভয়ও আছে, কলঙ্ক আছে। কাছে শুইবার জন্য রাত্রে একজন স্ত্রীলোক চাই। ফুলমণিকে এ জন্য প্রফুল্ল অনুরোধ করিয়াছিল। ফুলমণি বিধবা ; তার এক বিধবা ভগিনী ভিন্ন কেহ নাই। আর তারা দুই ব'নেই প্রফুল্লের মার অনুগত ছিল। এইজন্য প্রফুল্ল ফুলমণিকে অনুরোধ করে, আর ফুলমণিও সহজে স্বীকার করে। অতএব যেদিন প্রফুল্লের মা মরিয়াছিল, সেইদিন অবধি প্রফুল্লের বাড়ীতে ফুলমণি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া শোয়।

তবে ফুলমণি কি চরিত্রের লোক, তাহা ছেলেমানুষ প্রফুল্ল সবিশেষ জানিত না। ফুলমণি প্রফুল্লের অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, বেশভূষায় একটু পারিপাট্য রাখিত। একে ইতর জাতির মেয়ে, তাতে বালবিধবা ; চরিত্রটা বড় সে খাঁটি রাখিতে পারে নাই। গ্রামের জমিদার পরাণ চৌধুরী। তাঁহার একজন গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামে আসিয়া মধ্যে মধ্যে কাছারি করিত। লোকে বলিত, ফুলমণি দুর্লভের বিশেষ অনুগৃহীতা—অথবা দুর্লভ তাহার অনুগৃহীত। এ সকল কথা প্রফুল্ল একেবারে যে কখনও শুনে নাই—তা নয়, কিন্তু কি করে—আর কেহ আপনার ঘর দ্বার ফেলিয়া প্রফুল্লের কাছে আসিয়া শুইতে চাহে না। বিশেষ প্রফুল্ল মনে করিল, "সে মন্দ হোক, আমি না মন্দ হইলে আমায় কে মন্দ করিবে ?

অতএব ফুলমণি দুই চারিদিন আসিয়া প্রফুল্লের ঘরে শুইল। শ্রাদ্ধের পরদিন ফুলমণি একটু দেরী করিয়া আসিতেছিল। পথে একটা আমগাছের তলায়, একটা

বন আছে, আসিবার সময় ফুলমণি সেই বনে প্রবেশ করিল। সে বনের ভিতর একজন পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সে সেই দুর্লভচন্দ্র।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃতাভিসারা, তাম্বূলরাগরক্তাধরা, রাঙ্গাপেড়ে শাড়ীপরা, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া বলিলেন, "কেমন, আজ?"

ফুলমণি বলিলেন, "হাঁ, আজই বেশ। তুমি রাত্রি দুপুরের সময় পাল্কী নিয়ে এসো—দুয়ারে টোকা মেরো। আমি দুয়ার খুলিয়া দিব। কিন্তু দেখো, গোল না হয়।"

দুর্লভ। তার ভয় নাই। কিন্তু সে ত গোল কর্‌বে না?

ফুলমণি। তার একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। আমি আস্তে আস্তে দোর্‌টি খুল্‌ব, তুমি আস্তে আস্তে, সে ঘুমিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার মুখটি কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। তারপর চেঁচায় কার বাপের সাধ্য!

দুর্লভ। তা, অমন জোর করে নিয়ে গেলে কয়দিন থাকিবে?

ফুল। একবার নিয়ে যেতে পার্‌লেই হলো। যার তিন কুলে কেউ নেই, যে অন্নের কাঙ্গাল, সে খেতে পাবে, কাপড় পাবে, গয়না পাবে, টাকা পাবে, সোহাগ পাবে—সে আবার থাক্‌বে না? সে ভার আমার—আমি যেন গয়না টাকার ভাগ পাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে, দুর্লভ স্বস্থানে গেল—ফুলমণি প্রফুল্লের কাছে গেল। প্রফুল্ল এ সর্ব্বনাশের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। সে মার কথা ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিল। মার জন্য যেমন কাঁদে, তেমনি কাঁদিল; কাঁদিয়া যেমন রোজ ঘুমায়, তেমনি ঘুমাইল। দুই প্রহরে দুর্লভ আসিয়া দ্বারে টোকা মারিল। ফুলমণি দ্বার খুলিল। দুর্লভ প্রফুল্লের মুখ বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিল। বাহকেরা নিঃশব্দে তাহাকে পরাণবাবু জমিদারের বিহার মন্দিরে লইয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ইহার অর্দ্ধ দণ্ড পরে ব্রজেশ্বর সেই শূন্য গৃহে প্রফুল্লের সন্ধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজেশ্বর সকলকে লুকাইয়া রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে! হায়! কোথাও কেহ নাই।

প্রফুল্লকে লইয়া বাহকেরা নিঃশব্দে চলিল বলিয়াছি; কেহ মনে না করেন—এটা ভ্রম-প্রমাদ! বাহকের প্রকৃতি শব্দ করা। কিন্তু এবার শব্দ করার পক্ষে তাহাদের প্রতি নিষেধ ছিল। শব্দ করিলে গোলযোগ হইবে; তা ছাড়া আর একটা কথা ছিল।

ব্রহ্মঠাকুরাণীর মুখে শুনা গিয়াছে, বড় ডাকাতের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক

দস্যুভীতি কখনও কোন দেশে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা। পৃথিবীর ও পারে ওয়েষ্ট মিনিষ্টর হলে দাঁড়াইয়া এদ্‌মন্দ্‌ বর্ক্‌ সেই দেবী সিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক্‌ দেবী সিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্ত কালসমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্র-ভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে? গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।

অতএব দুর্লভের ভয়, তিনি ডাকাতি করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া যাইতেছেন, আবার তার উপর ডাকাতে না ডাকাতি করে। পাল্কী দেখিয়া ডাকাতের আসা সম্ভব। সেই ভয়ে বেহারারা নিঃশব্দ। গোলমাল হইবে বলিয়া সঙ্গে আর অপর লোকজনও নাই, কেবল দুর্লভ নিজে আর ফুলমণি। এইরূপে তাহারা ভয়ে ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল।

তারপর ভারি জঙ্গল আরম্ভ হইল। বেহারারা সভয়ে দেখিল, দুইজন মানুষ সম্মুখে আসিতেছে। রাত্রিকাল—কেবল নক্ষত্রালোকে পথ দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেহারারা দেখিল, যেন কালান্তক যমের মত দুই মূর্ত্তি আসিতেছে। একজন বেহারা অপরদিগকে বলিল, "মানুষ দুটোকে সন্দেহ হয়!" অপর আর একজন বলিল; "রাত্রে যখন বেড়াচ্চে, তখন কি আর ভাল মানুষ?"

তৃতীয় বাহক বলিল, "মানুষ দু'টো ভারি জোয়ান।"

৪র্থ। হাতে লাঠি দেখ্‌ছি না?

১ম। চক্রবর্ত্তী মশাই কি বলেন? আর তো এগোনো যায় না—ডাকাতের হাতে প্রাণটা যাবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,"তাই ত, বড় বিপদ্ দেখি যে! যা ভেবেছিলাম, তাই হলো!"

এমন সময়ে, যে দুই ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহারা পথে লোক দেখিয়া হাঁকিল, "কোন্ হ্যায় রে?"

বেহারারা অমনি পাল্কী মাটিতে ফেলিয়া দিয়া "বাবা গো" শব্দ করিয়া একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল। দেখিয়া দুর্লভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেই পথাবলম্বী হইলেন। তখন ফুলমণি "আমায় ফেলে কোথা যাও?" বলিয়া তাঁর পাছু পাছু ছুটিল।

যে দুই জন আসিতেছিল—যাহারা এই দশজন মনুষ্যের ভয়ের কারণ—তাহারা পথিক মাত্র। দুইজন হিন্দুস্থানী দিনাজপুরের রাজসরকারের চাকরীর চেষ্টায় যাইতেছে। রাত্রিপ্রভাত নিকট দেখিয়া সকালে সকালে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেহারারা পলাইল দেখিয়া তাহারা একবার খুব হাসিল! তাহার পর আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আর ফুলমণি ও চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর পিছু ফিরিয়া চাহিল না।

প্রফুল্ল পাল্কীতে উঠিয়াই মুখের বাঁধন স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরে চীৎকার করিয়া কি হইবে বলিয়া চীৎকার করে নাই; চীৎকার শুনিতে পাইলেই বা কে ডাকাতের সম্মুখে আসিবে। প্রথমে ভয়ে প্রফুল্ল কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। যখন বেহারারা পাল্কী ফেলিয়া পলাইল, তখন প্রফুল্ল বুঝিল—আর একটা কি নূতন বিপদ্। ধীরে ধীরে পাল্কীর কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল দুইজন মনুষ্য আসিতেছে। তখন প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিল; যে অল্প ফাঁক রহিল, তাহা দিয়া প্রফুল্ল দেখিল, মনুষ্য দুইজন চলিয়া গেল। তখন প্রফুল্ল পাল্কী হইতে বাহির হইল—দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

প্রফুল্ল ভাবিল, যাহারা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা অবশ্য ফিরিবে। অতএব যদি পথ ধরিয়া যাই, তবে ধরা পড়িতে পারি। তার চেয়ে এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকি। তারপর, দিন হইলে যা হয় করিব।

এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। ভাগ্যক্রমে যে দিকে বেহারারা পলাইয়াছিল, সেদিকে যায় নাই। সুতরাং কাহারও সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল না। প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই প্রভাত হইল।

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে লাগিল। পথে

বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল, এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে। যখন পথের রেখা এদিকে গিয়াছে, তখন অবশ্য এদিকে মানুষের বাস আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ী হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ধরিয়া আনে। বাঘ ভালুকে খায়, সেও ভাল, আর ডাকাইতের হাতে না পড়িতে হয়।

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল—বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল—আর পথ পাওয়া যায় না। কিন্তু দুই একখানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল, যদি ইট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয় আছে।

যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। জঙ্গল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। শেষে প্রফুল্ল দেখিল, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রফুল্ল ইষ্টকস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, এখনও দুই চারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল, সকল ঘরের দ্বার খোলা—মনুষ্য নাই। অথচ মনুষ্য-বাসের চিহ্নও কিছু কিছু আছে। ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোন বুড়ো মানুষের কাতরানি শুনিতে পাইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরীমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেখানে এক বুড়া শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষু কোটরগত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "মা, তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমি অনাথা। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমিও দেখিতেছি অনাথ—তোমার কোন উপকার করিতে পারি?"

বুড়া বলিল, "অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার। জয় নন্দদুলাল! এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম। পিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল দাও।"

প্রফুল্ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জল-কলসী আছে, কলসীতে জল আছে; জলপাত্র আছে। কেবল দিবার লোক নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে খাওয়াইল।

বুড়া জল পান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। প্রফুল্ল এই অরণ্যমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থায় দেখিয়া বড় কৌতূহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন অধিক কথা

কহিতে পারে না। প্রফুল্ল সুতরাং তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইল না। বুড়া যে কয়টি কথা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই ;—

বুড়া বৈষ্ণব। তাহার কেহ নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল! বৈষ্ণবী বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্যসামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে। বুড়া বৈষ্ণব—তাহার দাহ হইবে না। বুড়ার কবর হয়—এই ইচ্ছা। বুড়ার' কথামত, বৈষ্ণবী বাড়ীর উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছে। হয়ত শাবল কোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে। বুড়া এখন প্রফুল্লের কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে, "আমি মরিলে সেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিও।"

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। তারপর বুড়া বলিতে লাগিল, "আমার কিছু টাকা পোঁতা আছে। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না—তাহা হইলে না লইয়া পলাইত না। সে টাকাগুলি কাহাকে না দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির হইবে না! যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে যক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইব—আমার গতি হইবে না। বৈষ্ণবীকে সেই টাকা দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ত পলাইয়াছে। আর কোন্ মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইব? তাই তোমাকেই সেই টাকাগুলি দিয়া যাইতেছি; আমার বিছানার নীচে একখানা চৌকা তক্তা পাতা আছে। সেই তক্তাখানি তুলিবে। একটা সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইবে। বরাবর সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া নামিবে—ভয় নাই—আলো লইয়া যাইবে। নীচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সে ঘরের বায়ুকোণে খুঁজিও—টাকা পাইবে।"

প্রফুল্ল বুড়ার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল। বুড়া বলিল, "এই বাড়ীতে গোহাল আছে—গোহালে গরু আছে। গোহাল হইতে যদি দুধ দুইয়া আনিতে পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দাও, একটু আপনি খাও।

প্রফুল্ল তাহাই করিল—দুধ আনিবার সময় দেখিয়া আসিল—কবর কাটা—সেখানে কোদালি শাবল পড়িয়া আছে।

অপরাহ্নে বুড়ার প্রাণবিয়োগ হইল। প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল—বুড়া শীর্ণকায়, সুতরাং লঘু; প্রফুল্লের বল যথেষ্ট! প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়া, কবরে শুয়াইয়া মাটি চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কূপে স্নান করিয়া ভিজা কাপড় আধখানা পরিয়া রৌদ্রে শুকাইল। তারপরে কোদালি-শাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে চলিল। বুড়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে—সুতরাং লইতে কোন বাধা আছে, মনে করিল না। প্রফুল্ল দীন-দুঃখিনী।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল—দেখিয়াছিল যে, শয্যার নীচে যথার্থই একখানি চৌকা তক্তা, দীর্ঘে প্রস্থে তিন হাত হইবে, মেঝেতে বসান আছে। এখন শাবল আনিয়া, তাহার চাড়ে তক্তা উঠাইল—অন্ধকার গহ্বর দেখা দিল। ক্রমে অন্ধকারে প্রফুল্ল দেখিল, নামিবার একটা সিঁড়ি আছে বটে।

জঙ্গলে কাঠের অভাব নাই। কিছু কাঠের চেলা উঠানে পড়িয়াছিল। প্রফুল্ল তাহা বহিয়া আনিয়া কতকগুলা গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর অনুসন্ধান করিতে লাগিল—চকমকি দিয়াশলাই আছে কি না। বুড়া মানুষ—অবশ্য তামাকু খাইত। সর্ ওয়াল্টার রালের আবিষ্ক্রিয়ার পর, কোন্ বুড়া তামাক ব্যতীত এ ছার, এ নশ্বর, এ নীরস, এ দুর্বিষহ জীবন শেষ করিতে পারিয়াছে?—আমি গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভাল হয় নাই—তার আর কিছুদিন থাকিয়া এই পৃথিবীর দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করা উচিত ছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রফুল্ল চকমকি, সোলা, দিয়াশলাই, সব পাইল। তখন প্রফুল্ল গোহাল উচাইয়া বিচালি লইয়া আসিল। চকমকির আগুনে বিচালি জ্বালিয়া সেই সরু সিঁড়িতে পাতালে নামিল। শাবল কোদালি আগে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল। দেখিল, দিব্য একটি ঘর। বায়ুকোণ—বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। তারপর যে সব কাঠ ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা বিচালির আগুনে জ্বালিল। উপরে মুক্ত পথ দিয়া ধুঁয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ঘরে আলো হইল। সেইখানে প্রফুল্ল খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে "ঠং" করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল, ঘটি কি ঘড়ার গায়ে শাবল ঠেকিয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে কার ধন এখানে আসিল, তার পরিচয় আগে দিই।

বুড়ার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান। সে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত, কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়িয়া, রসকলি ও খঞ্জনিতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল। এখন শ্রীবৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী, সেখানকার বৈষ্ণবদিগের মধুর জয়দেব-গীতি, শ্রীমদ্ভাগবতে পাণ্ডিত্য, আর নধর গড়ন দেখিয়া, তৎপাদপদ্মনিকর সেবনপূর্বক পুণ্যসঞ্চয়ে মন দিল। দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন গরীব; বিষয়কর্মের অন্বেষণে মুর্শিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের চাকুরি জুটিল। কিন্তু

তাঁহার বৈষ্ণবী যে বড় সুন্দরী, নবাবমহলে সে সংবাদ পৌঁছিল! একজন হাব্‌সী খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী লোভে পড়িয়া রাজি হইল। আবার বেগোছ দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজী, বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কোথায় যান? কৃষ্ণগোবিন্দ মনে করিলেন, এ অমূল্য ধন লইয়া লোকালয়ে বাস অনুচিত। কে কোন্ দিন কাড়িয়া লইবে। তখন বাবাজী বৈষ্ণবীকে পদ্মাপার লইয়া আসিয়া, একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পর্য্যটন করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, লোকের চক্ষু হইতে তাঁর অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে। এখানে যম ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহারা সেইখানে রহিল। বাবাজী সপ্তাহে সপ্তাহে হাটে গিয়া বাজার করিয়া আনেন। বৈষ্ণবীকে কোথাও বাহির হইতে দেন না।

একদিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নীচের ঘরে চুলা কাটিতেছিল,—মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা সেকেলে—তখনকার পক্ষেও সেকেলে মোহর পাওয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুঁড়িল। এক ভাঁড় টাকা পাইল।

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ণগোবিন্দের দিন চলা ভার হইত। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দের এক নূতন জ্বালা হইল। টাকা পাইয়া তাহার স্মরণ হইল যে, এই রকম পুরাতন বাড়ীতে অনেকে অনেক ধন মাটির ভিতর পাইয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে আরও টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ অনুদিন প্রোথিত ধনের সন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক সুরঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোর-কুঠরী বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছু পাইল না। এক বৎসর এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ কিছু শান্ত হইল। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে নীচের চোর-কুঠরীতে গিয়া সন্ধান করিত। একদিন দেখিল, এক অন্ধকার ঘরে, এক কোণে একটা কি চক্‌চক্ করিতেছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহা তুলিল—দেখিল, মোহর! ইঁদুরে মাটি তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ তখন কিছু করিল না, হাটবারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবার হাটবারে বৈষ্ণবীকে বলিল, "আমার বড় অসুখ করিয়াছে, তুমি হাট করিতে যাও।" বৈষ্ণবী সকালে হাট করিতে গেল। বাবাজী বুঝিলেন, বৈষ্ণবী একদিন ছুটি পাইয়াছে, শীঘ্র ফিরিবে না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই অবকাশে সেই কোণ খুঁড়িতে লাগিল। সেখানে কুড়ি ঘড়া ধন বাহির হইল।

পূর্বকালে উত্তর-বাঙ্গালায়, নীলধ্বজবংশীয় প্রবলপরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন। সে বংশে শেষ রাজা নীলাম্বর দেব। নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল—অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল। এই একটি রাজভবন। এখানে বৎসরে দুই এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর-বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধন সকল এখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে, কোথায় ধন রহিল। যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইলেন। পাঠান-সেনাপতি তাঁহাকে গৌড়ে চালান করিল। তারপর আর তাঁহাকে মনুষ্যলোকে কেহ দেখে নাই। তাঁহার শেষ কি হইল, কেহ জানে না। তিনি আর কখনও দেশে ফেরেন নাই। সেই অবধি তাঁহার ধনরাশি সেইখানে পোঁতা রহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্ণগোবিন্দ পাইল। সুবর্ণ, হীরক, মুক্তা, অন্য রত্ন অসংখ্য—অগণ্য, কেহ স্থির করিতে পারে না কত। কৃষ্ণগোবিন্দ কুড়ি ঘড়া এইরূপ ধন পাইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে একদিনের তরেও এ ধনের কথা কিছুই জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মত বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল। সেই ধন এখন প্রফুল্ল পাইল। ঘড়াগুলি বেশ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, সেই বিচালির বিছানায় প্রফুল্ল শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

এখন একটু ফুলমণির কথা বলি। ফুলমণি নাপিতানী হরিণীর ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া দ্রুতপদ জীবে প্রাণ-সমর্পণ করিয়াছিল। ডাকাইতের ভয়ে দুর্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্লভের এমনই পলাইবার রোখ্ যে, তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িনীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন। ফুলমণি যত ডাকে, "ও গো দাঁড়াও গো। আমায় ফেলে যেও না গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবা গো! ঐ এলো গো!" কাঁটা-বনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, এক পায়ের নাগরা

জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটা-বনে বিঁধিয়া তাঁহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, "ও অধঃপেতে মিন্‌সে—ওরে মেয়েমানুষকে ভুলিয়ে এনে—এমনি ক'রে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয় রে মিন্‌সে?" শুনিয়া দুর্লভচন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে ডাকাতে ধরিয়াছে। অতএব দুর্লভচন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরও বেগে ধাবমান হইলেন। ফুলমণি ডাকিল, "ও অধঃপেতে—ও পোড়ারমুখো—ও আঁটকুড়ির পুত—ও হাবাতে—ও ড্যাক্‌রা—ও বিট্‌লে।" ততক্ষণ দুর্লভ অদৃশ্য হইল। কাজেই ফুলমণিও গলাবাজি ক্ষান্ত দিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রোদনকালে দুর্লভের মাতাপিতার প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিল।

এদিকে ফুলমণি দেখিল, কই—ডাকাইতেরা ত কেহ আসিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল—কান্না বন্ধ করিল। শেষ দেখিল, না ডাকাইত আসে—না দুর্লভচন্দ্র দেখা দেয়। তখন জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তাহার ন্যায় চতুরার পক্ষে পথ পাওয়া বড় কঠিন হইল না। সহজেই বাহির হইয়া সে রাজপথে উপস্থিত হইল। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া, সে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দুর্লভের উপর তখন বড় রাগ।

অনেক বেলা হইলে ফুলমণি ঘরে পৌঁছিল। দেখিল, তাহার ভগিনী অলকমণি ঘরে নাই, স্নানে গিয়াছে। ফুলমণি কাহাকে কিছু না বলিয়া কপাট ভেজাইয়া শয়ন করিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই—ফুলমণি শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার দিদি আসিয়া তাহাকে উঠাইল—জিজ্ঞাসা করিল, "কিলা, তুই এখন এলি?"

ফুলমণি বলিল, "কেন, আমি কোথায় গিয়াছিলাম?"

অলকমণি। কোথায় আর যাবি? বামুনদের বাড়ী শুতে গিয়েছিলি, তা এত বেলা অবধি এলি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

ফুল। তুই চোখের মাথা খেয়েছিস্ তার কি হবে? ভোরের বেলা তোর সমুখ দিয়ে এসে শুলেম—দেখিস্ নে?

অলকমণি বলিল, "সে কি, বোন? আমি তোর বেলা দেখে তিনবার বামুনের বাড়ী গিয়ে তোকে খুঁজে এলাম। তা তোকেও দেখ্‌লাম না—কাকেও দেখলাম না। হ্যাঁ লা! প্রফুল্ল আজ কোথা গেছে লা?

ফুল। (শিহরিয়া) চুপ্ কর্! দিদি চুপ্! ওকথা মুখে আনিস্ না।

অল। (সভয়ে) কেন, কি হয়েছে?

ফুল। সে কথা বলতে নেই।

অল। কেন না?

ফুল। আমরা ছোট লোক—আমাদের দেবতা বামুনের কথায় কাজ কি, বোন?

অল। সে কি প্রফুল্ল কি করেছে?

ফুল। প্রফুল্ল কি আর আছে?

অল। (পুনশ্চ সভয়ে) সে কি? কি বলিস্?

ফুল। (অতি অস্ফুটস্বরে) কারও সাক্ষাতে বলিস্ নে—কাল তার মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।

ভগিনী। অ্যাঁ!

অলকমণির গা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। ক্ষণপরেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড় উঠিল—তারপর আর কেহ কোথাও নাই। ফুলমণি মূর্চ্ছিতা হইয়া, দাঁতকপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল। ইত্যাদি। ইত্যাদি। ফুলমণি উপন্যাসের উপসংহারকালে দিদিকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, “এ সকল কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ না—দেখিস্, আমার মাথা খাস্।”

দিদি বলিলেন, “না গো! এ কথা কি বলা যায়?” কিন্তু কথিতা দিদি মহাশয়া তখনই চাল ধুইবার ছলে ধুচুনী হাতে পল্লী-পরিভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ঘরে ঘরে উপন্যাসটি সালঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, দেখ, এ কথা প্রচার না হয়। কাজেই ইহা শীঘ্র প্রচারিত হইয়া রূপান্তরে প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী গেল। রূপান্তর কিরূপ? পরে বলিব।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল, “এখন কি করি? কোথায় যাই? এ নিবিড় জঙ্গল ত থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কি প্রকারে? যাই বা কোথায়? বাড়ী ফিরিয়া যাইব? আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাই কি প্রকারে? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে, জানাজনি হবে, চোর ডাকাইতে কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায়? যাহাকে পাইব, তাহাকেই বা বিশ্বাস কি? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ? এ ধনের রাশির লোভ কে সম্বরণ করিবে?”

প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল। শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল,"অদৃষ্টে যাহাই হৌক' দারিদ্র্য-দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না। এইখানেই থাকিব। আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর এ জঙ্গলে তফাৎ কি? সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এখানেও না হয় তাই করিবে।"

এইরূপ মনস্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘরদ্বার পরিষ্কার করিল। গোরুর সেবা করিল। শেষ, রন্ধনের উদ্যোগ। রাঁধিবে কি? হাঁড়ি, কাঠ, চাল, দাল' সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল। প্রফুল্লের যে সাহস অলৌকিক, তাহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইয়াছে।

এ জঙ্গলে হাট কোথায়? প্রফুল্ল ভাবিল, "সন্ধান করিয়া লইব।" জঙ্গলে পথের রেখা আছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল,"কোথা যাইবে, মা?"

প্রফুল্ল। আমি হাটে যাইব।

ব্রাহ্মণ। এ দিকে হাটের পথ কোথা?

প্র। তবে কোন্ দিকে?

ব্রা। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

প্র। এই জঙ্গল হইতেই।

ব্রা। এই জঙ্গলে তোমার বাস?

প্র। হাঁ।

ব্রা। তবে তুমি হাটের পথ চেন না?

প্র। আমি নূতন আসিয়াছি।

ব্রা। এ বনে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক আসে না। তুমি কেন আসিলে?

প্র। আমাকে হাটের পথ বলিয়া দিন।

ব্রা। হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যাইতে পারিবে না। চোর ডাকাইতের বড় ভয়। তোমার আর কে আছে?

প্র। আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রফুল্লের মুখ পানে চাহিয়া দেখিল। মনে মনে বলিল, "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভাল, দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি?" প্রকাশ্যে

বলিল, "তুমি একা হাটে যাইও না। বিপদে পড়িবে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখান হইতে চাল, দাল কিনিতে পার।"

প্রফুল্ল বলিল, "সেই হলে ভাল হয়। কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত দেখিতেছি।"

ব্রা। ব্রাহ্মণপণ্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা! তুমি আমার সঙ্গে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরও নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লের একটু একটু ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নাই? দেখিল, সেখানে একখানি কুটীর আছে—তালা চাবি বন্ধ, কেহ নাই। ব্রাহ্মণ তালা চাবি খুলিল। প্রফুল্ল দেখিল,—দোকান নয়, তবে হাঁড়ি' কলসী, চাল, দাল, নুন, তেল যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ বলিল, "তুমি যাহা একা বহিয়া লইয়া যাইতে পার, লইয়া যাও।"

প্রফুল্ল যাহা পারিল, তাহা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "দাম কত দিতে হইবে?"

ব্রা। এক আনা।

প্র। আমার নিকট পয়সা নাই।

ব্রা। টাকা আছে? দাও, ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।

প্র। আমার কাছে টাকাও নাই।

ব্রা। তবে কি নিয়া হাটে যাইতেছিলে?

প্র। একটি মোহর আছে।

ব্রা। দেখি।

প্রফুল্ল মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিল; বলিল, "মোহর ভাঙ্গাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চল, তোমার ঘরে যাই, তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও।"

প্র। ঘরেও আমার পয়সা নাই।

ব্রা। সবই মোহর! তা হৌক, চল, তোমার ঘর চিনিয়া আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিও। আমি গিয়া নিয়া আসিব।

এখন "সবই মোহর" কথাটা প্রফুল্লের কানে ভাল লাগিল না। প্রফুল্ল বুঝিল যে, এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে, প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে। আর সেই লোভেই তাহার বাড়ী দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। প্রফুল্ল জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল, তাহা রাখিল। বলিল, "আমাকে হাটেই যাইতে হইবে। আমার কাপড়চোপড়ের বন্দোবস্ত আছে।"

ব্রাহ্মণ হাসিল। বলিল, "মা! মনে করিতেছ, আমি তোমার বাড়ী চিনিয়া আসিলে, তোমার মোহরগুলি চুরি করিয়া লইব? তা তুমি কি মনে করিয়াছ; হাটে গেলেই আমাকে এড়াইতে পারিবে? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কি প্রকারে?"

সর্ব্বনাশ, প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না—আমাকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আমি ডাকাইতের সর্দ্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।"

প্রফুল্ল স্পন্দনহীন। ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভবানী বলিল, "বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।"

এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা নাগরা বা দামামা বাহির করিয়া, তাহাতে গোটাকতক ঘা দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক যমের মত জওয়ান লাঠি সড়কি লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আজ্ঞা হয়?"

ভবানী বলিল, "এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ। ইহাকে আমি মা বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং মার মত দেখিবে। তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না, আর কাহাকেও করিতে দিবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।" এই বলিবামাত্র সেই দস্যুদল মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল। প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি; একেবারেই বুঝিল যে, ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, "চলুন, আপনাকে আমার বাড়ী দেখাইতেছি।"

প্রফুল্ল দ্রব্য সামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল, তাহা আবার লইল। সে আগে চলিল, ভবানী পাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া, ভবানী ঠাকুরকে বসিতে, প্রফুল্ল একখানা ছেঁড়া কুশাসন দিল। বৈরাগীর একখানি ছেঁড়া কুশাসন ছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী পাঠক বলিল, "এই ভাঙ্গা বাড়ীতে তুমি মোহর পাইয়াছ?"

প্র। আজ্ঞা হাঁ।

ভ। কত?

প্র। অনেক।

ভ। ঠিক বল কত। ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ী খুঁড়িয়া দেখিবে।

প্র। কুড়ি ঘড়া।

ভ। এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?

প্র। দেশে লইয়া যাইব।

ভ। রাখিতে পারিবে?

প্র। আপনি সাহায্য করিলে পারি।

ভ। এই বনে আমার পূর্ণ অধিকার। এই বনের বাহিরে আমার তেমন ক্ষমতা নাই। এ বনের বাহিরে ধন লইয়া গেলে, আমি রাখিতে পারিব না।

প্র। তবে আমি এই বনেই ধন লইয়া থাকিব। আপনি রক্ষা করিবেন?

ভ। করিব। কিন্তু তুমি এত ধন লইয়া কি করিবে?

প্র। লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করে?

ভ। ভোগ করে।

প্র। আমিও ভোগ করিব।

ভবানী ঠাকুর "হোঃ হোঃ!" করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রফুল্ল অপ্রতিভ হইল। দেখিয়া ভবানী বলিল, "মা! বোকা মেয়ের মত কথাটা বলিলে, তাই হাসিলাম। তোমার ত কেহই নাই বলিয়াছ, তুমি কাকে নিয়া এ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে? একা কি ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়?

প্রফুল্ল অধোবদন হইল। ভবানী বলিতে লাগিল, "শোন। লোকে ঐশ্বর্য্য লইয়া, কেহ ভোগ করে, কেহ পুণ্যসঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে। তোমার ভোগ করিবার যো নাই। কেন না, তোমার কেহ নাই। তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিতে পার, না হয় নরকের পথ সাফ করিতে পার। কোন্‌টা করিবে?"

প্রফুল্ল বড় সাহসী। বলিল, "এ সকল কথা ত ডাকাইতের সর্দ্দারের মত নহে।"

ভ। না; আমি কেবল ডাকাইতের সর্দ্দার নহি। তোমার কাছে আর আমি ডাকাইতের সর্দ্দার নহি, তোমাকে আমি মা বলিয়াছি, সুতরাং আমি এক্ষণে তোমার পক্ষে ভাল যা, তাই বলিব। ধনের ভোগ তোমার হইতে পারে না—কেন না, তোমার কেহ নাই। তবে এই ধনের দ্বারা, বিস্তর পাপ, অথবা বিস্তর পুণ্য-সঞ্চয় করিতে পার। কোন্ পথে যাইতে চাও?

প্র। যদি বলি, পাপই করিব?

ভ। আমি তাহা হইলে, লোক দিয়া, তোমার ধন তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে এ বনের বাহির করিয়া দিব। এ বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে যে, তোমার এই ধনের লোভে, তোমার সঙ্গে পাপাচরণ করিতে সম্মত হইবে। অতএব তোমার সে মতি হইলে, আমি তোমাকে এই দণ্ডে এখান হইতে বিদায় করিতে বাধ্য। এ বন আমারই।

প্র। লোক দিয়া আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কি?

ভ। রাখিতে পারিবে কি? তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, যদিও ডাকাইতের হাতে উদ্ধার পাও—কিন্তু রূপ যৌবনের হাতে উদ্ধার পাইবে না। পাপের লালসা না ফুরাইতে ফুরাইতে ধন ফুরাইবে। যতই কেন ধন থাক্ না, শেষ করিলে শেষ হইতে বিস্তর দিন লাগে না। তারপর, মা?

প্র। তারপর কি?

ভ। নরকের পথ সাফ। লালসা আছে, কিন্তু লালসাপরিতৃপ্তির উপায় নাই—সেই নরকের পরিষ্কার পথ। পুণ্য সঞ্চয় করিবে?

প্র। বাবা! আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাইব? আমি বড় কাঙ্গাল—আমার অন্নবস্ত্র যুটিলেই ঢের, আমি ধন চাই না—দিনপাত হইলেই হইল। এ ধন তুমি সব নাও—আমি নিষ্পাপে যাতে এক-মুটো অন্ন পাই, তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।

ভবানী মনে মনে প্রফুল্লকে ধন্যবাদ করিল(প্রকাশ্যে বলিল, "ধন তোমার। আমি লইব না।"

প্রফুল্ল বিস্মিত হইল। মনের ভাব বুঝিয়া ভবানী বলিল, "তুমি ভাবিতেছে, ডাকাইতি করে, পরের ধন কাড়িয়া খায়, আবার এ রকম ভান করে কেন? সে কথা তোমায় এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে তুমি যদি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমার এ ধন লুঠ করিয়া লইলেও লইতে পারি। এখন এ ধন লইব না। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে?"

প্র। আপনি দেখিতেছি জ্ঞানী, আপনি আমায় শিখাইয়া দিন, ধন লইয়া কি করিব।

ভ। শিখাইতে পাঁচ সাত বৎসর লাগিবে। যদি শেখ, আমি শিখাইতে পারি। এই পাঁচ সাত বৎসর তুমি ধন স্পর্শ করিবে না। তোমার ভরণপোষণের কোন কষ্ট

হইবে না। তোমার খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে। কেমন, স্বীকৃত আছ ?

প্র। বাস করিব কোথায় ?

ভ। এইখানে। ভাঙ্গা চোরা একটু একটু মেরামত করিয়া দিব।

প্র। এইখানে একা বাস করিব ?

ভ। না আমি দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিব। তাহারা তোমার কাছে থাকিবে। কোন ভয় করিও না। এ বনে আমি কর্ত্তা। আমি থাকিতে তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

প্র। আপনি কিরূপে শিখাইবেন ?

ভ। তুমি লিখিতে পড়িতে জান ?

প্র। না।

ভ। তবে প্রথমে লেখাপড়া শিখাইব।

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। এ অরণ্যমধ্যে একজন সহায় পাইয়া সে আহ্লাদিত হইল।

ভবানী ঠাকুর বিদায় হইয়া সেই ভগ্ন অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একব্যক্তি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চোগোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে। ভবানী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঙ্গরাজ! এখানে কেন ?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার সন্ধানে। আপনি এখানে কেন ?"

ভ। যা এতদিন সন্ধান করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি।

রঙ্গ। রাজা ?

ভ। রাণী।

রঙ্গ। রাজা রাণী আর খুঁজিতে হইবে না। ইংরেজ রাজা হইতেছে। কলিকাতায় না কি হষ্টিন* বলিয়া একজন ইংরেজ ভাল রাজ্য ফাঁদিয়াছে।

ভ। আমি সেরকম রাজা খুঁজি না। আমি খুঁজি যা, তা ত তুমি জান।

রঙ্গ। এখন পাইয়াছেন কি ?

ভ। সে সামগ্রী পাইবার নয়, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভাল পাইয়াছি ; এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে। দেখিও, এই বাড়ীতে আমি ভিন্ন আর কোন পুরুষমানুষ না প্রবেশ করিতে পায়। মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী।

---

*Warren Hastings.

রঙ্গ। যে আজ্ঞা। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্জনপুর লুঠিয়াছে। তাই আপনাকে খুঁজিতেছি।

ভ। চল, তবে আমরা ইজারাদারের কাছারি লুঠিয়া, গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি। গ্রামের লোক আনুকুল্য করিবে?

রঙ্গ। বোধ হয় করিতে পারে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী ঠাকুর অঙ্গীকার মত দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন। একজন হাটে ঘাটে যাইবে, আর একজন প্রফুল্লের কাছে অনুক্ষণ থাকিবে। দুইজন দুই রকমের। যে হাটে ঘাটে যাইবে, তাহার নাম গোব্‌রার মা, বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা। যদি একেবারে কানে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না, কোন মতে ইসারা ইঙ্গিতে চলিত; কিন্তু এ তা নয়। কোন কোন কথা কখন কখন শুনিতে পায়, কখন কোন কথা শুনিতে পায় না। এরকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাধে।

যে কাছে থাকিবার জন্য আসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। বয়সে প্রফুল্লের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড় হইবে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—বর্ষাকালের কচি পাতার মত রঙ। রূপ উছলিয়া পড়িতেছে।

দুইজনে একত্র আসিল—যেন পূর্ণিমা অমাবস্যার হাত ধরিয়াছে। গোব্‌রার মা প্রফুল্লকে প্রণাম করিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি গা?"

গোব্‌রার মা শুনিতে পাইল না; অপরা বলিল, "ও একটু কালা—ওকে সবাই গোব্‌রার মা বলে।"

প্র। গোব্‌রার মা! তোমার কয়টি ছেলে গা?

গোব্‌রার মা। আমি ছিলেম আর কোথায়? বাড়ীতে ছিলেম।

প্র। তুমি কি জেতের মেয়ে?

গোব্‌রার মা। যেতে আস্‌তে খুব পারব। যেখানে বলিবে, সেইখানেই যাব।

প্র। বলি তুমি কি লোক?

গোব্‌রার মা। আর তোমার লোকে কাজ কি মা! আমি একাই তোমার সব কাজ ক'রে দেব। কেবল দুই একটা কাজ পারব না।

প্র। পারবে না, কি?

গোব্‌রার মার কান ফুটিল। বলিল, "পার্‌ব না, কি? এই জল তুল্‌তে পার্‌ব

না। আমার কাঁকালে জোর নাই। আর কাপড়চোপড় কাচা—তা না হয় মা, তুমিই ক'রো।"

প্র। আর সব পার্‌বে ত?

গো-মা। বাসনটাসনগুলো মাজা—তাও না হয় তুমি আপনিই কর্‌লে।

প্র। তাও পারবে না; তবে পার্‌বে কি?

গো-মা। আর এমন কিছু না—এই ঘর ঝেঁটোন, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারি নে।

প্র। পার্‌বে কি?

গো-মা। আর যা বল। সল্‌তে পাকাব, জল গড়িয়ে দেব, আমার এঁটো পাতা ফেল্‌বো—আর আসল কাজ যা যা, তা করব—হাট কর্‌ব।

প্র। বেসাতির হিসাবটা দিতে পার্‌বে?

গো-মা। তা মা, আমি বুড়ো মানুষ, হালা কালা, আমি কি অত পারি! তবে কড়িপাতি যা দেবে, তা সব খরচ করে আস্‌ব—তুমি বল্‌তে পাবে না যে, আমার এই খরচটা হলো না।

প্র। বাছা, তোমার মত গুণের লোক পাওয়া ভার।

গো-মা। তা মা, যা বল, তোমার আপনার গুণে বল।

প্রফুল্ল অপরাকে তখন বলিল, "তোমার নাম কি গা?"

নবাগতা সুন্দরী বলিল, "তা ভাই, জানি না।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "সে কি; বাপ মায় কি নাম রাখে নাই?"

সুন্দরী বলিল, "রাখাই সম্ভব। কিন্তু আমি সবিশেষ অবগত নহি।'

প্র। সে কি গো?

সুন্দরী। জ্ঞান হইবার আগে হইতে আমি বাপ মার কাছছাড়া। ছেলেবেলায় আমায় ছেলেধরায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্র। বটে। তা তারাও ত একটা নাম রেখেছিল?

সুন্দরী। নানারকম।

প্র। কি কি?

সুন্দরী। পোড়ারমুখী, লক্ষ্মীছাড়ী, হতভাগী, চুলোমুখী।

এতক্ষণ গোব্‌রার মা আবার কান হারাইয়াছিল। এই কয়টা সদাশ্রুত গুণবাচক শব্দে শ্রুতি জাগরিত হইল। সে বলিল, "যে আমায় পোড়ারমুখী বলে, সেই পোড়ারমুখী, যে আমায় চুলোমুখী বলে, সেই চুলোমুখী, যে আমায় আঁটকুড়ী বলে, সেই আঁটকুড়ী"—

সুন্দরী। (হাসিয়া) আঁটকুড়ী বলি নাই, বাছা!

গো-মা। তুই আঁটকুড়ী বলিলেও বলেছিস্, না বলিলেও বলেছিস্—কেন বল্‌বি না?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "তোমাকে বল্‌চে না গো—ও আমাকে বল্‌চে।"

তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া গোব্‌রার মা বলিল, "ও কপাল! আমাকে না? তা বলুক মা, বলুক, তুমি রাগ ক'রো না। ও বামনীর মুখটি বড় কদুয্যি। তা বাছা। রাগ কর্‌তে নেই।" গোব্‌রার মার মুখে এইরূপ আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা শুনিয়া যুবতীদ্বয় প্রীতা হইলেন। প্রফুল্ল অপরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামনী? তা আমাকে এতক্ষণ বল নাই? আমার প্রণাম করা হয় নাই।" প্রফুল্ল প্রণাম করিল।

বয়স্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "আমি বামনের মেয়ে বটে—এইরূপ শুনিয়াছি—কিন্তু বামনী নই।"

প্র। সে কি?

বয়স্যা। বামন যোটে নাই।

প্র। বিবাহ হয় নাই? সে কি?

বয়স্যা। ছেলেধরায় কি বিয়ে দেয়?

প্র। চিরকাল তুমি ছেলেধরার ঘরে?

বয়স্যা। না, ছেলেধরায় এক রাজার বাড়ী বেচে এয়েছিল।

প্র। রাজারা বিয়ে দিল না?

বয়স্যা। রাজপুত্র ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু বিবাহটা গান্ধর্ব্ব মত।

প্র। নিজে পাত্র বুঝি?

বয়স্যা। তাও কয় দিনের জন্য বলিতে পারি না।

প্র। তারপর?

বয়স্যা। রকম দেখিয়া পলায়ন করিলাম।

প্র। তারপর?

বয়স্যা। রাজমহিষী কিছু গহনা দিয়াছিলেন, গহনা সমেত পলাইয়াছিলাম। সুতরাং ডাকাইতের হাতে পড়িলাম। সে ডাকাইতের দলপতি ভবানী ঠাকুর, তিনি আমার কাহিনী শুনিয়া আমার গহনা লইলেন না, বরং আরও কিছু দিলেন। আপনার গৃহে আমার আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁহার কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে একপ্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্র। একপ্রকার কি ?

বয়স্যা। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কি রকম ?

বয়স্যা। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্র। তিনিই তোমার স্বামী ?

বয়স্যা। হাঁ—কেন ন', যিনি সম্পূর্ণরূপে আমার অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

মূর্খ ব্রজেশ্বর এত জানিত না।

বয়স্যা বলিল, "শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।"

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্মপ্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ! স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, "আমি অত কথা ভাই, বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কি, এখনও ত বলিলে না ?"

বয়স্যা বলিল, "ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি, আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, শোন। ঈশ্বরই পরমস্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন, ভাই ? দুই ঈশ্বর ? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে ?"

প্র। দূর্! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে ?

নিশি। মেয়েমানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।

প্র। আমি তা আজও জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।

প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিশি বলিল, "বুঝিয়াছি বোন্—তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।" তখন নিশি প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া

তার চক্ষের জল মুছাইল। বলিল, "এত জানিতাম না।" নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতি-ভক্তি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে রাত্রে দুর্লভ চক্রবর্ত্তী প্রফুল্লকে তাহার মাতার বাড়ী হইতে ধরিয়া লইয়া যায়, দৈবগতিকে ব্রজেশ্বর সেই রাত্রেই প্রফুল্লের বাসস্থানে দুর্গাপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রজেশ্বরের একটি ঘোড়া ছিল, ঘোড়ায় চড়িতে ব্রজেশ্বর মজ্‌বুত। যখন বাড়ীর সকলে ঘুমাইল, ব্রজেশ্বর গোপনে সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অন্ধকারে দুর্গাপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন তিনি প্রফুল্লের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, তখন সে ভবন জনশূন্য, অন্ধকারময়। প্রফুল্লকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে। সেই রাত্রে ব্রজেশ্বর পাড়াপড়শী কাহাকেও পাইলেন না যে, জিজ্ঞাসা করেন।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে না দেখিতে পাইয়া মনে করিল যে, প্রফুল্ল একা থাকিতে না পারিয়া কোন কুটুম্ববাড়ী গিয়াছে। ব্রজেশ্বর অপেক্ষা করিতে পারিল না। বাপের ভয়, রাত্রিমধ্যেই ফিরিয়া আসিল। তারপর কিছু দিন গেল। হরবল্লভের সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। সকলে খায় দায় বেড়ায়—সংসারের কাজ করে। ব্রজেশ্বরের দিন কেবল ঠিক সেরকম যায় না। হঠাৎ কেহ কিছু বুঝিল না—জানিল না। প্রথমে মা জানিল। গৃহিণী দেখিল, ছেলের পাতে দুধের বাটিতে দুধ পড়িয়া থাকে, মাছের মুড়ার কেবল কণ্ঠার মাছটাই ভুক্ত হয়, "রান্না ভাল হয় নাই" বলিয়া, ব্রজ ব্যঞ্জন ঠেলিয়া রাখে। মা মনে করিলেন, "ছেলের মন্দাগ্নি হইয়াছে।" প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোট্‌কার ব্যবস্থা করিলেন, তারপর কবিরাজ ডাকিবার কথা হইল। ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। মাকে ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, কিন্তু ব্রহ্মঠাকুরাণীকে পারিল না। বুড়ী ব্রজেশ্বরকে একদিন একা পাইয়া চাপিয়া ধরিল।

"হ্যাঁ রে ব্রজ, তুই আর নয়ানবৌয়ের মুখ দেখিস্ না কেন?"

ব্রজ হাসিয়া বলিল, "মুখখানি একে অমাবস্যার রাত্রি, তাতে মেঘ ঝড় ছাড়া নেই—দেখিতে বড় সাধ নেই।"

ব্রহ্ম। তা মরুক্ গে, সে নয়ানবৌ বুঝ্‌বে—তুই খাস্‌নে কেন?

ব্রজ। তুমি যে রাঁধ।

ব্রহ্ম। আমি ত চিরকালই এমনি রাঁধি।

ব্রজ। আজ কাল হাত পেকেছে।

ব্রহ্ম। দুধও বুঝি আমি রাঁধি? সেটাও কি রান্নার দোষ?

ব্রজ। গোরুগুলোর দুধ বিগ্‌ড়ে গিয়েছে।

ব্রহ্ম। তুই হাঁ করে রাতদিন ভাবিস্ কি?

ব্রজ। কবে তোমায় গঙ্গায় নিয়ে যাব।

ব্রহ্ম। আর তোর বড়াইয়ে কাজ নাই। মুখে অমন অনেকে বলে। শেষে এই নিমগাছের তলায় আমায় গঙ্গায় দিবি—তুলসী গাছটাও দেখতে পাব না! তা তুই ভাব না যা হয়—কিন্তু তুই আমার গঙ্গা ভেবে ভেবে এত রোগা হ'য়ে গেলি কেন?

ব্রজ। ওটা কি কম ভাবনা?

ব্রহ্ম। কাল নাইতে গিয়ে রাণায় ব'সে কি, ভাই ভাব্‌ছিলি? চোখ দিয়ে জল পড়ছিল কেন?

ব্রজ। ভাব্‌ছিলাম যে, স্নান করেই তোমার রান্না খেতে হবে। সেই দুঃখে চোখে জল এসেছিল।

ব্রহ্ম। সাগর এসে রেঁধে দিবে? তা হলে খেতে পারবি ত?

ব্রজ। কেন, সাগর ত রোজ রাঁধিত? খেলা-ঘরে যাও নি কোনও দিন? ধূলা-চড়চড়ী, কাদার সুক্ত, ইটের ঘণ্ট—একদিন আপনি খেয়ে দেখ না? তারপর আমায় খেতে ব'লো।

ব্রহ্ম। প্রফুল্ল এসে রেঁধে দিবে?

যেমন পথে কেহ প্রদীপ লইয়া যখন চলিয়া যায়, তখন পথিপার্শ্বস্থ অন্ধকার ঘরের উপর সেই আলো পড়িলে, ঘর একবার হাসিয়া আবার তখনই আঁধার হয়, প্রফুল্লের নামে ব্রজেশ্বরের মুখ তেমনই হইল। ব্রজ উত্তর করিল, "বাগ্দী যে।"

ব্রহ্ম। বাগ্দী না। সবাই জানে, সে মিছে কথা। তোমার বাপের কেবল সমাজের ভয়। ছেলের চেয়ে কিছু সমাজ বড় নয়। কথাটা কি আবার পাড়্‌ব?

ব্রজ। না, আমার জন্য সমাজে আমার বাপের অপমান হবে—তাও কি হয়?

সেদিন আর বেশী কথা হইল না। ব্রহ্মঠাকুরাণীও সবটুকু বুঝিতে পারিলেন না। কথাটা বড় সোজা নয়। প্রফুল্লের রূপ অতুলনীয়,—একে ত রূপেই সে ব্রজেশ্বরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আবার সেই একদিনেই ব্রজেশ্বর দেখিয়াছিলেন, প্রফুল্লের বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর, আরও মধুর। যদি প্রফুল্ল—বিবাহিতা স্ত্রী—স্বাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া নয়নতারার মত কাছে থাকিত, তবে এই উন্মাদকর মোহ সুস্নিগ্ধ স্নেহে পরিণত হইত। রূপের মোহ কাটিয়া যাইত, গুণের মোহ থাকিয়া যাইত।

কিন্তু তা হইল না। প্রফুল্ল-বিদ্যুৎ একবার চমকাইয়া, চিরকালের জন্য অন্ধকারে মিশিল, সেইজন্য সেই মোহ সহস্র গুণে বল পাইল। কিন্তু এ ত গেল সোজা কথা। কঠিন এই যে, ইহার উপর দারুণ করুণা। সেই সোনার প্রতিমাকে তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়া, চিরকাল জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইয়াছে। সে এখন অন্নের কাঙ্গাল। বুঝি না খাইয়া মরিয়া যাইবে! যখন সেই প্রগাঢ় অনুরাগের উপর এই গভীর করুণা—তখন মাত্রা পূর্ণ। ব্রজেশ্বরের হৃদয় প্রফুল্লময়—আর কিছুরই স্থান নাই। বুড়ী এত কথাও বুঝিল না।

কিছুদিন পরে ফুলমণি নাপিতানীর প্রচারিত প্রফুল্লের তিরোধান-বৃত্তান্ত হরবল্লভের গৃহে পৌঁছিল। গল্প মুখে মুখে বদল হইতে হইতে চলে। সংবাদটা এখানে এইরূপ আকারে পৌঁছিল যে, প্রফুল্ল বাত-শ্লেষ্ম-বিকারে মরিয়াছে—মৃত্যুর পূর্ব্বে তার মরা মাকে দেখিতে পাইয়াছিল। ব্রজেশ্বরও শুনিল।

হরবল্লভ শৌচ স্নান করিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "বাগ্দীর শ্রাদ্ধ বামনে করিবে?" নয়নতারাও স্নান করিল—মাথা মুছিয়া বলিল, "একটা পাপ গেল—আর একটার জন্য নাওয়াটা নাইতে পার্‌লেই শরীর জুড়ায়।" কিছুদিন গেল। ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া শুকাইয়া ব্রজেশ্বর বিছানা লইল। রোগ এমন কিছু নয়, একটু একটু জ্বর হয় মাত্র, কিন্তু ব্রজ নির্জ্জীব, শয্যাগত। বৈদ্য দেখিল। ঔষধপত্রে কিছু হইল না—রোগ বৃদ্ধি পাইল। শেষ ব্রজেশ্বর বাঁচে না বাঁচে।

আসল কথা আর বড় লুকান রহিল না। প্রথমে বুড়ী বুঝিয়াছিল, তারপর গিন্নী বুঝিলেন। এ সকল কথা মেয়েরাই আগে বুঝে। গিন্নী বুঝিলেই, কাজেই কর্ত্তা বুঝিলেন। তখন হরবল্লভের বুকে শেল বিঁধিল। হরবল্লভ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ছি! ছি! কি করিয়াছি! আপনার পা য়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছি!" গিন্নী প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছেলে না বাঁচিলে আমি বিষ খাইব।" হরবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এবার দেবতা ব্রজেশ্বরকে বাঁচাইলে, আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোন কাজ করিব না।"

ব্রজেশ্বর বাঁচিল। ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল—ক্রমে শয্যা ত্যাগ করিল। একদিন হরবল্লভের পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত। হরবল্লভ শ্রাদ্ধ করিতেছেন, ব্রজেশ্বর সেখানে কোন কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত আছেন। তিনি শুনিলেন, শ্রাদ্ধান্তে পুরোহিত মন্ত্র পড়াইলেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

কথাটি ব্রজেশ্বর কণ্ঠস্থ করিলেন। প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না আসিত, তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের পিতাই যে প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ সেই কথা মনে পড়িলেই ব্রজেশ্বর ভাবিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।"

প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচলা রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল। নিশি ঠাকুরাণী, রাজার ঘরে থাকিয়া, পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন—বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক প্রফুল্ল তাঁহার কাছে শিখিল। তারপর পাঠক ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করাইলেন। আরম্ভ করাইয়া, দুই চারিদিন পড়াইয়া অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন। প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে নিশিও বিস্মিতা হইল। প্রফুল্লের রন্ধন, ভোজন, শয়ন সব নামমাত্র, কেবল, "সু ঔ জস্, অম্ ঔ শস্" ইত্যাদিতে মন। নিশি বুঝিল যে, প্রফুল্ল সেই "দুই নূতন"কে ভুলিবার জন্য অনন্যচিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে। ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তারপর প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মত সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল। তখন আচার্য্য একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত এবং একটু ন্যায় শিখাইলেন। এ সকল অল্প অল্প মাত্র। এই সকল দর্শনে ভূমিকা করিয়া, প্রফুল্লকে সবিস্তার যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন; এবং সর্বশেষে সর্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধীত করাইলেন। পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

এদিকে প্রফুল্লের ভিন্নপ্রকার শিক্ষাও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। গোব্‌রার মা কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে—সেটাও ভবানী ঠাকুরের ইঙ্গিতে। নিশিও বড় সাহায্য করে না, কাজেই প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়। তাহাতে প্রফুল্লের কষ্ট নাই—মাতার গৃহেও সকল কাজ নিজে করিতে হইত। প্রথম বৎসর তাহার আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মোটা চাউল,

সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা। আর কিছুই না। নিশির জন্য তাই। প্রফুল্লের তাহাতেও কোন কষ্ট হইল না। মার ঘরে সকল দিন এত যুটিত না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত—গোব্‌রার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খানা, ডোবা, বিল, খালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত ; সুতরাং গোব্‌রার মা হাট হইতে একাদশীতে মাছ আনিতে আর আপত্তি করিত না।

দ্বিতীয় বৎসরে নিশির আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বমত রহিল। কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে কেবল মুন লঙ্কা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোন আপত্তি করিল না।

তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল, তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, ননী, ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, কিন্তু প্রফুল্লের মুন লঙ্কা ভাত। দুইজনে একত্র বসিয়া খাইবে। খাইবার সময়ে প্রফুল্ল ও নিশি দুইজনে বসিয়া হাসিত। নিশি ভাল সামগ্রী বড় খাইত না—গোব্‌রার মাকে দিত। এই পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল।

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল তাহা খাইল।

পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মত খাইল।

শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা সম্বন্ধে এতদনুরূপ অভ্যাসে ভবানী ঠাকুর শিষ্যাকে নিযুক্ত করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎসরে চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রীষ্মকালে একখানা মোটা গড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল, অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়। চতুর্থ বৎসরে পাট কাপড়, ঢাকাই কল্কাদার শান্তিপুরে। প্রফুল্লে সে সকল ছিঁড়িয়া খাটো করিয়া লইয়া পরিত। পঞ্চম বৎসরে বেশ ইচ্ছামত। প্রফুল্ল মোটা গড়াই বাহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত।

কেশবিন্যাস সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাঁধিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ। দিনরাত্র রুক্ষ চুলের রাশি আলুলায়িত থাকিত। তৃতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মুড়াইল। চতুর্থ বৎসরে নূতন চুল হইল ; ভবানী ঠাকুর আদেশ করিলেন, "কেশ গন্ধ-তৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্বদা রঞ্জিত করিবে।" পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন। প্রফুল্ল, পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিল না।

প্রথম বৎসরে তুলার তোষকে তুলার বালিশে প্রফুল্ল শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে বিচালীর বালিশ, বিচালীর বিছানা। তৃতীয় বৎসরে ভূমি-শয্যা। চতুর্থ বৎসরে কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। পঞ্চম বৎসরে প্রফুল্ল যেখানে পাইত, সেখানে শুইত।

প্রথম বৎসরে ত্রিযাম নিদ্রা। দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিযাম। তৃতীয় বৎসরে দুইদিন অন্তর রাত্রিজাগরণ। চতুর্থ বৎসরে তন্দ্রা আসিলেই নিদ্রা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। প্রফুল্ল রাত জাগিয়া পড়িত ও পুঁথি নকল করিত।

প্রফুল্ল জল, বাতাস, রৌদ্র, আগুন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের প্রতি আর একটি শিক্ষার আদেশ করিলেন, তাহা বলিতে লজ্জা করিতেছে; কিন্তু না বলিলেও কথা অসম্পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে।" প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল, শেষ বলিল, "ঠাকুর আর যা বলেন, তা শিখিব, এটি পারিব না।"

ভ। এটি নইলে নয়।

প্র। সে কি ঠাকুর! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে?

ভ। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য। দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।

প্র। কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে? পুরুষ মানুষের কাছে আমি মল্লযুদ্ধ শিখিতে পারিব না।

ভ। নিশি শিখাইবে। নিশি ছেলেধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ঠ বালক বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না।* তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল। আমি এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছি।

প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল।

প্রথম বৎসর ভবানীঠাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী-ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকট যাইতেন—প্রফুল্ল নেড়া মাথায়, অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত। চতুর্থ বৎসরে ভবানী নিজ অনুচরদিগের মধ্যে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন; প্রফুল্লকে তাহাদের সহিত

*এ কথা Warren Hastings নিজে লিখিয়াছেন।

মল্লযুদ্ধ করিতে বলিতেন। প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত। পঞ্চম বৎসরে কোন বিধি নিষেধ রহিল না। প্রয়োজনমত প্রফুল্ল পুরুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, নিষ্প্রয়োজনে করিত না। যখন প্রফুল্ল পুরুষ মানুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয়া কথা কহিত।

এই মত নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানীঠাকুর ঐশ্বর্যভোগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।

একাদশীর দিনে মাছ ছাড়া আর একটি বিষয়ে মাত্র প্রফুল্ল ভবানীঠাকুরের অবাধ্য হইল। আপনার পরিচয় কিছু দিল না। ভবানীঠাকুর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসরে অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া, ভবানীঠাকুর প্রফুল্লকে বলিলেন, "পাঁচ বৎসর হইল, তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ সমাপ্ত হইল। এখন তোমার হস্তগত ধন, তোমার ইচ্ছামত ব্যয় করিও—আমি নিষেধ করিব না। আমি পরামর্শ দিব,—ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিও। আহার আমি আর যোগাইব না,—তুমি আপনি আপনার দিনপাতের উপায় করিবে। কয়টি কথা বলিয়া দিই। কথাগুলি অনেকবার বলিয়াছি,—আর একবার বলি। এখন তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল, "কর্ম্ম করিব, জ্ঞান আমার মত অসিদ্ধের জন্য নহে।"

ভবানী বলিল, "ভাল ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু কর্ম্ম, অসক্ত হইয়া করিতে হইবে। মনে আছে ত, ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥" গীতা—৩য় অঃ—১৯

এখন অনাসক্তি কি? তাহা জান। ইহার প্রথম লক্ষণ, ইন্দ্রিয়-সংযম। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া তোমাকে তাহা শিখাইয়াছি, এখন আর বেশী বলিতে হইবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ, নিরহঙ্কার। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" গীতা—৩য় অঃ—২৭

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম কৃত, তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কাজই কর, তোমার গুণে তাহা হইল, কখনও তাহা মনে করিবে না। করিলে

পুণ্য কর্ম্ম অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তারপর তৃতীয় লক্ষণ এই যে, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।" গীতা—৯ম অঃ—২৭

"এখন বল দেখি মা, তোমার এই ধনরাশি লইয়া তুমি কি করিবে?

প্র। যখন আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।

ভ। সব?

প্র। সব।

ভ। ঠিক তাহা হইলে কর্ম্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহরক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহরক্ষা করিবে। আর সব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে এ ধন পৌঁছিবে কি প্রকারে?

প্র। শিখিয়াছি, তিনি সর্ব্বভূতস্থিত। অতএব সর্ব্বভূতে এ ধন বিতরণ করিব।

ভ। ভাল ভাল। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।
"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"*

কিন্তু এই সর্ব্বভূতসংক্রামক দানের জন্য অনেক কষ্ট, অনেক শ্রমের প্রয়োজন। তাহা তুমি পারিবে?

প্র। এতদিন কি শিখিলাম?

ভ। সে কষ্টের কথা বলিতেছি না। কখন কখন কিছু দোকানদারি চাই। কিছু বেশ-বিন্যাস, কিছু ভোগ-বিলাসের ঠাট প্রয়োজন হইবে। সে বড় কষ্ট। তাহা সহিতে পারিবে?

প্র। সে কি রকম?

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬অঃ, ৩০—৩২

ভ। শোন। আমি ত ডাকাইতি করি। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্র। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক্। এই ধন লইয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হউন।

ভ। ধনে আমারও কোন প্রয়োজন নাই। ধনও আমার যথেষ্ট আছে। আমি ধনের জন্য ডাকাইতি করি না।

প্র। তবে কি?

ভ। আমি রাজত্ব করি।

প্র। ডাকাইতি কি রকম রাজত্ব?

ভ। যাহার হাতে রাজদণ্ড, সেই রাজা।

প্র। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

ভ। এদেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইঙ্গরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্য শাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করি।

প্র। ডাকাইতি করিয়া?

ভ। শুন, বুঝাইয়া দিতেছি।

ভবানীঠাকুর বলিতে লাগিলেন, প্রফুল্ল শুনিতে লাগিল।

ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্ব্বিসহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, কাছারির কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে' পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পূরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ্, সর্ব্বসমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটাবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানীঠাকুর বলিলেন, "এই দুরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অন্যথা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি। কি প্রকারে করি, তাহা তুমি দুইদিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে?"

প্রফুল্লের হৃদয় প্রজাবর্গের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া গলিয়া গিয়াছিল। সে ভবানী-ঠাকুরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিল। বলিল, "আমি সঙ্গে যাইব। ধনব্যয়ে যদি

আমার এখন অধিকার হইয়াছে, তবে আমি কিছু ধন সঙ্গে লইয়া যাইব। দুঃখীদিগকে দিয়া আসিব।”

ভ। এই কাজে দোকানদারি চাই, বলিতেছিলাম। যদি আমার সঙ্গে যাও কিছু কিছু ঠাট সাজাইতে হইবে, সন্ন্যাসিনীবেশে এ কাজ সিদ্ধ হইবে না।

প্র। কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি। কর্ম্ম তাঁহার, আমার নহে। কর্ম্মোদ্ধারের জন্য যে সুখ দুঃখ, তাহা আমার নহে, তাঁরই। তাঁর কর্ম্মের জন্য যাহা করিতে হয়, করিব।

ভবানীঠাকুরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি যখন ডাকাইতিতে সদলে বাহির হইলেন, প্রফুল্ল ধনের ঘড়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। নিশিও সঙ্গে গেল।

ভবানীঠাকুরের অভিসন্ধি যাহাই হৌক, তাঁহার একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রফুল্লকে পাঁচ বৎসর ধরিয়া শাণ দিয়া, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষ হইলেই ভাল হইত, কিন্তু প্রফুল্লের মত নানাগুণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই—বিশেষ এত ধন কোন পুরুষের নাই। ধনের ধার বড় ধার। তবে ভবানীঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল—প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত। যাহা হৌক, এখন আমরা প্রফুল্লকে জীবনতরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়া আরও পাঁচ বৎসর ঘুমাই। প্রফুল্লের অন্য শিক্ষা হইয়াছে। কর্ম্মশিক্ষা হয় নাই। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া কর্ম্মশিক্ষা হৌক।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঁচে পাঁচে দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। যেদিন প্রফুল্লকে বাগ্দীর মেয়ে বলিয়া হরবল্লভ তাড়াইয়া দিয়াছিল, সেদিন হইতে দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর হরবল্লভ রায়ের পক্ষে বড় ভাল গেল না। দেশের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার, তার উপরে ডাকাইতের অত্যাচার। একবার হরবল্লভের তালুক হইতে টাকা চালান আসিতেছিল, ডাকাইতে তাহা লুঠিয়া লইল। সে বার দেবী সিংহের খাজনা দেওয়া হইল না। দেবী সিংহ একখানা

তালুক বেচিয়া লইল। দেবী সিংহের বেচিয়া লওয়ার প্রথা মন্দ ছিল না। হেষ্টিংস্ সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় সকল সরকারী কর্ম্মচারী দেবী সিংহের আজ্ঞাবহ ; বেচা-কেনা সম্বন্ধে সে যাহা মনে করিত, তাহাই হইত। হরবল্লভের দশ হাজার টাকার মূল্যের তালুকখানা আড়াই শত টাকায় দেবী সিংহ নিজে কিনিয়া লইলেন। তাহাতে বাকি খাজনা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। দেবী সিংহের পীড়াপীড়িতে, কয়েদের আশঙ্কায়, হরবল্লভ আর একটা সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এই সকল কারণে আয় বড় কমিয়া আসিল। কিন্তু ব্যয় কিছুই কমিল না—বুনিয়াদি চাল খাটো করা যায় না। সকল লোকেরই প্রায় এমন না এমন একদিন উপস্থিত হয়, যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন, "হয় সাবেক চাল ছাড়, নয় আমায় ছাড়।" অনেকেই উত্তর দেন, "মা! তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না।" হরবল্লভ তাহারই একজন। দোল দুর্গোৎসব, ক্রিয়াকর্ম্ম, দানধ্যান, লাঠালাঠি পূর্ব্বমতই হইতে লাগিল—বরং ডাকাইতে চালান লুঠিয়া লওয়া অবধি লাঠিয়ালের খরচটা কিছু বাড়িয়াছিল। খরচ আর কুলায় না। কিস্তি কিস্তি সরকারী খাজানা বাকি পড়িতে লাগিল। বিষয় আশয় যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বিক্রয় হইয়া যায়, আর থাকে না। দেনার উপর দেনা হইল, সুদে আসল ছাপাইয়া উঠিল—টাকা আর ধার পাওয়া যায় না।

এদিকে দেবী সিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ কিছুতেই টাকা দিতে পারেন না—শেষ হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইন-কানুন খুঁজিতে হইত না, তখন ইংরেজের আইন হয় নাই। সব তখন বে-আইন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় ধূম পড়িয়াছে। ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন। কোন্ শ্বশুরবাড়ী, তাহা বলা বাহুল্য। সাগরের বাপের বাড়ী। তখনকার দিনে একটা জামাই আসা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তাতে আবার ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ী সচরাচর আসে না। পুকুরে পুকুরে, মাছমহলে ভারি হুটাহুটি, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। জেলের দৌরাত্ম্যে প্রাণ আর রক্ষা হয় না। জেলে-মাগীদের হাঁটাহাঁটিতে পুকুরের জল কালী হইয়া যাইতে লাগিল। মাছ চুরির আশায় ছেলেরা পাঠশালা ছাড়িয়া ছিল। দই, দুধ, ননী, ছানা, সর, মাখনের ফরমাইসের জালায় গোয়ালার মাথা বেঠিক্ হইয়া উঠিল ; সে কখনও এক সের জল মিশাইতে তিন সের মিশাইয়া ফেলে, তিন সের মিশাইতে

এক সের মিশাইয়া বসে। কাপড়ের ব্যাপারীর কাপড়ের মোট লইয়া যাতায়াত করিতে করিতে পায় ব্যথা হইয়া গেল; কাহারও পছন্দ হয় না, কোন্ ধুতি চাদর কে জামাইকে দিবে। পাড়ার মেয়ে মহলে বড় হাঙ্গামা পড়িল। যাহার যাহার গহনা আছে, তারা সে সকল সারাইতে, মাজিতে, ঘষিতে, নূতন করিয়া গাঁথাইতে লাগিল। যাহাদের গহনা নাই, তাহারা চুড়ি কিনিয়া, শাঁখা কিনিয়া, সোনা রূপা চাহিয়া চিন্তিয়া এক রকম বেশভূষার যোগাড় করিয়া রাখিল—নইলে জামাই দেখিতে যাওয়া হয় না। যাঁহাদের রসিকতার জন্য পসার আছে—তাঁহারা দুই চারিটা প্রাচীন তামাশা মনে মনে ঝালাইয়া রাখিলেন; যাহাদের পসার নাই, তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল। কথার তামাশা পরে হবে—খাবার তামাশা আগে। তাহার জন্য ঘরে ঘরে কমিটি বসিয়া গেল। বহুতর কৃত্রিম আহার্য্য, পানীয়, ফল-মূল প্রস্তুত হইতে লাগিল। মধুর অধরগুলি মধুর হাসিতে ও সাধের মিশিতে ভরিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু যার জন্য এত উদ্যোগ, তার মনে সুখ নাই। ব্রজেশ্বর আমোদ আহ্লাদের জন্য শ্বশুরালয়ে আসেন নাই। বাপের গ্রেপ্তারির জন্য পরওয়ানা বাহির হইয়াছে—রক্ষার উপায় নাই। কেহ টাকা ধার দেয় না। শ্বশুরের টাকা আছে—শ্বশুর ধার দিলে দিতে পারে, তাই ব্রজেশ্বর শ্বশুরের কাছে আসিয়াছেন।

শ্বশুর বলিলেন, "বাপু হে, আমার যে টাকা, সে তোমারই জন্য আছে—আমার আর কে আছে, বল? কিন্তু টাকাগুলি যতদিন আমার হাতে আছে, ততদিন আছে,—তোমার বাপকে দিলে কি আর থাক্‌বে? মহাজনে খাইবে। অতএব কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট করিতে চাও?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "হোক—আমি ধনের প্রত্যাশী নই—আমার বাপকে বাঁচান আমার প্রথম কাজ।"

শ্বশুর রুক্ষভাবে বলিলেন, "তোমার বাপ বাঁচিলে আমার মেয়ের কি? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে—শ্বশুর বাঁচিলে দুঃখ ঘুচিবে না।"

কড়া কথায় ব্রজেশ্বরের বড় রাগ হইল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "তবে আপনার মেয়ে টাকা লইয়া থাকুক। বুঝিয়াছি, জামাইয়ে আপনার কোন প্রয়োজন নাই। আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম।"

তখন সাগরের পিতা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ব্রজেশ্বরকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। ব্রজেশ্বর কড়া কড়া উত্তর দিল। কাজেই ব্রজেশ্বর তল্পিতল্পা বাঁধিতে লাগিল। শুনিয়া, সাগরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

সাগরের মা জামাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাইকে অনেক বুঝাইলেন। জামাইয়ের রাগ পড়িল না। তারপর সাগরের পালা।

বধূ শ্বশুরবাড়ী আসিলে দিবসে স্বামীর সাক্ষাৎ পাওয়া সেকালে যতটা দুরূহ ছিল, পিত্রালয়ে ততটা নয়। সাগরের সঙ্গে নিভৃতে ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ হইল। সাগর ব্রজে-শ্বরের পায় পড়িল, বলিল, "আর একদিন থাক—আমি ত কোন অপরাধ করি নাই?"

ব্রজেশ্বরের তখন বড় রাগ ছিল—রাগে পা টানিয়া লইলেন। রাগের সময় শারীরিক ক্রিয়া সকল বড় জোরে জোরে হয়, আর হাতপায়ের গতিও ঠিক অভিমতরূপ হয় না। একটা করিতে বিকৃতি জন্য আর একটা হইয়া পড়ে। সেই কারণে, আর কতকটা সাগরের ব্যস্ততার কারণ, পা সরাইয়া লইতে প্রমাদ ঘটিল। পা একটু জোরে সাগরের গায়ে লাগিল। সাগর মনে করিল, স্বামী রাগ করিয়া আমাকে লাথি মারিলেন। সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিত ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "কি? আমায় লাথি মারিলে?"

বাস্তবিক ব্রজেশ্বরের লাথি মারিবার ইচ্ছা ছিল না,—তাই বলিলেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু একে রাগের সময়, আবার সাগর চোখ মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল,—ব্রজেশ্বরের রাগ বাড়িয়া গেল। বলিলেন, "যদি মারিয়াই থাকি? তুমি না হয় বড়-মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার—তোমার বড় মানুষ বাপও এ পা একদিন পূজা করিয়াছিলেন।"

সাগর রাগে জ্ঞান হারাইল। বলিল "ঝকমারি করিয়াছিলেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

ব্র। পাল্‌টে লাথি মারবে না কি?

সা। আমি তত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—

সাগরের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে পিছনের জানালা হইত কে বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া, চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

সাগরের মুখে সেই রকম কি কথা আসিতেছিল। সাগর না ভাবিয়া চিন্তিয়া, পিছন ফিরিয়া না দেখিয়া, রাগের মাথায় সেই কথাই বলিল, "আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

ব্রজেশ্বরও রাগে সপ্তমে চড়িয়া কোন দিকে না চাহিয়া বলিল, "আমারও সেই কথা। যতদিন আমি তোমার পা টিপিয়া না দিই, ততদিন আমিও তোমার মুখ দেখিব না। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে আমি অব্রাহ্মণ।"

তখন রাগে রাগে তিনটা হইয়া ফুলিয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেল। সাগর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। এমন সময়ে সাগর যে ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিল, সেই ঘরে একজন পরিচারিকা, ব্রজেশ্বর গেলে পর সাগরের কি অবস্থা হইয়াছে, ইহা দেখিবার অভিপ্রায়ে ভিতরে প্রবেশ করিল, ছুতানতা করিয়া দুই একটা কাজ করিতে লাগিল। তখন সাগরের মনে পড়িল যে, জানালা হইতে কে কথা কহিয়াছিল। সাগর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই জানালা হইতে কথা কহিয়াছিলি ?"

সে বলিল, "কই না ?"

সাগর বলিল, "তবে কে জানালায় দেখ্‌ত।"

তখন সাক্ষাৎ ভগবতীর মত রূপবতী ও তেজস্বিনী একজন স্ত্রীলোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে বলিল, "জানালায় আমি ছিলাম।"

সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা ?"

তখন সে স্ত্রীলোক বলিল, "তোমরা কি কেউ আমায় চেন না ?"

সাগর বলিল, "না—কে তুমি ?" তখন সেই স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "আমি দেবী চৌধুরাণী।"

পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল, ঝনঝন করিয়া পড়িয়া গেল। সেও কাঁপিতে কাঁপিতে আঁ—আঁ—আঁ—আঁ শব্দ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল। কাঁকালের কাপড় খসিয়া পড়িল।

দেবী চৌধুরাণী তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "চুপ রহো, হারামজাদি! খাড়া রহো।"

পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সাগরেরও গায়ে ঘাম দিতেছিল। সাগরের মুখেও কথা ফুটিল না। যে নাম তাহাদের কানে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ছেলে বুড়ো কে না শুনিয়াছিল ? সে নাম অতি ভয়ানক।

কিন্তু সাগর আবার ক্ষণেক পরে হাসিয়া উঠিল! তখন দেবী চৌধুরাণীও হাসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জল-প্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে, জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু

ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তরতর, কলকল, পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে, আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কলকল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

সেই ত্রিস্রোতার উপরে, কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে, একটা বড় তেঁতুলগাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে—তাহার কথা পরে বলিব, আগে বজরার কথা বলি। বজরাখানি নানাবর্ণে চিত্রিত; তাহাতে কত রকম মুরদ আঁকা আছে। তাহার পিতলের হাতল ডাঁণ্ডা প্রভৃতিতে রূপার গিল্‌টি। গলুইয়ে একটা হাঙ্গরের মুখ—সেটাও গিল্‌টি করা। সর্ব্বত্র পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, আবার নিস্তব্ধ। নাবিকেরা একপাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে; কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর—একজন মানুষ। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙ্গুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোলকলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পূরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পূরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পূরিয়া টলটল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর, অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্য্যাদা নাই—কিন্তু একশত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি

পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা-মুক্তা-খচিত কাঁচলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোনায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদীজলের মত—সেই শুভ্র বসন; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি চিকমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা মতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মসৃণ কোমল প্রভাব উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে; তাহার সুগন্ধি-চূর্ণ-গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। একছড়া যূঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।

ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্ত্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা। চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎস্নার মত বর্ণ মিশিয়াছে; তাহার সঙ্গে সেই মৃদুমধুর বীণার ধ্বনিও মিশিতেছে—যেমন জলে জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে, এ বন্যকুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তর সকলে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতেছিল। ঝম্‌ঝম্ ছন্‌ছন্ ঝনন্ ঝনন্ ছনন্ ছনন্ দম্‌দম্ দ্রিম্ দ্রিম্ বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বীণা কখনও কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে, কখন গর্জ্জিয়া উঠে,—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু—কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল—কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল—নাদ, কুসুমের মালার মত নদীকল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল। তারপর দুই একটা পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া সে বিদ্যাবতী ঝন্‌ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কানের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল—মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল। তখন যাহারা পাল মুড়ি দিয়া এক প্রান্তে নিঃশব্দে নিদ্রিতবৎ শুইয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর নিকট দাঁড়াইল।

এ ব্যক্তি পুরুষ। সে দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠগঠন; ভারি রকমের এক যোড়া চৌগোঁপ্পা আছে। গলায় যজ্ঞোপবীত। সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

সেই স্ত্রীলোক বলিল, "দেখিতে পাইতেছ না?"

পুরুষ বলিল, "কিছু না। আসিতেছে কি ?"

গালিচার উপর একটা ছোট দুরবীণ পড়িয়াছিল। দুরবীণ তখন ভারতবর্ষে নূতন আমদানী হইতেছিল। দূরবীণ লইয়া সুন্দরী ঐ ব্যক্তির হাতে দিল—কিছু বলিল না। সে দূরবীণ চক্ষে দিয়া নদীর সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিল। শেষ একস্থানে আর একখানি বজরা দেখিতে পাইয়া বলিল, "দেখিয়াছি—টেকের মাথায়—ঐ কি ?"

উ। এ নদীতে আজকাল আর কোন বজরা আসিবার কথা নাই।

পুরুষ পুনর্বার দূরবীণ দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

যুবতী বীণা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, "রঙ্গরাজ !"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "আজ্ঞা ?"

"দেখ কি ?"

"কয়জন লোক আছে, তাই দেখি।"

"কয়জন ?"

"ঠিক ঠাওর পাই না। বেশী নয়। খুলিব ?"

"খোল—ছিপ। আঁধারে আঁধারে নিঃশব্দে উজাইয়া যাও।" তখন রঙ্গরাজ ডাকিয়া বলিল, "ছিপ খোল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বজরার কাছে তেঁতুলগাছের ছায়ায় আর একখানি নৌকা অন্ধকারে লুকাইয়াছিল। সেখানি ছিপ—ষাট হাত লম্বা, তিন হাতের বেশী চৌড়া নয়। তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ গাদাগাদি হইয়া শুইয়াছিল। রঙ্গরাজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সেই পঞ্চাশ জন একেবারে উঠিয়া বসিল। বাঁশের চেলা তুলিয়া সকলেই এক একগাছা সড়্‌কি ও এক একখানা ছোট ঢাল বাহির করিল। হাতিয়ার কেহ হাতে রাখিল না—সবাই আপনার নিকট চেলার উপরে সাজাইয়া রাখিল। রাখিয়া সকলে এক একখানা "বোটে" হাতে করিয়া বসিল।

নিঃশব্দে ছিপ খুলিয়া, তাহারা বজরায় আসিয়া লাগিল। রঙ্গরাজ তখন নিজে পঞ্চ হাতিয়ার বাঁধিয়া উহার উপর উঠিল। সেই সময়ে যুবতী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "রঙ্গরাজ, আগে যাহা বলিয়া দিয়াছি, মনে থাকে যেন।"

"মনে আছে" বলিয়া রঙ্গরাজ ছিপে উঠিল। ছিপ নিঃশব্দে তীরে তীরে উজাইয়া চলিল। এদিকে যে বজরা রঙ্গরাজ দূরবীণে দেখিয়াছিল, তাহা নদী বাহিয়া খরস্রোতে তীব্রবেগে আসিতেছিল। ছিপকে বড় বেশী উজাইতে হইল না। বজরা নিকট হইতে,

ছিপ তীর ছাড়িয়া বজরার দিকে ধাবমান হইল। পঞ্চাশখানা, বোটে, কিন্তু শব্দ নাই।

এখন, সেই বজরার ছাদের উপরে আটজন হিন্দুস্থানী রক্ষক ছিল। এত লোক সঙ্গে না করিয়া তখনকার দিনে কেহ রাত্রিকালে নৌকা খুলিতে সাহস করিত না। আটজনের মধ্যে, তুইজন হাতিয়ার বন্ধ হইয়া, মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধিয়া ছাদের উপর বসিয়াছিল—আর ছয়জন মধুর দক্ষিণ বাতাসে চাঁদের আলোতে কাল দাড়ি ছড়াইয়া, সুনিদ্রায় অভিভূত ছিল। যাহারা পাহারায় ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন দেখিল—ছিপ বজরার দিকে আসিতেছে। সে দস্তুরমত হাঁকিল, "ছিপ তফাৎ!"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "তোর দরকার হয়, তুই তফাৎ যা।"

প্রহরী দেখিল বেগোছ। ভয় দেখাইবার জন্য বন্দুকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। রঙ্গরাজ বুঝিল, ফাঁকা আওয়াজ। হাসিয়া বলিল, "কি পাঁড়ে ঠাকুর! একটা ছর্‌রাও নাই? ধার দিব?"

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সেই প্রহরীর মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তারপর বন্দুক নামাইয়া বলিল, "তোমায় এবার মারিব না। এবার তোমার লাল পাগড়ি উড়াইব।" এই কথা বলিতে বলিতে রঙ্গরাজ বন্দুক রাখিয়া, তীর ধনু লইয়া সজোরে তীর ত্যাগ করিল। প্রহরীর মাথার লাল পাগড়ি উড়িয়া গেল। প্রহরী "রাম রাম!" শব্দ করিতে লাগিল।

বলিতে বলিতে ছিপ আসিয়া বজরার পিছনে লাগিল। অমনি দশ বারজন লোক ছিপ হইতে হাতিয়ার সমেত বজরার উপরে উঠিয়া পড়িল। যে ছয়জন হিন্দুস্থানী নিদ্রিত ছিল, তাহারা বন্দুকের আওয়াজে জাগরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোরে হাতিয়ার হাতড়াইতে তাহাদের দিন গেল। ক্ষিপ্রহস্তে আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে নিমেষমধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। যে তুইজন আগে হইতে জাগ্রত ছিল, তাহারা লড়াই করিল, কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অধিক, শীঘ্র তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন ছিপের লোক বজরার ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। বজরার দ্বার বন্ধ।

ভিতরে ব্রজেশ্বর। তিনি শ্বশুরবাড়ী হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। পথে এই বিপদ। এ কেবল তাঁহার সাহসের ফল। অন্য কেহ সাহস করিয়া রাত্রে বজরা খুলিত না।

রঙ্গরাজ কপাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "মহাশয়! দ্বার খুলুন।"

ভিতর হইতে সদ্যোনিদ্রোত্থিত ব্রজেশ্বর উত্তর করিল, "কে? এত গোল কিসের?"

রঙ্গরাজ বলিল, "গোল কিছুই না—বজরায় ডাকাইত পড়িয়াছে।"

ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া, পরে ডাকিতে লাগিল, "পাঁড়ে! তেওয়ারি! রামসিং!

রামসিং ছাদের উপর হইতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! শালা লোক্ সব্ কোইকো বাঁধ্কে রাক্‌খা।"

ব্রজেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। তোমাদের মত বীরপুরুষদের ডালরুটি খাইতে না দিয়া, বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! ডাকাইতের এ বড় ভ্রম। ভাবনা করিও না—কাল ডালরুটির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিব।"

শুনিয়া রঙ্গরাজও ঈষৎ হাসিল। বলিল, "আমারও সেই মত; এখন দ্বার খুলিবেন বোধ হয়।"

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?

রঙ্গরাজ। আমি একজন ডাকাইত মাত্র। দ্বার খোলেন এই ভিক্ষা।

"কেন দ্বার খুলিব?"

রঙ্গরাজ। আপনার সর্ব্বস্ব লুটপাট করিব।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কেন? আমাকে কি হিন্দুস্থানী ভেড়ীওয়ালা পাইলে? আমার হাতে দোনলা বন্দুক আছে—তৈয়ার, যে প্রথম কামরায় প্রবেশ করিবে, নিশ্চয় তাহার প্রাণ লইব।"

রঙ্গরাজ। একজন প্রবেশ করিব না—কয়জনকে মারিবেন? আপনিও ব্রাহ্মণ—আমিও ব্রাহ্মণ। এক তরফ ব্রহ্মহত্যা হইবে। মিছামিছি ব্রহ্মহত্যায় কাজ কি?

ব্রজেশ্বর বলিল, "সে পাপটা না হয় আমিই স্বীকার করিব।"

এই কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মড়মড় শব্দ হইল। বজরার পাশের দিকের একখানা কপাট ভাঙ্গিয়া, একজন ডাকাইত কামরার ভিতর প্রবেশ করিল দেখিয়া, ব্রজেশ্বর হাতের বন্দুক ফিরাইয়া তাহার মাথায় মারিল। দস্যু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে রঙ্গরাজ বাহিরের কপাটে জোরে দুইবার পদাঘাত করিল। কপাট ভাঙ্গিয়া গেল। রঙ্গরাজ কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। ব্রজেশ্বর আবার বন্দুক ফিরাইয়া ধরিয়া, রঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে রঙ্গরাজ তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। দুইজনেই তুল্য বলশালী, তবে রঙ্গরাজ অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত। ব্রজেশ্বর ভাল করিয়া ধরিতে না ধরিতে, রঙ্গরাজ বন্দুক কাড়িয়া লইল। ব্রজেশ্বর তখন দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সমুদায় বলের সহিত রঙ্গরাজের মাথায় এক ঘুষি তুলিল। রঙ্গরাজ ঘুষিটা হাতে ধরিয়া ফেলিল। বজরার একদিকে অনেক অস্ত্র ঝুলান ছিল। এই সময়ে ব্রজেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মধ্য হইতে একখানা তীক্ষ্ণধার

তরবারি লইয়া, হাসিয়া বলিল, "দেখ ঠাকুর, ব্রহ্মহত্যায় আমার ভয় নাই।" এই বলিয়া রঙ্গরাজকে কাটিতে ব্রজেশ্বর তরবারি উঠাইল। সেই সময়ে আর চারি পাঁচজন দস্যু মুক্তদ্বারে কামরার ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাহার উপর পড়িল। উত্থিত তরবারি হাত হইতে কাড়িয়া লইল। দুইজনে দুই হাত চাপিয়া ধরিল—একজন দড়ি লইয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "বাঁধিতে হইবে কি?" তখন ব্রজেশ্বর বলিল, "বাঁধিও না। আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। কি চাও বল—আমি দিতেছি।"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপনার যাহা কিছু আছে, সব লইয়া যাইব। কিছু ছাড়িয়া দিতে পারিতাম—কিন্তু যে কিল তুলিয়াছিলেন—আমার মাথায় লাগিলে মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত—এক পয়সাও ছাড়িব না।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "যাহা বজরায় আছে—সব লইয়া যাও, এখন আর আপত্তি করিব না।"

ব্রজেশ্বর এ কথা বলিবার পূর্ব্বেই দস্যুরা জিনিষপত্র বজরা হইতে ছিপে তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখন প্রায় পঁচিশ জন লোক বজরায় উঠিয়াছিল। জিনিষপত্র বজরায় বিশেষ কিছু ছিল না, কেবল পরিধেয় বস্ত্রাদি, পূজার সামগ্রী, এইরূপ মাত্র। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা সেই সকল দ্রব্য ছিপে তুলিয়া ফেলিল। তখন আরোহী রঙ্গরাজকে বলিল, "সব জিনিষ লইয়াছ—আর কেন দিক্ কর, এখন স্বস্থানে যাও।"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "যাইতেছি। কিন্তু আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।

ব্র। সে কি? আমি কোথায় যাইব?

রঙ্গ। আমাদের রাণীর কাছে।

ব্র। তোমাদের আবার রাণী কে?

রঙ্গ। আমাদের রাজরাণী।

ব্র। তিনি আবার কে? ডাকাইতের রাজরাণী ত কখন শুনি নাই।

রঙ্গ। দেবী রাণীর নাম কখনও শুনেন নাই?

ব্র। ও হো! তোমরা দেবী চৌধুরাণীর দল?

রঙ্গ। দলাদলি আবার কি? আমরা রাণীজির কার্‌পরদাজ।

ব্র। যেমন রাণী, তেমন কার্‌পরদাজ! তা, আমাকে রাণী দর্শনে যাইতে হইবে কেন? আমাকে কয়েদ রাখিয়া কিছু আদায় করিবে, এই অভিপ্রায়?

রঙ্গ। কাজেই। বজরায় ত কিছু পাইলাম না। আপনাকে আটক করিলে যদি কিছু পাওয়া যায়।

ব্র। আমারও যাইবার ইচ্ছা হইতেছে—তোমাদের রাজরাণী একটা দেখবার জিনিষ শুনিয়াছি। তিনি না কি যুবতী?

রঙ্গ। তিনি আমাদের মা—সন্তানে মার বয়সের হিসাব রাখে না।

ব্র। শুনিয়াছি বড় রূপবতী।

রঙ্গ। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।

ব্র। চল, তবে ভগবতী-দর্শনে যাই।

এই বলিয়া, ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন যে, বজরার মাঝিমাল্লা সকলে ভয়ে জলে পড়িয়া কাছি ধরিয়া ভাসিয়া আছে। ব্রজেশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, "এখন তোমরা বজরায় উঠিতে পার—ভয় নাই। উঠিয়া আল্লার নাম নাও। তোমাদের জান ও মান ও দৌলত ও ইর্জ্জৎ সব বজায় আছে! তোমরা বড় হুঁসিয়ার!

মাঝিরা তখন একে একে বজরায় উঠিতে লাগিল। ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার দ্বারবান্‌দের বাঁধন খুলিয়া দিতে পারি কি?"

রঙ্গরাজ বলিল, "আপত্তি নাই। উহারা যদি হাত খোলা পাইয়া, আমাদের উপর আক্রমণ করে, তখনই আমরা আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব। ইহা উহাদের বুঝাইয়া দিন।"

ব্রজেশ্বর দ্বারবান্‌দিগকে সেইরূপ বুঝাইয়া দিলেন। আর ভরসা দিলেন যে, তাহারা যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই তাহাদের ডালরুটির বরাদ্দ বাড়িবে। তখন ব্রজেশ্বর ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন যে, "তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এইখানে বজরা লইয়া থাক। কোথাও যাইও না বা কিছু করিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি রঙ্গরাজের সঙ্গে ছিপে উঠিলেন। ছিপের নাবিকেরা "দেবী রাণী-কি জয়" হাঁকিল—ছিপ বাহিয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর যাইতে যাইতে রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কত দূর লইয়া যাইবে—তোমার রাণীজি কোথায় থাকেন?"

রঙ্গ। ঐ বজরা দেখিতেছ না? ঐ বজরা তাঁর।

ব্রজ। ও বজরা? আমি মনে করিয়াছিলাম, ওখানা ইংগরেজের জাহাজ—রঙ্গপুর লুটিতে আসিয়াছে। তা অত বড় বজরা কেন?

রঙ্গ। রাণীকে রাণীর মত থাকিতে হয়। উহাতে সাতটা কামরা আছে।

ব্র। এত কামরায় কে থাকে ?

রঙ্গ। একটায় দরবার। একটায় রাণীর শয়নঘর। একটায় চাকরাণীরা থাকে। একটায় স্নান হয়। একটায় পাক হয়। একটা ফাটক। বোধ হয়, আপনাকে আজ সেই কামরায় থাকিতে হইবে।

এই কথোপকথন হইতে হইতে ছিপ আসিয়া বজরার পাশে ভিড়িল। দেবী রাণী ওরফে দেবী চৌধুরাণী তখন আর ছাদের উপর নাই। যতক্ষণ তাহার লোকে ডাকাইতি করিতেছিল, দেবী ততক্ষণ ছাদের উপর বসিয়া, জ্যোৎস্নালোকে বীণা বাজাইতেছিল। তখন বাজনাটা বড় ভাল হইতেছিল না—বেসুর, বেতাল, কি বাজিতে কি বাজে—দেবী অন্যমনা হইতেছিল। তারপরে যাই ছিপ ফিরিল, দেবী অমনি নামিয়া কামরার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। এদিকে রঙ্গরাজ ছিপ হইতে কামরার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া, "রাণীজি-কি জয়" বলিল। দ্বারে রেসমী পর্দ্দা ফেলা আছে—ভিতর দেখা যায় না। ভিতর হইতে দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি সংবাদ ?"

রঙ্গ। সব মঙ্গল।

দেবী। তোমাদের কেহ জখম হইয়াছে ?

রঙ্গ। কেহ না।

দেবী। তাহাদের কেহ খুন হইয়াছে ?

রঙ্গ। কেহ না—আপনার আজ্ঞামত কাজ হইয়াছে।

দেবী। তাহাদের কেহ জখম হইয়াছে ?

রঙ্গ। দুইটা হিন্দুস্থানী দুই একটা আঁচড় খেয়েছে। কাঁটা ফোটার মত।

দেবী। মাল ?

রঙ্গ। সব আনিয়াছি। মাল এমন কিছু ছিল না।

দেবী। বাবু ?

রঙ্গ। বাবুকে ধরিয়া আনিয়াছি।

দেবী। হাজির কর।

রঙ্গরাজ তখন ব্রজেশ্বরকে ইঙ্গিত করিল। ব্রজেশ্বর ছিপ হইতে উঠিয়া আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে ?" দেবীর যেন বিষম লাগিয়াছে—গলার আওয়াজটা বড় সাফ নয়।

ব্রজেশ্বর যেরূপ লোক, পাঠক এতক্ষণে বুঝিয়াছেন বোধ হয়। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি বালককাল হইতে জানেন না। যে দেবী চৌধুরাণীর নামে উত্তর-বাঙ্গালা

কাঁপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিলেন, "মেয়েমানুষকে পুরুষে ভয় করে, এ ত কখনও শুনি নাই। মেয়েমানুষ ত পুরুষের বাঁদী।" হাসিয়া ব্রজেশ্বর দেবীর কথায় উত্তর দিলেন, "পরিচয় লইয়া কি হইবে? আমার ধনের সঙ্গে আপনাদিগের সম্বন্ধ, তাহা পাইয়াছেন—নামে ত টাকা হইবে না।"

দেবী। হইবে বৈ কি? আপনি কি দরের লোক, তাহা জানিলে টাকার ঠিকানা হইবে। (তবু গলাটা ধরা ধরা।)

ব্রজ। সেই জন্যই কি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন?

দেবী। নহিলে আপনাকে আমরা আনিতাম না।

দেবী পর্দ্দার আড়ালে; কেহ দেখিল না যে, দেবী এই কথা বলিবার সময় চোখ মুছিল।

ব্রজ। আমি যদি বলি, আমার নাম দুঃখীরাম চক্রবর্ত্তী, আপনি বিশ্বাস করবেন কি?

দেবী। না।

ব্রজ। তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?

দেবী। আপনি বলেন কি না, দেখিবার জন্য।

ব্রজ। আমার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষাল।

দেবী। না।

ব্রজ। দয়ারাম বক্সী।

দেবী। তাও না।

ব্রজ। ব্রজেশ্বর রায়।

দেবী। হইতে পারে।

এই সময়ে দেবীর কাছে আর একজন স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসিয়া বসিল। বলিল, "গলাটা ধ'রে গেছে যে?"

দেবীর চক্ষের জল আর থাকিল না—বর্ষাকালের ফুটন্ত ফুলের ভিতর যেমন বৃষ্টির জল পোরা থাকে, ডাল নাড়া দিলেই জল ছড়্ ছড়্ করিয়া পড়িয়া যায়, দেবীর চোখে তেমনি জল পোরা ছিল, ডাল নাড়া দিতেই ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গেল। দেবী তখন ঐ স্ত্রীলোককে কানে কানে বলিল, "আমি আর এ রঙ্গ করিতে পারি না। তুই কথা ক'। সব জানিস্ ত?"

এই বলিয়া দেবী সে কামরা হইতে উঠিয়া অন্য কামরায় গেল। ঐ স্ত্রীলোকটি দেবীর আসন গ্রহণ করিয়া, ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে—ইনি সেই বামনশূন্য বামনী—নিশি ঠাকুরাণী।

নিশি বলিল, "এইবার ঠিক বলেছ—তোমার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ব্রজেশ্বরের একটু গোল বাধিল। পর্দ্দার আড়ালে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না—কিন্তু কথার আওয়াজে সন্দেহ হইল যে, যে কথা কহিতেছিল, এ সে বুঝি নয়। তার আওয়াজটা বড় মিঠে লাগিতেছিল—এ বুঝি তত মিঠে নয়। যাই হউক, কথার উত্তরে ব্রজেশ্বর বলিলেন, "যদি আমার পরিচয় জানেন, তবে এই বেলা দরটা চুকাইয়া লউন—আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই। কি দরে আমাকে ছাড়িবেন?"

নিশি। এককড়া কাণা কড়ি। সঙ্গে আছে কি? থাকে যদি, দিয়া চলিয়া যান।

ব্রজ। আপাততঃ সঙ্গে নাই।

নিশি। বজরা হইতে আনিয়া দিন।

ব্রজ। বজরাতে যাহা ছিল, তাহা আপনার অনুচরেরা লইয়া আসিয়াছে। আর এক কড়া কাণা কড়িও নাই।

নিশি। মাঝিদের কাছে ধার করিয়া আমুন।

ব্রজ। মাঝিরাও কাণা কড়ি রাখে না।

নিশি। তবে যতদিন না আপনার উপযুক্ত মূল্য আনাইয়া নিতে পারেন, তত দিন কয়েদ থাকুন।

ব্রজেশ্বর তারপর শুনিলেন, কামরার ভিতরে আর একজন কে—কণ্ঠে সেও বোধ হয় স্ত্রীলোক—দেবীকে বলিতেছে, "রাণীজি! যদি এক কড়া কাণা কড়িই এই মানুষটার দর হয়, তবে আমি এক কড়া কাণা কড়ি দিতেছি। আমার কাছে উহাকে বিক্রী করুন।

ব্রজেশ্বর শুনিলেন, রাণী উত্তর করিল, "ক্ষতি কি? কিন্তু মানুষটা নিয়ে তুমি কি করিবে? ব্রাহ্মণ, জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে পারিবে না।"

ব্রজেশ্বর প্রত্যুত্তরও শুনিলেন,—রমণী বলিল, "আমার রাঁধিবার ব্রাহ্মণ নাই। আমাকে রাঁধিয়া দিবে।"

তখন নিশি ব্রজেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"শুনিলেন,—আপনি বিক্রী হইলেন—আমি কাণা কড়ি পাইয়াছি। যে আপনাকে কিনিল, আপনি তাহার সঙ্গে যান, রাঁধিতে হইবে।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "কই তিনি?"

নিশি। স্ত্রীলোক—বাহিরে যাইবে না, আপনি ভিতরে আসুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর অনুমতি পাইয়া, পর্দ্দা তুলিয়া, কামরার ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, ব্রজেশ্বর তাহাতে বিস্মিত হইল। কামরার কাষ্ঠের দেওয়াল, বিচিত্র চারু চিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে ভক্ত জনে দশভুজা প্রতিমা পূজা করিবার মানসে প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র। শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ; মহিষাসুরের যুদ্ধ; দশ অবতার; অষ্ট নায়িকা; সপ্ত মাতৃকা; দশ মহাবিদ্যা; কৈলাস; বৃন্দাবন; লঙ্কা; ইন্দ্রালয়; নবনারী-কুঞ্জর; বস্ত্রহরণ; সকলই চিত্রিত। সেই কামরায় চারি আঙ্গুল পুরু গালিচা পাতা, তাহাতেও কত চিত্র। তার উপর কত উচ্চ মসনদ—মখমলের কামদার বিছানা, তিনদিকে সেইরূপ বালিশ; সোনার আতরদান, তারই গোলাব-পাশ, সোনার বাটা, সোনার পুষ্পপাত্র—তাহাতে রাশিকৃত সুগন্ধি ফুল; সোনার আলবোলা; পোরজরের সট্‌কা—সোনার মুখনলে মতির থোপ ঝুলিতেছে—তাহাতে মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজা আছে। দুই পাশে দুই রূপার ঝাড়, তাহাতে বহুসংখ্যক সুগন্ধি দীপ রূপার পরীর মাথার উপর জ্বলিতেছে; উপরের ছাদ হইতে একটি ছোট দীপ সোনার শিকলে লট্‌কান আছে। চারি কোণে চারিটি রূপার পুতুল, চারিটি বাতি হাতে করিয়া ধরিয়া আছে।—মসনদের উপর একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে—তাহার মুখের উপর একখানা বড় মিহি জরির বুটাদার ঢাকাই রুমাল ফেলা আছে। মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না—কিন্তু তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণ—আর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ অনুভূত হইতেছে; কানের গহনা কাপড়ের ভিতর হইতে জ্বলিতেছে—তার অপেক্ষা বিস্তৃত চক্ষের তীব্র কটাক্ষ আরও ঝলসিতেছে। স্ত্রীলোকটি শুইয়া আছে—ঘুমায় নাই।

ব্রজেশ্বর দরবার-কামরায় প্রবেশ করিয়া, শয়ানা সুন্দরীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণীজীকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?"

সুন্দরী উত্তর করিল, "আমি রাণীজি নই।"

ব্রজেশ্বর দেখিল, এতক্ষণ ব্রজেশ্বর যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, এ তাহার গলার আওয়াজ নহে। অথচ তার আওয়াজ হইতে পারে; কেন না, বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এ স্ত্রীলোক কণ্ঠ বিকৃত করিয়া কথা কহিতেছে। মনে করিল, বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা, মায়াবিনী—এত কুহক না জানিলে মেয়েমানুষ হইয়া ডাকাইতি করে? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম—তিনি কোথায়?"

সুন্দরী বলিল, "তোমাকে আসিতে অনুমতি দিয়া, তিনি শুইতে গিয়াছেন। রাণীতে তোমার কি প্রয়োজন?"

ব্র। তুমি কে?

সুন্দরী। তোমার মুনিব।

ব্র। আমার মুনিব?

সুন্দরী। জান না, এইমাত্র তোমাকে এক কড়া কাণা কড়ি দিয়া কিনিয়াছি?

ব্র। সত্য বটে। তা তোমাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?

সুন্দরী। আশীর্ব্বাদের রকম আছে না কি?

ব্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে আছে। সধবাকে এক রকম আশীর্ব্বাদ করিতে হয়,—বিধবাকে অন্যরূপ। পুত্রবতীকে—

সুন্দরী। আমাকে "শিগ্‌গির মর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ কর।

ব্র। সে আশীর্ব্বাদ আমি কাহাকেও করি না—তোমার এক-শ তিন বছর পরমায়ু হৌক।

সুন্দরী। আমার বয়স পঁচিশ বৎসর। আটাত্তর বৎসর ধরিয়া তুমি আমার ভাত রাঁধিবে?

ব্র। আগে একদিন ত রাঁধি। খেতে পার ত, না হয় আটাত্তর বৎসর রাঁধিব।

সুন্দরী। তবে বসো—কেমন রাঁধিতে জান, পরিচয় দাও।

ব্রজেশ্বর তখন সেই কোমল গালিচার উপর বসিল। সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

ব্র। তা ত তোমরা সকলেই জান, দেখিতেছি। আমার নাম ব্রজেশ্বর তোমার নাম কি? গলা অত মোটা করিয়া কথা কহিতেছ কেন? তুমি কি চেনা মানুষ?

সুন্দরী। আমি তোমার মুনিব—আমাকে "আপনি' 'মশাই' আর 'আজ্ঞে' বলিবে।

ব্র। আজ্ঞে, তাই হইবে। আপনার নাম?

সুন্দরী। আমার নাম পাঁচকড়ি। কিন্তু তুমি আমার ভৃত্য, আমার নাম ধরিতে পারিবে না। বরং বল ত আমিও তোমার নাম ধরিব না

ব্র। তবে কি বলিয়া ডাকিলে আমি 'আজ্ঞা' বলিব?

পাঁচকড়ি। আমি 'রামধন' বলিয়া তোমাকে ডাকিব। তুমি আমাকে 'মুনিব ঠাকুরুণ' বলিও। এখন তোমার পরিচয় দাও—বাড়ী কোথায়?

ব্র। এক কড়ায় কিনিয়াছ—অত পরিচয়ের প্রয়োজন কি?

পাঁচ। ভাল, সে কথা নাই বলিলে। রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব। রাঢ়ী, না বারেন্দ্র, না বৈদিক?

ব্র। হাতের ভাত ত খাইবেন—যাই হই না।

পাঁচ। তুমি যদি আমার স্বশ্রেণী না হও—তাহা হইলে তোমাকে অন্য কাজে দিব।

ব্র। অন্য কি কাজ?

পাঁচ। জল তুলিবে, কাঠ কাটিবে—কাজের অভাব কি!

ব্র। আমি রাঢ়ী।

পাঁচ। তবে তোমায় জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে হইবে—আমি বারেন্দ্র। তুমি রাঢ়ী—কুলীন, না বংশজ?

ব্র। এ কথা ত বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ যুটিবে কি? আমি কৃতদার।

পাঁচ। কৃতদার? কয় সংসার করিয়াছেন?

ব্র। জল তুলিতে হয়—জল তুলিব—অত পরিচয় দিব না।

তখন পাঁচকড়ি দেবী রাণীকে ডাকিয়া বলিল, "রাণীজি! বামুন ঠাকুর বড় অবাধ্য। কথার উত্তর দেয় না।"

নিশি অপর কক্ষ হইতে উত্তর করিল, "বেত লাগাও।"

তখন দেবীর একজন পরিচারিকা সপাৎ করিয়া একগাছা লিক্‌লিকে সরু বেত পাঁচকড়ির বিছানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি বেত পাইয়া ঢাকাই রুমালের ভিতর মধুর অধর চারু দন্তে টিপিয়া বিছানায় বার দুই বেতগাছা আছড়াইল। ব্রজেশ্বরকে বলিল, "দেখিয়াছ?"

ব্রজেশ্বর হাসিল। বলিল, "আপনারা সব পারেন। কি বলিতে হইবে বলিতেছি।

পাঁচ। তোমার পরিচয় চাই না—পরিচয় লইয়া কি হইবে? তোমার রান্না ত খাইব না। তুমি আর কি কাজ করিতে পার, বল?

ব্র। হুকুম করুন।

পাঁচ। জল তুলিতে জান?

ব্র। না।

পাঁচ। কাঠ কাটিতে জান?

ব্র। না।

পাঁচ। বাজার করিতে জান?

ব্র। মোটামুটি রকম।

পাঁচ। মোটামুটিতে চলিবে না। বাতাস করিতে জান?

ব্র। পারি।

পাঁচ। আচ্ছা, এই চামর নাও, বাতাস কর।

ব্রজেশ্বর চামর লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। পাঁচকড়ি বলিল, "আচ্ছা, একটা কাজ জান? পা টিপিতে জান?"

ব্রজেশ্বরের দুরদৃষ্ট, তিনি পাঁচকড়িকে মুখরা দেখিয়া, একটি ছোট রকমের রসিকতা করিতে গেলেন। এই দস্যুনেত্রীদিগের কোন রকমে খুসী করিয়া মুক্তিলাভ করেন, সে অভিপ্রায়ও ছিল। অতএব পাঁচকড়ির কথার উত্তরে বলিলেন, "তোমাদের মত সুন্দরীর পা টিপিব, সে ত ভাগ্য—"

"তবে একবার টেপ না" বলিয়া অমনি পাঁচকড়ি আল্‌তাপরা রাঙ্গা পাখানি ব্রজেশ্বরের উরুর উপর তুলিয়া দিল।

ব্রজেশ্বর নাচার—আপনি পা টেপার নিমন্ত্রণ লইয়াছেন, কি করেন। ব্রজেশ্বর কাজেই দুইহাতে পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিলেন, "এ কাজটা ভাল হইতেছে না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি।"

তখন দুষ্টা পাঁচকড়ি ডাকিল, "রাণীজি! একবার এদিকে আসুন।"

দেবী আসিতেছে, ব্রজেশ্বর পায়ের শব্দ পাইল। পা নামাইয়া দিল। পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল, "সে কি?" পিছাও কেন?" পাঁচকড়ি সহজ গলায় কথা কহিয়াছিল। ব্রজেশ্বর বড় বিস্মিত হইলেন,—"সে কি? এ গলা ত চেনা গলাই বটে।" সাহস করিয়া ব্রজেশ্বর পাঁচকড়ির মুখঢাকা রুমালখানা খুলিয়া লইলেন। পাঁচকড়ি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি? এ কি? তুমি—তুমি সাগর?"

পাঁচকড়ি বলিল, "আমি সাগর। গঙ্গা নই—যমুনা নই—বিল নই—খাল নই—সাক্ষাৎ সাগর। তোমার বড় অভাগ্য—না? যখন পরের স্ত্রী মনে করিয়াছিলে, তখন বড় আহ্লাদ করিয়া পা টিপিতেছিলে, আর যখন ঘরের স্ত্রী হইয়া পা টিপিতে বলিয়াছিলাম, তখন রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেলে! যাক্, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। তুমি আমার পা টিপিয়াছ এখন আমার মুখ পানে চাহিয়া দেখিতে পার, আমায় ত্যাগ কর, আর পায়ে রাখ—এখন জানিলে, আমি যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর কিয়ৎক্ষণ বিহ্বল হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "সাগর! তুমি এখানে কেন?" সাগর বলিল, "সাগরের স্বামী! তুমিই বা এখানে কেন?"

ব্র। তাই কি? আমি কয়েদী, তুমিও কি কয়েদী? আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে। তোমাকেও কি ধরিয়া আনিয়াছে?

সাগর। আমি কয়েদী নই, আমাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই। আমি ইচ্ছাক্রমে দেবী রাণীর সাহায্য লইয়াছি। তোমাকে দিয়া আমার পা টিপাইব বলিয়া দেবী রাণীর রাজ্যে বাস করিতেছি।

তখন নিশি আসিল। ব্রজেশ্বর তাহার বস্ত্রালঙ্কারে জাঁকজমক দেখিয়া মনে করিল, "এই দেবী চৌধুরাণী।" ব্রজেশ্বর সম্ভ্রম রাখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশি বলিল, "স্ত্রীলোক ডাকাইত হইলেও তাহার অত সম্মান করিতে নাই—আপনি বসুন। এখন শুনিলেন, কেন আপনার বজরায় আমরা ডাকাইতি করিয়াছি? এখন সাগরের পণ উদ্ধার হইয়াছে; এখন আপনাতে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার নৌকায় ফিরিয়া যাইলে কেহ আটক করিবে না। আপনার জিনিষপত্র এক কপর্দ্দক কেহ লইবে না, সব আপনার বজরায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। কিন্তু এই একটা কপর্দ্দক—এই পোড়ারমুখী সাগর, ইহার কি হইবে? এ কি বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? ইহাকে আপনি লইয়া যাইবেন কি? মনে করুন, আপনি উহার এক কড়ার কেনা গোলাম।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। ব্রজেশ্বর বিহ্বল হইল। তবে ডাকাইতি সব মিথ্যা, এরা ডাকাইত নয়! ব্রজেশ্বর ক্ষণেক ভাবিল, ভাবিয়া শেষে বলিল, "তোমরা আমায় বোকা বানাইলে। আমি মনে করিয়াছিলাম, দেবী চৌধুরাণীর দলে আমার বজরায় ডাকাইতি করিয়াছে।"

তখন নিশি বলিল, "সত্য সত্যই দেবী চৌধুরাণীর এই বজরা। দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন,"—কথা শেষ হইতে না হইতেই ব্রজেশ্বর বলিল, "দেবী রাণী সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন'—তবে আপনি কি দেবী রাণী নন?"

নিশি। আমি দেবী নই। আপনি যদি রাণীজিকে দেখিতে চান, তিনি দর্শন দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, তা আগে শুনুন। আমরা সত্য সত্যই ডাকাইতি করি, কিন্তু আপনার উপর ডাকাইতি করিবার আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা। এখন সাগর বাড়ী যায় কি প্রকারে? প্রতিজ্ঞা ত রক্ষা হইল।

ব্র। আসিল কি প্রকারে ?

নিশি। রাণীজির সঙ্গে।

ব্র। আমিও ত সাগরের পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—সেখান হইতেই আসিতেছি। কই, সেখানে ত রাণীজিকে দেখি নাই ?

নিশি। রাণীজি আপনার পর সেখানে গিয়াছিলেন।

ব্র। তবে ইহার মধ্যে এখানে আসিলেন কি প্রকারে ?

নিশি। আমাদের ছিপ দেখিয়াছেন ত ? পঞ্চাশ বোটে।

ব্র। তবে আপনারাই কেন ছিপে করিয়া সাগরকে রাখিয়া আসুন না ?

নিশি। তাতে একটু বাধা আছে। সাগর কাহাকে না বলিয়া রাণীর সঙ্গে আসিয়াছে—এজন্য অন্য লোকের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে, সবাই জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় গিয়াছিলে ? আপনার সঙ্গে ফিরিয়া গেলে উত্তরের ভাবনা নাই।

ব্র। ভাল, তাই হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছিপ হুকুম করিয়া দিন।

"দিতেছি" বলিয়া নিশি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

তখন সাগরকে নির্জ্জনে পাইয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "সাগর !" তুমি কেন এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে ?"

মুখে অঞ্চল দিয়া—এবার ঢাকাই রুমাল নহে—কাপড়ের যেখানটা হাতে উঠিল, সেইখানটা মুখে ঢাকা দিয়া সাগর কাঁদিল—সেই মুখরা সাগর টিপিয়া টিপিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, চুপি চুপি ভারি কান্না কাঁদিল ! চুপি চুপি—পাছে দেবী শোনে।

কান্না থামিলে ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "সাগর ! তুমি আমায় ডাকিলে না কেন ? ডাকিলেই সব মিটিয়া যাইত।"

সাগর কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া, চক্ষু মুছিয়া বলিল, "কপালের ভোগ, কিন্তু আমি নাই ডাকিয়াছি—তুমিই বা আসিলে না কেন ?"

ব্র। তুমি আমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলে—না ডাকিলে যাই কি বলিয়া ?

এই সকল কথাবার্ত্তা যথাশাস্ত্র সমাপন হইলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "সাগর ! তুমি ডাকাইতের সঙ্গে কেন আসিলে ?"

সাগর বলিল, "দেবী—সম্বন্ধে আমার ভগিনী হয়, পূর্ব্বে জানাশুনা ছিল। তুমি চলিয়া আসিলে, সে গিয়া আমার বাপের বাড়ী উপস্থিত হইল। আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া সে বলিল, 'কাঁদ কেন ভাই—তোমার শ্যামচাঁদকে আমি বেঁধে এনে দিব। আমার সঙ্গে দুইদিনের তরে এসো।' তাই আমি আসিলাম। দেবীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবার আমার বিশেষ কারণ আছে। তোমার সঙ্গে আমি পলাইয়া চলিলাম,

এই কথা আমি চাকরাণীকে বলিয়া আসিয়াছি। তোমার জন্য এই সব আলবোলা, সট্‌কা প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়াছি—একবার তামাক টামাক খাও, তারপর যেও।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "কই, যে মালিক, সে ত কিছু বলে না।"

তখন সাগর দেবীকে ডাকিল। দেবী আসিল না—নিশি আসিল।

নিশিকে দেখিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "এখন আপনি ছিপ হুকুম করিলেই যাই।"

নিশি। ছিপ তোমারই। কিন্তু দেখ, তুমি রাণীর বোনাই—কুটুম্বকে স্বস্থানে পাইয়া আমরা আদর করিলাম না—কেবল অপমানই করিলাম, এ বড় দুঃখ থাকে। আমরা ডাকাইত বলিয়া আমাদের কি হিন্দুয়ানি নাই?

ব্র। কি করিতে বলেন?

নিশি। প্রথমে উঠিয়া ভাল হইয়া বসো।

নিশি মসনদ দেখাইয়া দিল। ব্রজেশ্বর শুধু গালিচায় বসিয়াছিল। বলিল, "কেন, আমি বেশ বসিয়া আছি।"

তখন নিশি সাগরকে বলিল, "ভাই, তোমার সামগ্রী তুমি তুলিয়া বসাও। জান, আমরা পরের দ্রব্য ছুঁই না।" হাসিয়া বলিল, "সোনা রূপা ছাড়া।"

ব্র। তবে আমি কি পিতল কাঁসার দলে পড়িলাম?

নিশি। আমি ত তা মনে করি—পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকিলে ঘর সংসার চলে না—তাই রাখিতে হয়। কথায় কথায় সক্‌ড়ি হয়—মাজিয়া ঘষিয়া ধুইয়া, ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়। নে ভাই সাগর, তোর ঘটি বাটি তফাৎ কর—কি জানি, যদি সক্‌ড়ি হয়।

ব্র। একে ত পিতল কাঁসা—তার মধ্যে আবার ঘটি বাটি! ঘড়াটা গাড়ুটার মধ্যে গণ্য হইবারও যোগ্য নই?

নিশি। আমি ভাই বৈষ্ণবী, তৈজসের ধার ধারি না—আমাদের দৌড় মালসা পর্য্যন্ত। তৈজসের খবর সাগরকে জিজ্ঞাসা কর।

সাগর। আমি ঠিক কথা জানি। পুরুষমানুষ তৈজসের মধ্যে কলসী। সদাই অন্তঃশূন্য—আমরা যাই গুণবতী, তাই জল পূরিয়া পূর্ণকুম্ভ করিয়া রাখি।

নিশি বলিল, "ঠিক বলিয়াছিস্—তাই মেয়েমানুষে এ জিনিষ গলায় বাঁধিয়া সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে।—নে ভাই, তোর কলসী, কলসী পীড়ির উপর তুলিয়া রাখ"

ব্র। কলসী মানে মানে আপনি পীড়ির উপর উঠিতেছে।

এই কথা বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনি মসনদের উপর উঠিয়া বসিল। হঠাৎ দুইদিক্ হইতে দুইজন পরিচারিকা—সুন্দরী যুবতী, বহুমূল্য বসন-ভূষণ-ভূষিতা—দুইটা

সোনা-বাঁধা চামর হাতে করিয়া, ব্রজেশ্বরের দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ্ঞা না পাইয়াও তাহারা ব্যজন করিতে লাগিল। নিশি তখন সাগরকে বলিল, "যা, এখন তোর স্বামীর জন্য আপন হাতে তামাকু সাজিয়া লইয়া আয়।"

সাগর ক্ষিপ্রহস্তে সোনার আলবোলার উপর হইতে কলিকা লইয়া গিয়া, শীঘ্র মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া আনিল। আলবোলায় চড়াইয়া দিল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "আমাকে একটা হুঁকায় নল করিয়া তামাকু দাও।"

নিশি বলিল, "কোন শঙ্কা নাই—ঐ আলবোলা উৎসৃষ্ট নয়। কেহ কখন উহাতে তামাকু খায় নাই। আমরা কেহ তামাকু খাই না।',

ব্র। সে কি? তবে এ আলবোলা কেন?

নিশি। দেবীর রাণীগিরির দোকানদারি—

ব্র। তা হৌক—আমি যখন আসিলাম, তখন যে তামাকু সাজা ছিল—কে খাইতেছিল?

নিশি। কেহ না—সাজাও দোকানদারি—

ঐ আলবোলা সেইদিন বাহির হইয়াছে—ঐ তামাকু সেইদিন কেনা হইয়া আসিয়াছে—সাগরের স্বামী আসিবে বলিয়া। ব্রজেশ্বর মুখনলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—অভুক্ত বোধ হয়। তখন ব্রজেশ্বর ধূমপানের অনির্ব্বচনীয় সুখে মগ্ন হইলেন। নিশি তখন সাগরকে বলিল, "তুই পোড়ারমুখী, আর দাঁড়াইয়া কি করিস্—পুরুষমানুষে হুকার নল মুখে করিলে আর কি স্ত্রী পরিবারকে মনে ঠাই দেয়? যা, তুই গোটাকত পান সাজিয়া আন। দেখিস্—আপন হাতে পান সাজিয়া আনিস্—পরের সাজা আনিস্ না—পারিস্ যদি একটু ওষুধ করিস্।"

সাগর বলিল, "আপন হাতেই সাজা আছে—ওষুধ জানিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?

এই বলিয়া সাগর চন্দন কর্পূর চুয়া গোলাবে সুগন্ধি পানের রাশি সোনার বাটা পুরিয়া আনিল। তখন নিশি বলিল, "তোর স্বামীকে অনেক বকেছিস্—কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।"

ব্রজেশ্বরের মুখ শুকাইল, "সর্ব্বনাশ! এত রাত্রে জলখাবার! ঐটি মাফ করিও।"

কিন্তু কেহ তাহার কথা শুনিল না—সাগর বড় তাড়াতাড়ি আর এক কামরায় ঝাঁট দিয়া, জলের হাতে মুছিয়া, একখানা বড় ভারী পুরু আসন পাতিয়া চারি পাঁচখানা রূপার থালে সামগ্রী সাজাইয়া ফেলিল। স্বর্ণ-পাত্রে উত্তম সুগন্ধি শীতল জল রাখিয়া দিল। জানিতে পারিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে বলিল, "ঠাঁই হইয়াছে—

উঠ।" ব্রজেশ্বর উঁকি মারিয়া দেখিয়া, নিশির কাছে যোড়হাত করিল। বলিল, "ডাকাইতি করিয়া ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিয়াছ—সে অত্যাচার সহিয়াছে—কিন্তু এত রাত্রে এ অত্যাচার সহিবে না—দোহাই।"

স্ত্রীলোকেরা মার্জ্জনা করিল না। ব্রজেশ্বর অগত্যা কিছু খাইল। সাগর তখন নিশিকে বলিল, "ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।" নিশি বলিল, "দক্ষিণা রাণী স্বয়ং দিবেন। এসো ভাই, রাণী দেখিবে এসো।" এই বলিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে আর এক কামরায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশি ব্রজেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া দেবীর শয্যাগৃহে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, শয়নঘর দরবার-কামরার মত অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত। বেশীর ভাগ, একখানা সুবর্ণ-মণ্ডিত মুক্তার ঝালরযুক্ত ক্ষুদ্র পালঙ্ক আছে। কিন্তু ব্রজেশ্বরের সে সকল দিকে চক্ষু ছিল না। এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী প্রথিতনাম্নী দেবীকে দেখিবেন। দেখিলেন, কামরার ভিতর অনাবৃত কাষ্ঠের উপর বসিয়া, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোক। নিশি ও সাগরে, ব্রজেশ্বর যে চাঞ্চল্যময়তা দেখিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার কিছুই নাই! এ স্থিরা, ধীরা—নিম্নদৃষ্টি, লজ্জাবনতমুখী। নিশি ও সাগর, বিশেষতঃ নিশি সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারমণ্ডিতা, বহুমূল্য বসনে আবৃতা,—কিন্তু ইহার তা কিছুই নাই। দেবী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের ভরসায় বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হইলে, দেবী সে সকলই ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিয়া, হাতে কেবল একখানি মাত্র সামান্য অলঙ্কার রাখিয়া ব্রজেশ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে নিশির বুদ্ধিতে দেবী ভ্রমে পড়িয়াছিল; শেষে বুঝিতে পারিয়া আপনা আপনি তিরস্কার করিয়াছিল; "ছি! ছি! ছি! কি করিয়াছি! ঐশ্বর্য্যের ফাঁদ পাতিয়াছি!" তাই এ বেশ পরিবর্ত্তন।

ব্রজেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর প্রবেশ করিলে, দেবী গাত্রোত্থান করিয়া ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিল। দেখিয়া ব্রজেশ্বর আরও বিস্মিত হইল —কই, আর কেহ ত প্রণাম করে নাই। দেবী তখন ব্রজেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল— ব্রজেশ্বর দেখিল, যথার্থ দেবীমূর্ত্তি! এমন আর কখন দেখিয়াছে কি? হ্যাঁ, ব্রজ আর একবার এমনই দেখিয়াছিল। সে আরও মধুর,—কেন না, দেবীমূর্ত্তি তখন বালিকার মূর্ত্তি—ব্রজেশ্বরের তখন প্রথম যৌবন। হায়! এ যদি সেই হইত! এ মুখ দেখিয়া, ব্রজেশ্বরের সে মুখ মনে পড়িল, কিন্তু দেখিলেন, এ মুখ সে মুখ নহে। তার কি কিছুই

এতে নাই ? আছে বৈ কি—কিছু আছে। ব্রজেশ্বর তাই অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। সে ত অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে—তবে মানুষে মানুষে কখন কখন এমন সাদৃশ্য থাকে যে, একজনকে দেখিলে আর একজনকে মনে পড়ে। এ তাই না ব্রজ?

ব্রজ তাই মনে করিল। কিন্তু সেই সাদৃশ্যেই হৃদয় ভরিয়া গেল—ব্রজের চক্ষে জল আসিল, পড়িল না। তাই দেবী সে জল দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে আজ একটা কাণ্ডকারখানা হইয়া যাইত। দুইখানা মেঘেই বৈদ্যুতি ভরা।

প্রণাম করিয়া, নিম্ননয়নে দেবী বলিতে লাগিল, "আমি আপনাকে আজ জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বড় কষ্ট দিয়াছি। কেন এমন কুকর্ম্ম করিয়াছি, শুনিয়াছেন। আমার অপরাধ লইবেন না।"

ব্রজেশ্বর বলিলেন, "আমার উপকারই করিয়াছেন।" বেশী কথা বলিবার ব্রজেশ্বরের শক্তি নাই।

দেবী আরও বলিল, "আপনি আমার এখানে দয়া করিয়া জলগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। আপনি কুলীন—আপনারও মর্য্যাদা রাখা আমার কর্ত্তব্য। আপনি আমার কুটুম্ব। যাহা মর্য্যাদাস্বরূপ আমি আপনাকে দিতেছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

ব্র। স্ত্রীর মত কোন্ ধন ? আপনি তাই আমাকে দিয়াছেন। ইহার বেশী আর কি দিবেন ?

ও ব্রজেশ্বর! কি বলিলে? স্ত্রীর মত ধন আর নাই? তবে বাপ বেটায় মিলিয়া প্রফুল্লকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে কেন ?

পালঙ্কের পাশে একটি রূপার কলসী ছিল—তাহা টানিয়া বাহির করিয়া, দেবী ব্রজেশ্বরের নিকটে রাখিল, বলিল, "ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে।"

ব্রজ। আপনার বজবায় এত সোনা রূপার ছড়াছড়ি যে, এই কলসীটা নিতে আপত্তি করিলে, সাগর আমায় বকিবে। কিন্তু একটা কথা আছে—

কথাটা কি—দেবী বুঝিল, বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ চুরি ডাকাইতির নহে। আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে—শুনিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রহণপক্ষে কোন সংশয় করিবেন না।"

ব্রজেশ্বর সম্মত হইল—কুলীনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের "বিদায়" বা "মর্য্যাদা" গ্রহণে লজ্জা ছিল না—এখনও বোধ হয় নাই। কলসীটা বড় ভারী ঠেকিল, ব্রজেশ্বর সহজে তুলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এ কি এ? কলসীটা নীরেট না কি ?"

দেবী। টানিবার সময়ে উহার ভিতর শব্দ হইয়াছিল—নিরেট সম্ভবে না।

ব্র। তাই ত? এতে কি আছে?

কলসীতে ব্রজেশ্বর হাত পূরিয়া তুলিল—মোহর। কলসী মোহরে পরিপূর্ণ।

ব্র। এগুলি কিসে ঢালিয়া রাখিব?

দেবী। ঢালিয়া রাখিবেন কেন? এগুলি সমস্তই আপনাকে দিয়াছি।

ব্র। কি?

দেবী। কেন?

ব্র। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শ।

ব্র। তেত্রিশ শ মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। সাগর আপনাকে টাকার কথা বলিয়াছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনিয়াছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্র। তাই দিতেছেন?

দেবী। টাকা আমার নহে, আমার দান করিবার অধিকার নাই। টাকা দেবতার, দেবত্র আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্র সম্পত্তি হইতে আপনাকে এই টাকা কর্জ্জ দিতেছি।

ব্র। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বোধ হয়, চুরি ডাকাতি করিয়াও যদি আমি এ টাকা সংগ্রহ করি, তাহা হইলেও অধর্ম্ম হয় না; কেন না, এ টাকা নহিলে আমার বাপের জাতিরক্ষা হয় না। আমি এ টাকা লইব। কিন্তু কবে পরিশোধ করিতে হইবে?

দেবী। দেবতার সম্পত্তি, দেবতা পাইলেই হইল। আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে পর ঐ টাকার আসল আর এক মোহর সুদ দেবসেবায় ব্যয় করিবেন।

ব্র। সে আমারই ব্যয় করা হইবে। সে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত নহি।

দেবী। আপনার যে রূপ ইচ্ছা, সেইরূপে পরিশোধ করিবেন।

ব্র। আমার টাকা জুটিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

দেবী। আপনার লোক কেহ আমার কাছে আসিবে না, আসিতেও পারিবে না।

ব্র। আমি নিজে টাকা লইয়া আসিব।

দেবী। কোথায় আসিবেন? আমি একস্থানে থাকি না।

ব্র। যেখানে বলিয়া দিবেন।

দেবী। দিন ঠিক করিয়া বলিলে, আমি স্থান ঠিক করিয়া বলিতে পারি।

ব্র। আমি মাঘ ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু একটু বেশী করিয়া সময় লওয়া ভাল। বৈশাখ মাসে টাকা দিব।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আনিবেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকিব। সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের পর আসিলে আমার দেখা পাইবেন না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইলেন। তখন দেবী পরিচারিকাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, মোহরের ঘড়া ছিপে উঠাইয়া দিয়া আইস। পরিচারিকারা ঘড়া ছিপে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বরও দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ছিপে যাইতেছিলেন। তখন দেবী নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা বাকি আছে। এ ত কর্জ্জ দিলাম—মর্য্যাদা দিলাম কই ?"

ব্র। কলসীটা মর্য্যাদা।

দেবী। আপনার যোগ্য মর্য্যাদা নহে। যথাসাধ্য মর্য্যাদা রাখিব।

এই বলিয়া দেবী আপনার আঙ্গুল হইতে একটা আঙ্গটি খুলিল। ব্রজেশ্বর তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সহাস্যবদনে হাত পাতিলেন। দেবী হাতের উপর আঙ্গটি ফেলিয়া দিল না—ব্রজেশ্বরের হাতখানি ধরিল—আপনি আঙ্গটি পরাইয়া দিবে।

ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোলমাল হইয়া গেল, জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল না। শরীরে কাঁটা দিল—ভিতরে যেন অমৃত স্রোত ছুটিল। জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর, হাতটা সরাইয়া লইতে ভুলিয়া গেল। বিধাতা এক এক সময়ে এমনই বাদ সাধেন যে, সময়ে আপন কাজ ভুলিয়া যাইতে হয়।

তা, দেবী সেই মানসিক গোলযোগের সময় ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে ধীরে ধীরে আঙ্গটি পরাইতে লাগিল। সেই সময়ে ফোঁটা দুই তপ্ত জল ব্রজেশ্বরের হাতের উপর পড়িল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, দেবীর মুখ চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। কি রকমে কি হইল, বলিতে পারি না, ব্রজেশ্বর ত জিতেন্দ্রিয়—কিন্তু মনের ভিতর কি একটা গোল বাধিয়াছিল। সেই আর একখানা মুখ মনে পড়িল—বুঝি, সে মুখে সেই রাত্রে এমনই অশ্রুধারা বহিয়াছিল—সে চোখের জল মোছানটাও বুঝি মনে পড়িল ; এই সেই, সেই এই, কি এমনই একটা কি গোলমাল বাধিয়া গেল। ব্রজেশ্বর কিছু না বুঝিয়া—কেন জানি না—দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাতে ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখখানা প্রফুল্লের মত দেখিল। বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে—আ ছি ছি! ব্রজেশ্বর! আবার!

তখন ব্রজেশ্বরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করিলাম! এ কি প্রফুল? সে যে দশ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়াছে! ব্রজেশ্বর উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া, একেবারে ছিপে গিয়া উঠিল। সাগরকে সঙ্গে লইয়াও গেল না। সাগর "ধর! ধর! আসামী পলায়!" বলিয়া, পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া ছিপে উঠিল। ছিপ খুলিয়া ব্রজেশ্বরকে ও ব্রজেশ্বরের দুই রত্নাধার—একটি সাগর আর একটি কলসী—ব্রজেশ্বরের নৌকায় পৌঁছাইয়া দিল।

এদিকে নিশি আসিয়া দেবীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। নিশি তাহাকে উঠাইয়া বসাইল—চোখের জল মুছাইয়া দিল—সুস্থির করিল। তখন নিশি বলিল, "এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম? এই কি সন্ন্যাস? ভগবদ্বাগ্য কোথায় মা, এখন?"

দেবী চুপ করিয়া রহিল। নিশি বলিল, "ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।"

দেবী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তুমি যমের বাড়ী যাও।"

নিশি। আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার উপর যমের অধিকার নাই। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।

দেবী। সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না। এখন বজরা খুলিয়া দিতে বল। চার পাল উঠাও।

তখন সেই জাহাজের মত বজরা চারিখানা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর আপনার নৌকায় আসিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। সাগরের সঙ্গে কথা কহে না। দেখিল, দেবীর বজরা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মত উড়িয়া গেল। তখন ব্রজেশ্বর সাগরকে জিজ্ঞাসা করিল, "বজরা কোথায় গেল?"

সাগর বলিল, "তা দেবী ভিন্ন আর কেহ জানে না। সে সকল কথা দেবী আর কাহাকেও বলে না।"

ব্র। দেবী কে?

সা। দেবী দেবী।

ব্র। তোমার কে হয়?

সা। ভগিনী।

ব্র। কি রকম ভগিনী ?

সা। জ্ঞাতি।

ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। মাঝিদিগকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা বড় বজরার সঙ্গে যাইতে পার ?" মাঝিরা বলিল, "সাধ্য কি ! ও নক্ষত্রের মত ছুটিয়াছে।" ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। সাগর ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, ব্রজেশ্বর বজরা খুলিয়া চলিল।

সূর্য্যোদয় হইলে সাগর আসিয়া ব্রজেশ্বরের কাছে বসিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী কি ডাকাতি করে ?"

সা। তোমার কি বোধ হয় ?

ব্র। ডাকাতির সমান ত সব দেখিলাম—ডাকাতি করিলে করিতে পারে, তাও দেখিলাম। তবু বিশ্বাস হয় না যে, ডাকাতি করে।

সা। তবু কেন বিশ্বাস হয় না ?

ব্র। কে জানে। ডাকাতি না করিলেই বা এত ধন কোথায় পাইল ?

সা। কেহ বলে, দেবী দেবতার বরে এত ধন পাইয়াছে ; কেহ বলে, মাটির ভিতর পোঁতা টাকা পাইয়াছে ; কেহ বলে, দেবী সোনা করিতে জানে।

ব্র। দেবী কি বলে ?

সা। দেবী বলে, এক কড়াও আমার নয়, সব পরের।

ব্র। পরের ধন এত পাইল কোথায় ?

সা। তা কি জানি।

ব্র। পরের ধন হ'লে অত আমিরি করে ? পরে কিছু বলে না ?

সা। দেবী কিছু আমিরি করে না। খুদ খায়, মাটিতে শোয়, গড়া পরে। কাল যা দেখলে, সে সকল তোমার আমার জন্য মাত্র,—কেবল দোকানদারি। তোমার হাতে ও কি ?

সাগর ব্রজেশ্বরের আঙ্গুলে নূতন আঙ্গটি দেখিল।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কাল দেবীর নৌকায় জলযোগ করিয়াছিলাম বলিয়া, দেবী আমাকে এই আঙ্গটি মর্য্যাদা দিয়েছে।"

সা। দেখি।

ব্রজেশ্বর আঙ্গটি খুলিয়া দেখিতে দিল। সাগর হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। বলিল, "ইহাতে দেবী চৌধুরাণীর নাম লেখা আছে।"

ব্র। কই ?

সা। ভিতরে—ফারসীতে।

ব্র। (পড়িয়া) এ কি এ? এ যে আমার নাম—আমার আঙ্গটি? সাগর! তোমাকে আমার দিব্য, যদি তুমি আমার কাছে সত্য কথা না কও। আমায় বল, দেবী কে?

সা! তুমি চিনিতে পার নাই, সে কি আমার দোষ? আমি ত একদণ্ডে চিনিয়াছিলাম।

ব্র। কে! কে! দেবী কে?

সা। প্রফুল্ল।

আর ব্রজেশ্বর কথা কহিল না। সাগর দেখিল, প্রথমে ব্রজেশ্বরের শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল, তারপর একটা অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের চিহ্ন—উচ্ছলিত সুখের তরঙ্গ, শরীরে দেখা দিল। মুখ প্রভাময়, নয়ন উজ্জ্বল অথচ জলপ্লাবিত, দেহ উন্নত, কান্তি স্ফূর্ত্তিময়ী। তারপরই আবার সাগর দেখিল, সব যেন নিবিয়া গেল; বড় ঘোরতর বিষাদ আসিয়া যেন সেই প্রভাময় কান্তি অধিকার করিল। ব্রজেশ্বর বাক্যশূন্য, স্পন্দহীন, নিমেষশূন্য। ক্রমে সাগরের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজেশ্বর চক্ষু মুদিল। দেহ অবসন্ন হইল; ব্রজেশ্বর সাগরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। সাগর কাতর হইয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। কিছুই উত্তর পাইল না; একবার ব্রজেশ্বর বলিল, "প্রফুল্ল ডাকাত! ছি!"

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর ও সাগরকে বিদায় দিয়া, দেবী চৌধুরাণী—হায়! কোথায় গেল দেবী? কই সে বেশভূষা, ঢাকাই শাড়ী, সোনাদানা, হীরা মুক্তা পান্না—সব কোথায় গেল? দেবী সব ছাড়িয়াছে—সব একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে। দেবী কেবল একখানা গড়া পরিয়াছে—হাতে কেবল একগাছা কড়। দেবী নৌকার এক পাশে বজরায় শুধু তক্তার উপর একখানা চট পাতিয়া শয়ন করিল। ঘুমাইল কি না, জানি না।

প্রভাতে বজরা বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া লাগিয়াছে দেখিয়া, দেবী নদীর জলে নামিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই রহিল—সেই চটের মত মোটা শাড়ী। কপাল ও বুক গঙ্গামৃত্তিকায় চর্চ্চিত করিল—রুক্ষ, ভিজা চুল এলাইয়া দিল—তখন দেবীর যে সৌন্দর্য্য বাহির হইল, গত রাত্রির বেশভূষা, জাঁকজমক, হীরা মতি চাঁদনি বা রাণীগিরিতে তাহা দেখা যায় নাই। কাল দেবীকে রত্নাভরণে রাজরাণীর মত দেখাইয়াছিল—আজ গঙ্গামৃত্তিকার সজ্জায় দেবতার মত দেখাইতেছে। যে সুন্দর, সে মাটি ছাড়িয়া হীরা পরে কেন?

দেবী এই অনুপম বেশে একজন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া তীরে তীরে চলিল—বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেক দূর গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি—কথায় কথায় ডাকাইতের কথা বলিতেছি—ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাইতের ত কথাই নাই। পাঠকের স্মরণ থাকে যেন যে, ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্‌কে যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্ব্বে আর কখন তত করিতে হয় নাই। এ সকল অরাজকতার সময়ে ডাকাইতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্ব্বল বা গণ্ডমূর্খ, তাহারাই "ভাল মানুষ" হইত। ডাকাইতিতে তখন কোন নিন্দা বা লজ্জা ছিল না।

দেবী জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াও অনেক দূর গেল। একটা গাছের তলায় পৌঁছিয়া পরিচারিকাকে বলিল, "দিবা, তুই এখানে ব’স্। আমি আসিতেছি। এ বনে বাঘ ভালুক বড় অল্প। আসিলেও তোর ভয় নাই। লোক পাহারায় আছে।" এই বলিয়া দেবী সেখান হইতে আরও গাঢ়তর জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। অতি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটা সুরঙ্গ। পাথরের সিঁড়ি আছে। যেখানে নামিতে হয়, সেখানে অন্ধকার—পাথরের ঘর। পূর্ব্বকালে বোধ হয় দেবালয় ছিল—এক্ষণে কালসহকারে চারি পাশে মাটি পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাতে নামিবার সিঁড়ি গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। দেবী অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিল।

সেই ভূগর্ভস্থ মন্দিরে মিট্‌মিট্ করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তার আলোতে এক শিবলিঙ্গ দেখা গেল। এক ব্রাহ্মণ সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া তাহার পূজা করিতেছিল। দেবী শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণের কিছু দূরে বসিলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণ পূজা সমাপনপূর্ব্বক, আচমন করিয়া দেবীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিল, "মা! কাল রাত্রে—তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি ডাকাইতি করিয়াছ না কি?"

দেবী বলিল, "আপনার কি বিশ্বাস হয়?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "কি জানি?"

ব্রাহ্মণ আর কেহই নহে; আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভবানীঠাকুর।

দেবী বলিল, "কি জানি কি, ঠাকুর? আপনি কি আমায় জানেন না? দশ বৎসর

আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলাম। লোকে জানে, যত ডাকাইতি হয়, সব আমিই করি। তথাপি একদিনের জন্য এ কাজ আমা হইতে হয় নাই—তা আপনি বেশ জানেন। তবু বলিলেন, 'কি জানি' ?"

ভবানী। রাগ কর কেন ? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাইতি করি, তা মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে, একদিনের তরেও ঐ কাজ করিতাম না। তুমিও এ কাজ মন্দ মনে কর না, বোধ হয়—কেন না, তাহা হইলে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরিতেছে। আমি আপনার কথায় এতদিন ভুলিয়াছিলাম—আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় ত মহাপাতক কি ? আপনাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখিব না।

ভবানী। সে কি ? যা এতদিন বুঝাইয়া দিয়াছি, তাই কি আবার তোমায় বুঝাইতে হইবে ? যদি আমি এ সকল ডাকাইতির ধনের এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিতাম, তবে মহাপাতক বটে। কিন্তু তুমি ত জান যে, কেবল পরকে দিবার জন্য ডাকাইতি করি। যে ধার্ম্মিক, যে সৎপথে থাকিয়া ধন উপার্জ্জন করে, যাহার ধনহানি হইলে ভরণপোষণের কষ্ট হইবে, রঙ্গরাজ কি আমি কখন তাহাদের এক পয়সাও লই নাই। যে জুয়াচোর, দাগাবাজ, পরের ধন কাড়িয়া বা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, আমরা তাহাদের উপর ডাকাইতি করি। করিয়া এক পয়সাও লই না, যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল, তাহাকেই ডাকিয়া দিই। এ সকল কি তুমি জান না ? দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায়, কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রাণী করিয়া, রাজশাসন চালাইতেছি। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম্ম ?

দেবী। রাজা রাণী, যাকে করিবেন, সেই হইতে পারিবে। আমাকে অব্যাহতি দিন্—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।

ভবানী। আর কাহাকেও এ রাজ্য সাজে না। আর কাহারও অতুল ঐশ্বর্য্য নাই—তোমার ধনদানে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার যে ধন আছে, সকলই আমি আপনাকে দিতেছি। আমি ঐ টাকা যেরূপে খরচ করিতাম, আপনিও সেইরূপে করিবেন। আমি কাশী গিয়া বাস করিব, মানস করিয়াছি।

ভবানী। কেবল তোমার ধনেই কি সকলে তোমার বশ ? তুমি রূপে যথার্থ রাজরাণী—গুণে যথার্থ রাজরাণী। অনেকে তোমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া জানে—কেন না, তুমি সন্ন্যাসিনী, মার মত পরের মঙ্গল কামনা কর, অকাতরে ধন দান কর,

আমার ভগবতীর মত রূপবতী। তাই আমরা তোমার নামে এ রাজ্য শাসন করি—নহিলে আমাদের কে মানিত?

দেবী। তাই লোকে আমাকে ডাকাইতনী বলিয়া জানে—এ অখ্যাতি মরিলেও যাবে না।

ভবানী। অখ্যাতি কি? এ বরেন্দ্রভূমে আজি কালি কে এমন আছে যে, এ নামে লজ্জিত? কিন্তু সে কথা যাক্—ধর্ম্মাচরণে সুখ্যাতি অখ্যাতি খুঁজিবার দরকার কি? খ্যাতির কামনা করিলেই কর্ম্ম আর নিষ্কাম হইল কৈ? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্মবিসর্জ্জন হইল কৈ?

দেবী। আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না—আপনি মহামহোপাধ্যায়,—আমার স্ত্রীবুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে, তাই বলিতেছি—আমি এ রাণীগিরি হইতে অবসর লইতে চাই। আমার এ ভাল লাগে না।

ভবানী। যদি ভাল লাগে না—তবে কালি রঙ্গরাজকে ডাকাইতি করিতে পাঠাইয়াছিলে কেন? কথা যে আমার অবিদিত নাই, তাহা বলা বেশীর ভাগ।

দেবী। কথা যদি অবিদিত নাই, তবে অবশ্য এটাও জানেন যে, কাল রঙ্গরাজ ডাকাইতি করে নাই—ডাকইতির ভাণ করিয়াছিল মাত্র।

ভবানী। কেন? তা আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দেবী। একটা লোককে ধরিয়া আনিবার জন্য।

ভ। লোকটা কে?

দেবীর মুখে নামটা একটু বাধ বাধ করিল—কিন্তু নাম না করিলেও নয়—ভবানীর সঙ্গে প্রতারণা চলিবে না। অতএব অগত্যা দেবী বলিল, "তার নাম ব্রজেশ্বর রায়।"

ভ। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি। তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

দেবী। কিছু দিবার প্রয়োজন ছিল। তার বাপ ইজারাদারের হাতে কয়েদ যায়। কিছু দিয়া ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিয়াছি।

ভ। ভাল কর নাই। হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড। খামখা আপনার বেহাইনের জাতি মারিয়াছিল—তার জাতি যাওয়াই ভাল ছিল।

দেবী শিহরিল। বলিল, "সে কি রকম?"

ভ। তার একটা পুত্রবধূর কেহ ছিল না, কেবল বিধবা মা ছিল। হরবল্লভ সেই গরীবের বাগ্দী অপবাদ দিয়া বউটাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। দুঃখে বউটার মা মরিয়া গেল।

দে। আর বউটা?

ভ। শুনিয়াছি, খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

দেবী। আমাদের সে সবকথায় কাজ কি? আমরা পরহিত-ব্রত নিয়েছি, যার দুঃখ দেখিব, তারই দুঃখ মোচন করিব।

ভ। ক্ষতি নাই। কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি লোক দারিদ্র্যগ্রস্ত—ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে সর্বস্ব গিয়াছে। এখন কিছু কিছু পাইলেই, তাহারা আহার করিয়া গায়ে বল পায়। গায়ে বল পাইলেই, তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে। শীঘ্র একদিন দরবার করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কর।

দে। তবে প্রচার করুন যে, এইখানেই আগামী সোমবার দরবার হইবে।

ভ। না। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না। ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে, তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচশত সিপাহী লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরবার হইবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে, প্রচার করিয়াছি। সোমবার দিন অবধারিত করিয়াছি। সে জঙ্গলে সিপাহী যাইতে সাহস করিবে না—করিলে মারা পড়িবে। ইচ্ছামত টাকা সঙ্গে লইয়া, আজি বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দে। এবার চলিলাম। কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কি না সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।

এই বলিয়া দেবী উঠিল। আবার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বজরায় গিয়া উঠিল। বজরায় উঠিয়া রঙ্গরাজকে ডাকিয়া চুপি চুপি এই উপদেশ দিল, "আগামী সোমবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে। এই দণ্ডে বজরা খোল—সেইখানেই চল—বরকন্দাজদিগের সংবাদ দাও, দেবীগড় হইয়া যাও—টাকা লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে অধিক টাকা নাই।"

তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে বজরার মাস্তুলের উপর তিন চারিখানা ছোট বড় সাদা পাল বাতাসে ফুলিতে লাগিল; ছিপখানা বজরার সামনে আসিয়া বজরার সঙ্গে বাঁধা হইল। তাহাতে ষাটজন জোয়ান বোটে লইয়া বসিয়া, 'রাণীজি-কি জয়' বলিয়া বাহিতে আরম্ভ করিল—সেই জাহাজের মত বজরা তখন তীরবেগে ছুটিল। এদিকে দেখা গেল, বহুসংখ্যক পথিক বা হাটুরিয়া লোকের মত লোক, নদীতীরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া বজরার সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতেছে। তাহাদের হাতে কেবল এক এক লাঠি মাত্র—কিন্তু বজরার ভিতর বিস্তর ঢাল, সড়কি, বন্দুক আছে। ইহারা দেবীর "বরকন্দাজ" সৈন্য।

সব ঠিক দেখিয়া, দেবী স্বহস্তে আপনার শাকান্ন পাকের জন্য হাঁড়িশালায় গেল। হায়! দেবী!—তোমার এ কিরূপ সন্ন্যাস!

একাদশ পরিচ্ছেদ

সোমবারে প্রাতঃসূর্য্যপ্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রাণীর "দরবার" বা "এজ্‌লাস"। সে এজ্‌লাসে কোন মোকদ্দমা মামলা হইত না। রাজকার্য্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিনশত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাঁহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে—তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজ্‌লাস্। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দনকাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ পাতা—তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশ-ভূষার আজ বিশেষ জাঁক। শাড়ী পরা। শাড়ীখানায় ফুলের মাঝে মাঝে এক একখানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত—কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় এত মতির হার যে, বুকের আর বস্ত্র পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী আজ শরৎকালে প্রকৃত দেবীপ্রতিমা মত সাজিয়াছে। এ সব দেবীর রাণীগিরি। দুই পাশে চারিজন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদণ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবর্‌দার বড় জাঁকের পোষাক করিয়া, বড় বড় রূপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক, বর্‌কন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচশত বর্‌কন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সুসজ্জিত—লাল পাগড়ি, লাল আঙ্গরাখা, লাল ধুতি মালকোচা মারা, পায়ে লাল নাগরা, হাতে ঢাল সড়কি। চারিদিকে লাল নিশান পোঁতা।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একবার "দেবী রাণী কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তারপর দশজন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতি গান করিল। তারপর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক একজন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসনসমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ

ও ব্রাহ্মণ, সেও প্রণাম করিল—কেন না, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেইজন্য কেহ কখনও তাঁর সন্ধান ইংরেজের নিকট বলিত না, অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকাপোরা ঘড়া সব সাজান ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেবী দরিদ্রগণকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া একপ্রহর রাত্রি হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্য্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই। দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।

কিছুদিন মধ্যে রঙ্গপুরে গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেবের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমায়ৎবস্ত হইয়াছে —ডাকাইতের সংখ্যা নাই। ইহাও রটিল যে, অনেক ডাকাইত রাশি রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে—অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহারা দেবীর নিকট দান পাইয়া ঘরে অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির—বলে, টাকা কোথা? ইহার কারণ, ভয় আছে, টাকার কথা শুনিলেই ইজারাদারের পাইক সব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা খরচপত্র করিতে লাগিল—সুতরাং সকল লোকেরই বিশ্বাস হইল যে, দেবী চৌধুরাণী এবার ভারী রকম লুঠিতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাকালে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রজেশ্বর তাঁর পদবন্দনা করিলেন।

হরবল্লভ অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসল সংবাদ কি? টাকার কি হইয়াছে?"

ব্রজেশ্বর বলিলেন যে, "তাঁহার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই।" হরবল্লভের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—হরবল্লভ চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে টাকা পাও নাই?"

"আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আর একস্থানে টাকা পাইয়াছি—"

হরবল্লভ। পেয়েছ? তা আমায় এতক্ষণ বল নাই? দুর্গা, বাঁচলেম্!

ব্র। টাকাটা যেস্থানে পাইয়াছি, তাহাতে সে গ্রহণ করা উচিত কি না, বলা যায় না।

হর। কে দিল?

ব্রজেশ্বর অধোবদনে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তার নামটা মনে আস্‌চে না—সেই যে মেয়ে ডাকাইত একজন আছে ?"

হর। কে, দেবী চৌধুরাণী ?

ব্র। সেই।

হর। তার কাছে টাকা পাইলে কি প্রকারে ?

ব্রজেশ্বরের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে লেখে যে, এখানে বাপের কাছে ভাড়াভাড়িতে দোষ নাই। ব্রজ বলিল, "ও টাকাটা একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে।"

হর। বদ্‌ লোকের টাকা। লেখাপড়া কি রকম হইয়াছে ?

ব্র। একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া লেখাপড়া করিতে হয় নাই।

বাপ আর এ বিষয়ে বেশী খোঁচাখুঁচি করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, এ অভিপ্রায়ে ব্রজেশ্বর তখনই কথাটা চাপা দিয়া বলিল, "পাপের ধন যে গ্রহণ করে, সেও পাপের ভাগী হয়। তাই ও টাকাটা লওয়া আমার তেমন মত নয়।"

হরবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "টাকা নেব না ত ফাটকে যাব না কি ? টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা পুণ্যের টাকা কি ? আর জপতপের টাকাই বা কার কাছে পাব ? সে আপত্তি করে কাজ নাই। কিন্তু আসল আপত্তি এই যে, ডাকাইতের টাকা, তাতে আবার লেখাপড়া করে নাই—ভয় হয়, পাছে দেরী হ'লে বাড়ীঘর লুটপাট করিয়া লইয়া যায়।"

ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

হর। তা টাকার মিয়াদ কতদিন ?

ব্র। আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত।

হর। তা সে হলো ডাকাইত। দেখা দেয় না। কোথা তার দেখা পাওয়া যাবে যে, টাকা পাঠাইয়া দিব ?

ব্র। ঐদিন সন্ধ্যার পর সে সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে বজরায় থাকিবে। সেইখানে টাকা পৌঁছাইলেই হইবে।

হরবল্লভ বলিলেন, "তা সেইদিন সেইখানেই টাকা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।"

ব্রজেশ্বর বিদায় হইলেন। হরবল্লভ তখন মনে মনে বুদ্ধি খাটাইয়া কথাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন। শেষে স্থির করিলেন, "হাঁঃ, সে বেটীর আবার টাকা শোধ দিতে যাবে ! বেটীকে সিপাহী এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। বৈশাখী সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার পর কাপ্তেন সাহেব পল্টন শুদ্ধ তার বজরায় না উঠে—ত আমার নাম হরবল্লভই নয়। তাকে আর আমার কাছে টাকা নিতে হবে না।"

হরবল্লভ এই পুণ্যময় অভিসন্ধিটা আপনার মনে মনেই রাখিলেন—ব্রজেশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন না।

এদিকে সাগর আসিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে গিয়া গল্প করিল যে, ব্রজেশ্বর একটা রাজরাণীর বজরায় গিয়া, তাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে,—সাগর অনেক মানা করিয়াছিল, তাহা শুনে নাই। মাগী জেতে কৈবর্ত্ত—আর তার দুইটা বিবাহ আছে—সুতরাং ব্রজেশ্বরের জাতি গিয়াছে, সুতরাং সাগর আর ব্রজেশ্বরের পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিবে না, ইহা স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ব্রহ্মঠাকুরাণী এ সকল কথা ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করায় ব্রজেশ্বর অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, "রাণীজি জাত্যংশে ভাল—আমার পিতৃঠাকুরের পিসী হয়। আর বিয়ে—তা আমারও তিনটা, তারও তিনটা।"

ব্রহ্মঠাকুরাণী বুঝিল, কথাটা মিথ্যা ; কিন্তু সাগরের মতলব যে, ব্রহ্মঠাকুরাণী এ গল্পটা নয়নতারার কাছে করে। সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না। নয়নতারা একে সাগরকে দেখিয়া জ্বলিয়াছিল, আবার শুনিল যে, স্বামী একটা বুড়া কন্যে বিবাহ করিয়াছে। নয়নতারা একেবারে অগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং কিছুদিন ব্রজেশ্বর নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারিলেন না—সাগরের ইজারা-মহল হইয়া রহিলেন।

সাগরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। কিন্তু নয়নতারা বড় গোল বাধাইল—শেষে গিন্নীর কাছে গিয়া নালিস করিল। গিন্নী বলিলেন, "তুমি বাছা, পাগল মেয়ে। বামনের ছেলে কি কৈবর্ত্ত বিয়ে করে গা ? তোমাকে সবাই ক্ষেপায়, তুমিও ক্ষেপ।"

নয়ান বৌ তবু বুঝিল না। বলিল, "যদি সত্য সত্যই বিয়ে হয়ে থাকে ?" গিন্নী বলিলেন, "যদি সত্যই হয়, তবে বৌ বরণ করে ঘরে তুল্‌ব। বেটার বৌ ত আর ফেল্‌তে পার্‌ব না।"

এই সময়ে ব্রজেশ্বর আসিল, নয়ান বৌ অবশ্য পলাইয়া গেল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি বল্‌ছিলে গা ?"

গিন্নী বলিলেন, "এই বল্‌ছিলাম যে, তুই যদি আবার বিয়ে করিস্‌, তবে আবার বৌ বরণ করে ঘরে তুলি।"

ব্রজেশ্বর অন্যমনা হইল, কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

প্রদোষকালে গিন্নী ঠাকুরাণী কর্ত্তা মহাশয়কে বাতাস করিতে করিতে, ভর্ত্তৃচরণে এই কথা নিবেদন করিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনটা কি ?"

গিন্নী। আমি ভাবি কি যে, সাগর বৌ ঘর করে না। নয়ান বৌ ছেলের যোগ্য বৌ নয়। তা যদি একটি ভাল দেখে ব্রজ বিয়ে করে সংসারধর্ম্ম করে, আমার সুখ হয়।

কর্ত্তা। তা ছেলের যদি সে রকম বোঝ, তা আমায় বলিও। আমি ঘটক ডেকে ভাল দেখে সম্বন্ধ কর্‌ব।

গিন্নী। আচ্ছা, আমি মন বুঝিয়া দেখিব।

মন বুঝিবার ভার ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপর পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরাণী অনেক বিরহ-সন্তপ্ত এবং বিবাহ-প্রয়াসী রাজপুত্রের উপকথা ব্রজকে শুনাইলেন, কিন্তু ব্রজের মন তাহাতে কিছু বোঝা গেল না। তখন ব্রহ্মঠাকুরাণী স্পষ্ট জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। কিছুই খবর পাইলেন না। ব্রজেশ্বর কেবল বলিল, "বাপ মা যে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাই পালন করিব।"

কথাটার আর বড় উচ্চবাচ্য হইল না।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসিল, কিন্তু দেবী রাণীর ঋণ পরিশোধের কোন উদ্যোগ হইল না। হরবল্লভ এক্ষণে অঋণী, মনে করিলে অনায়াসে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেবীর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন, কিন্তু সেদিকে মন দিলেন না। তাঁহাকে এ বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ব্রজেশ্বর দুই চারিবার এ কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু হরবল্লভ তাঁহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। এদিকে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রায়াগতা—দুই চারিদিন আছে মাত্র। তখন ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন! হরবল্লভ বলিলেন, ভাল, ব্যস্ত হইও না। আমি টাকার সন্ধানে চলিলাম। ষষ্ঠীর দিন ফিরিব।" হরবল্লভ শিবিকারোহণে পাচক ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও দুইজন লাঠিয়াল (পাইক) সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

হরবল্লভ টাকার চেষ্টায় গেলেন বটে, কিন্তু সে আর এক রকম। তিনি বরাবর রঙ্গপুর গিয়া কালেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন কালেক্টরই শান্তি-রক্ষক ছিলেন। হরবল্লভ তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে সিপাহী দিউন, আমি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিব। ধরাইয়া দিতে পারিলে আমাকে কি পুরস্কার দিবেন বলুন।"

শুনিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে দেবী চৌধুরাণী দস্যুদিগের নেত্রী। তাহাকে ধরিতে পারিলে আর সকলে ধরা পড়িবে। তিনি দেবীকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন মতে সফল হইতে পারেন নাই। অতএব হরবল্লভ সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে ধরাইয়া দিবে শুনিয়া, সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। হরবল্লভ বলিলেন, "আমার সঙ্গে পাঁচশত সিপাহী পাঠাইতে হুকুম হউক।" সাহেব সিপাহীর হুকুম দিলেন। হরবল্লভকে সঙ্গে করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ব্রেনান্‌ সিপাহী লইয়া দেবীকে ধরিতে চলিলেন।

হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের নিকট সবিশেষ শুনিয়াছিলেন, ঠিক সে ঘাটে দেবীকে পাওয়া যাইবে। সম্ভবতঃ দেবী বজরাতেই থাকিবে। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ব্রেনান্‌ সেইজন্য কতক ফৌজ লইয়া ছিপে চলিলেন। এইরূপ পাঁচখানি ছিপ ভাঁটি দিয়া দেবীর বজরা ঘেরাও করিতে চলিল। এদিকে লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব আর কতক সিপাহী সৈন্য লুক্কায়িতভাবে, বন দিয়া বন দিয়া তটপথে পাঠাইলেন। যেখানে দেবীর বজরা থাকিবে, হরবল্লভ বলিয়া দিল; সেইখানে তীরবর্তী বনমধ্যে ফৌজ তিনি লুকাইয়া রাখিলেন, যদি দেবী ছিপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তটপথে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে এই ফৌজের দ্বারা ঘেরাও করিয়া ধরিবেন। আরও এক পলাইবার পথ ছিল—ছিপগুলি ভাঁটি দিয়া আসিবে, দূর হইতে ছিপ দেখিতে পাইলে দেবী ভাঁটি দিয়া পলাইতে পারে, অতএব লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ব্রেনান্‌ অবশিষ্ট সিপাহীগুলিকে দুই ক্রোশ ভাঁটিতে পাঠাইলেন, তাহাদিগের থাকিবার জন্য এমন একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন যে, সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকার সময়ে সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সিপাহীরা সেখানে তীরে লুকাইয়া থাকিবে, বজরা দেখিলেই জলে আসিয়া তাহা ঘেরাও করিবে।

সন্ন্যাসিনী রমণীকে ধরিবার জন্য এইরূপ ঘোরতর আড়ম্বর হইল। কিন্তু কর্তৃপক্ষেরাও এ আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন মনে করেন নাই। দেবী সন্ন্যাসিনী হউক আর নাই হউক, তাহার আজ্ঞাধীন হাজার যোদ্ধা আছে, সাহেবেরা জানিতেন। এই যোদ্ধাদিগের নাম "বরকন্দাজ"। অনেক সময়ে কোম্পানীর সিপাহীদিগকে এই বরকন্দাজদিগের লাঠির চোটে পলাইতে হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ। হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া

পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালায় আব্রু পর্দ্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই সর্‌দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়। এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে! পীনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে—সমাজ-শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি, লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র! ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর; কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই। শুনিতে পাই, সেকালে তুমি না কি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই, "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং।" এখন মূর্খের ঔষধ "বাপু" "বাছা"—তাহাতেও রোগ ভাল হয় না। তোমার সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনেকেরই গুণ এই দুনিয়াতে জাজ্বল্যমান। ইস্তক্ আড়া বাঁকারি খুঁটি খোঁটা লাগায়েৎ শ্রীনন্দনন্দনের মোহন বংশী, সকলেরই গুণ বুঝি—কিন্তু লাঠি! তোমার মত কেহ না। তুমি আর নাই—গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে; তুমি ইন্দ্রলোকে নন্দনকাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত-বৃক্ষশাখার ঠেক্‌নো হইয়া আছ, দেবকন্যারা তোমার ঘায় কল্পবৃক্ষ হইতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফল সকল পাড়িয়া লইতেছে। এক আধটা ফল যেন পৃথিবীতে গড়াইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার লাঠির ভয়ে এত সিপাহীর সমাগম, তার কাছে একখানি লাঠিও ছিল না। নিকটে একটি লাঠিয়ালও ছিল না। দেবী সেই ঘাটে—যে ঘাটে বজরা বাঁধিয়া ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সেই ঘাটে। সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। সেই বজরা তেমনই সাজান—সব ঠিক সে রকম নয়। সে ছিপখানি সেখানে নাই—তাহাতে যে পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল ছিল, তাহারা নাই। তারপর বজরার উপরেও একটি পুরুষমানুষ নাই—মাঝি মাল্লা, রঙ্গরাজ প্রভৃতি কেহ নাই। কিন্তু বজরার মাস্তুল উঠান—চারিখানা পাল তোলা আছে—বাতাসের অভাবে পাল মাস্তুলে

জড়ান পড়িয়া আছে। বজরার নোঙ্গরও ফেলা নহে, কেবল দু'গাছা কাছিতে তীরে খোঁটায় বাঁধা আছে।

তৃতীয়, দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণভূষিতা মহার্ঘবস্ত্রপরিহিতা নয়, কিন্তু আর একপ্রকার শোভা আছে। ললাট, গণ্ড, বাহু, হৃদয়, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চ্চিত; চন্দনচর্চ্চিত ললাট বেষ্টন করিয়া সুগন্ধি পুষ্পের মালা শিরোদেশের বিশেষ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। হাতে ফুলের বালা। অন্য অলঙ্কার একখানিও নাই। পরণে সেই মোটা শাড়ী।

আর, আজ দেবী একা ছাদের উপর বসিয়া নহে, কাছে আর দুইজন স্ত্রীলোক বসিয়া। একজন নিশি, অপর দিবা। এই তিনজনে যে কথাটা হইতেছিল, তাহার মাঝখান হইতে বলিলেও ক্ষতি নাই।

দিবা বলিতেছিল—দিবা অশিক্ষিতা, ইহা পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত—বলিতেছিল, "হাঁঃ, পরমেশ্বরকে না কি আবার প্রত্যক্ষ দেখা যায়?"

প্রফুল্ল বলিল, "না, প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখার কথা বলিতেছিলাম না—আমি প্রত্যক্ষ করার কথা বলিতেছিলাম। প্রত্যক্ষ ছয় রকম। তুমি যে প্রত্যক্ষ দেখার কথা কহিতেছিলে, সে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ—চক্ষের প্রত্যক্ষ। আমার গলার আওয়াজ তুমি শুনিতে পাইতেছ—আমার গলার আওয়াজ তোমার শ্রবণ প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ কানের প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেছে। আমার হাতের ফুলের গন্ধ তোমার নাকে যাইতেছে কি?"

দিবা। যাইতেছে।

দেবী। ওটা তোমার ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইতেছে। আর আমি যদি তোমার গালে একচড় মারি, তাহা হইলে তুমি আমার হাতকে প্রত্যক্ষ করিবে—সেটা ত্বাচ প্রত্যক্ষ। আর এখনি নিশি যদি তোমার মাথা খায়, তাহা হইলে, তোমার মগজটা তার রাসন প্রত্যক্ষ হইবে।

দিবা। মন্দ প্রত্যক্ষ হইবে না। কিন্তু পরমেশ্বরকে দেখাও যায় না, শোনাও যায় না, শোঁকাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না, খাওয়াও যায় না। তাঁকে প্রত্যক্ষ করিব কি প্রকারে?

নিশি। এ ত গেল পাঁচরকম প্রত্যক্ষ। ছয়রকম প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছি; কেন না, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ ছাড়া আর একটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, জান না?

দিবা। কি, দাঁত?

নিশি। দূর হ পোড়ারমুখী! ইচ্ছা করে, কিল মেরে তোর সে ইন্দ্রিয়ের পাটিকে পাটি ভেঙ্গে দিই।

দেবী। (হাসিতে হাসিতে) চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয়াধিপতি মনঃ উভয়েন্দ্রিয় অর্থাৎ মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বটে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে। মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া মনের দ্বারাও প্রত্যক্ষ আছে। ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।

নিশি। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—প্রমাণাভাবাৎ।"

যিনি সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ও ভাষ্য পড়িয়াছেন, তিনি নিশির এই ব্যঙ্গোক্তির মর্ম্ম বুঝিবেন। নিশি প্রফুল্লের একপ্রকার সহাধ্যায়িনী ছিল।

প্রফুল্ল উত্তর করিল, "সূত্রকারস্যোভয়েন্দ্রিয়শূন্যত্বাৎ—ন তু প্রমাণাভাবাৎ।"

দিবা। রেখে দাও তোমার হাবাৎ মাবাৎ—আমি ত পরমেশ্বরকে কখন মনের ভিতর দেখিতে পাই নাই।

প্রফুল্ল। আবার দেখা? চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই দেখা—অন্য কোন প্রত্যক্ষ দেখা নয়,—মানস প্রত্যক্ষও দেখা নয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়—রূপ, বহির্ব্বিষয়; মানস প্রত্যক্ষের বিষয়—অন্তর্ব্বিষয়। মনের দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইতে পারেন। ঈশ্বরকে দেখা যায় না।

দিবা। কই? আমি ত ঈশ্বরকে কখনও মনের ভিতর কোন রকমপ্রত্যক্ষ করিনাই?

প্রফুল্ল। মানুষের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষশক্তি অল্প—সাহায্য বা অবলম্বন ব্যতীত সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

দিবা। প্রত্যক্ষের জন্য আবার সাহায্য কি রকম? দেখ, এই নদী, জল, গাছ, পালা, নক্ষত্র, সকলই আমি বিনা সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি।

"সকলই নয়। ইহার একটি উদাহরণ দিব।" বলিয়া প্রফুল্ল হাসিল।

হাসির রকমটা দেখিয়া নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, "ইংরেজের সিপাহী আমাকে আজ ধরিতে আসিতেছে জান?"

দিবা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা ত জানি।"

প্রফুল্ল। সিপাহী প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

দিবা। না। কিন্তু আসিলে প্রত্যক্ষ করিব।

প্র। আমি বলিতেছি, আসিয়াছে, কিন্তু বিনা সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছ না। এই সাহায্য গ্রহণ কর।

এই বলিয়া প্রফুল্ল দিবার হাতে দূরবীক্ষণ দিল। ঠিক্ যে দিকে দেখিতে হইবে, দেখাইয়া দিল। দিবা দেখিল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলে ?"

দিবা। একখানা ছিপ। উহাতে অনেক মানুষ দেখিতেছি বটে।

দেবী। উহাতে সিপাহী আছে। আর একখানা দেখ।

এরূপে দেবী দিবাকে পাঁচখানা ছিপ নানাস্থানে দেখাইল। নিশিও দেখিল। নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "ছিপগুলি চরে লাগাইয়া আছে, দেখিতেছি। আমাদের ধরিতে আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের কাছে না আসিয়া ছিপ তীরে লাগাইয়া আছে কেন ?"

দেবী। বোধ হয়, ডাঙ্গা-পথে যে সকল সিপাহী আসিবে, তাহারা আসিয়া পৌঁছে নাই। ছিপের সিপাহী তাহাদের অপেক্ষায় আছে। ডাঙ্গার সিপাহী আসিবার আগে, ছিপের সিপাহী আগু হইলে, আমি ডাঙ্গা-পথে পলাইতে পারি, এই শঙ্কায় উহারা আগু হইতেছে না।

দিবা। কিন্তু আমরা ত উহাদের দেখিতে পাইতেছি; মনে করিলেই ত পলাইতে পারি।

দেবী। ওরা তা জানে না। ওরা জানে না যে, আমরা দূরবীণ রাখি।

নিশি। ভগিনি! প্রাণে বাঁচিলে একদিন না একদিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক। আজ ডাঙ্গায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিবে চল। এখনও যদি ডাঙ্গায় সিপাহী আসে নাই, তবে ডাঙ্গা-পথে এখন প্রাণরক্ষার উপায় আছে।

দেবী। যদি প্রাণের জন্য আমি এত কাতর হইব, তবে আমি সকল সংবাদ জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলাম কেন? আসিলাম যদি, তবে লোকজন সবাইকে বিদায় দিলাম কেন? আমার হাজার বরকন্দাজ আছে—তাহাদের সকলকে অন্য স্থানে পাঠাইলাম কেন?

দিবা। আমরা আগে যদি জানিতাম, তাহা হইলে তোমায় এমন কর্ম্ম করিতে দিতাম না।

দেবী। তোমার সাধ্য কি, দিবা! যা আমি স্থির করিয়াছি, তা অবশ্য করিব। আমি স্বামিদর্শন করিব, স্বামীর অনুমতি লইয়া, জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিব। তোমরা আমার কথা শুনিও, দিবা নিশি! আমার স্বামী যখন ফিরিয়া যাইবেন, তখন তাঁহার নৌকায় উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইও। আমি একা ধরা দিব, আমি একা ফাঁসি যাব। সেইজন্যই বজরা হইতে আর সকলকে বিদায়

দিয়াছি। তোমরা তখন গেলে না। কিন্তু আমায় এই ভিক্ষা দাও—আমার স্বামীর নৌকায় উঠিয়া পলায়ন করিও।

নিশি। ধড়ে প্রাণ থাকিতে তোমায় ছাড়িব না। মরিতে হয়, একত্র মরিব।

প্র। ও সকল কথা এখন থাক্—যাহা বলিতেছিলাম, তা বলিয়া শেষ করি। যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিলে না, তা যেমন দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিলে, তেমন ঈশ্বরকে মানস প্রত্যক্ষ করিতে দূরবীণ চাই।

দিবা। মনের আবার দূরবীণ কি?

প্র। যোগ।

দিবা। কি—সেই ন্যাস, প্রাণায়াম, কুম্ভক, বুজরুকী, ভেল্কী—

প্র। তাকে আমি যোগ বলি না। যোগ অভ্যাসমাত্র। কিন্তু সকল অভ্যাসই যোগ নয়। তুমি যদি দুধ ঘি খাইতে অভ্যাস কর, তাকে যোগ বলিব না। তিনটি অভ্যাসকেই যোগ বলি।

দিবা। কি কি তিনটি?

প্র। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ।

ততক্ষণ নিশি দূরবীণ লইয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বলিল, “সম্প্রতি উপস্থিত গোলযোগ।”

প্র। সে আবার কি? আবার গোলযোগ কি?

নিশি। একখানা পান্সী আসিতেছে। বুঝি ইংরাজের চর।

প্রফুল্ল নিশির হাত হইতে দূরবীণ লইয়া পান্সী দেখিল। বলিল, “এই আমার সুযোগ। তিনিই আসিতেছেন। তোমরা নীচে যাও।”

দিবা ও নিশি ছাদ হইতে নামিয়া কামরার ভিতর গেল। পান্সী ক্রমে বাহিয়া আসিয়া বজরার গায়ে লাগিল। সেই পান্সীতে—ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর, লাফাইয়া বজরায় উঠিয়া, পান্সী তফাতে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। পান্সীওয়ালা তাহাই করিল।

ব্রজেশ্বর নিকটে আসিলে, প্রফুল্ল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনতমস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে উভয়ে বসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, “আজ টাকা আনিতে পারি নাই, তুই চারিদিনে দিতে পারিব বোধ হয়। তুই চারিদিনের পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, সেটা জানা চাই।”

ও ছি! ছি! ব্রজেশ্বর! দশ বছরের পর প্রফুল্লের সঙ্গে এই কি কথা!

দেবী উত্তর করিল, “আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না—” বলিতে বলিতে

দেবীর গলাটা বুজিয়া আসিল—দেবী একবার চোখ মুছিল—"আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু আমার ঋণ শুধিবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হইবে, ঐ টাকা গরীব দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন—তাহা হইলে আমি পাইব।"

ব্রজেশ্বর দেবীর হাত ধরিল! বলিল, "প্রফুল্ল! তোমার টাকা—"

ছাই টাকা! কথা শেষ হইল না—মুখের কথা মুখে রহিল। যেমন ব্রজেশ্বর "প্রফুল্ল" বলিয়া ডাকিয়া হাত ধরিয়াছে, অমনি প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া, চোখের জলের স্রোত ছুটিল। ব্রজেশ্বরের ছাই টাকার কথা সে স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল। তেজস্বিনী দেবী রাণী ছেলেমানুষের মত বড় কান্নাটা কাঁদিল। ব্রজেশ্বর ততক্ষণ বড় বিপন্ন হইলেন। তাঁর মনে মনে বোধ আছে যে, এ পাপীয়সী ডাকাইতি করিয়া খায়, এর জন্য এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলা হবে না। কিন্তু চোখের জল, অত বিধি ব্যবস্থা অবগত নয়, তারা অনাহূত আসায় ব্রজেশ্বরের চোখ ভরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর মনে করিলেন, হাত উঠাইয়া চোখ মুছিলেই ধরা পড়িব। কাজেই চোখ মোছা হইল না। চোখ যখন মোছা হইল না, তখন পুকুর ছাপাইল—গাল বাহিয়া ধারা চলিল—প্রফুল্লের হাতে পড়িল।

তখন বালির বাঁধটা ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রজেশ্বর মনে করিয়া আসিয়াছিলেন যে, প্রফুল্লকে ডাকাইতি করার জন্য ভারী রকম তিরস্কার করিবেন, পাপীয়সী বলিবেন—আরও দুই চারিটা লম্বা চৌড়া কথা বলিয়া আবার একবার জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু কেঁদে যার হাত ভিজিয়ে দিলেন, তার উপর কি আর লম্বা চৌড়া কথা হয়?

তখন চক্ষু মুছিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "দেখ প্রফুল্ল, তোমার টাকা আমার টাকা—তার পরিশোধের জন্য আমি কেন কাতর হব? কিন্তু আমি বড় কাতরই হইয়াছি। আমি আজ দশ বৎসর কেবল তোমাকেই ভাবিয়াছি। আমার আর দুই স্ত্রী আছে—আমি তাহাদিগকে এ দশ বৎসর স্ত্রী মনে করি নাই; তোমাকেই স্ত্রী জানি। কেন, তা বুঝি তোমায় আমি বুঝাইতে পারিব না। শুনিয়াছিলাম তুমি নাই। কিন্তু আমার পক্ষে তুমি ছিলে। আমি তার পরও মনে জানিতাম, তুমিই আমার স্ত্রী—মনে আর কাহারও স্থান ছিল না। বল্‌ব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বলাতেও ক্ষতি নাই—তুমি মরিয়াছ শুনিয়া, আমিও মরিতে বসিয়াছিলাম। এখন মনে হয়, মরিলেই ভাল হইত; তুমি মরিলে ভাল হইত—না মরিয়াছিলে ত আমি মরিলেই ভাল হইত। এখন যাহা শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি, তা শুনিতে হইত না, বুঝিতে হইত না। আজ দশ বৎসরের হারান ধন তোমায় পাইয়াছি, আমার স্বর্গসুখের অপেক্ষা

অধিক সুখ হইত। তা না হয়ে প্রফুল্ল, আজ তোমায় পাইয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা।” তার পর একবার থামিয়া একটু ঢোক গিলিয়া, মাথা টিপিয়া ধরিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, “মনের মন্দিরের ভিতর সোনার প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছিলাম—আমার সেই প্রফুল্ল—মুখে আসে না—সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি!”

প্রফুল্ল বলিল, “কি? ডাকাইতি করি?”

ব্র। কর না কি?

ইহার উত্তরে প্রফুল্ল একটা কথা বলিতে পারিত। যখন ব্রজেশ্বরের পিতা প্রফুল্লকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তখন প্রফুল্ল কাতর হইয়া, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “আমি অন্নের কাঙ্গাল, তোমরা তাড়াইয়া দিলে—আমি কি করিয়া খাইব?” তাহাতে শ্বশুর উত্তর দিয়াছিলেন, “চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইও।” প্রফুল্ল মেধাবিনী—সে কথা ভুলে নাই। ভুলিবার কথাও নহে। আজ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ডাকাইত বলিয়া, এই ভর্ৎসনা করিল; আজ প্রফুল্লের সেই উত্তর ছিল। প্রফুল্লের এই উত্তর ছিল, “আমি ডাকাইত বটে—তা এখন এত ভর্ৎসনা কেন? তোমরাই ত চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইতে বলিয়াছিলে। আমি গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিতেছি।” এ উত্তর সম্বরণ করাই যথার্থ পুণ্য। প্রফুল্ল সে পুণ্য সঞ্চয় করিল,—সে কথা মুখেও আনিল না। প্রফুল্ল স্বামীর কাছে হাত যোড় করিয়া এই উত্তর দিল। বলিল, “আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখন ডাকাইতি করি নাই। কখন ডাকাইতির এক কড়া লই নাই। তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমরা দেবতা। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি—আমি ডাকাইত নই। তবে জানি, লোকে আমাকে ডাকাইত বলে। কেন বলে, তাও জানি। সেই কথা তোমাকে আমার কাছে শুনিতে হইবে। সেই কথা শুনাইব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। আজ না শুনিলে, আর শুনা হইবে না। শোন, আমি বলি।”

তখন যেদিন প্রফুল্ল শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আপনার কাহিনী সকলই অকপটে বলিল। শুনিয়া ব্রজেশ্বর বিস্মিত, লজ্জিত, অতিশয় আহ্লাদিত, আর মহামহিমময়ী স্ত্রীর সমীপে কিছু ভীত হইলেন। প্রফুল্ল সমাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আমার এ কথাগুলিতে বিশ্বাস করিলে কি?”

অবিশ্বাসের জায়গা ছিল না—প্রফুল্লের প্রতি কথা ব্রজেশ্বরের হাড়ে হাড়ে বসিয়াছিল। ব্রজেশ্বর উত্তর করিতে পারিল না—কিন্তু তাহার আনন্দপূর্ণ কান্তি দেখিয়া,

প্রফুল্ল বুঝিল, বিশ্বাস হইয়াছে। তখন প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, "এখন পায়ের ধূলা দিয়া এ জন্মের মত আমায় বিদায় দাও। আর এখানে বিলম্ব করিও না—সম্মুখে কোন বিঘ্ন আছে। তোমায় এই দশ বৎসরের পর পাইয়া এখনই উপযাচিকা হইয়া বিদায় দিতেছি ; ইহাতেই বুঝিবে যে, বিঘ্ন বড় সামান্য নহে। আমার দুইটি সখী এই নৌকায় আছে। তাহারা বড় গুণবতী, আমিও তাহাদের বড় ভালবাসি। তোমার নৌকায় তাহাদের লইয়া যাও। বাড়ী পৌঁছিয়া, তারা যেখানে যাইতে চায়, সেইখানে পাঠাইয়া দিও। আমায় যেমন মনে রাখিয়াছিলে, তেমনি মনে রাখিও। সাগর যেন আমায় না ভুলে।"

ব্রজেশ্বর ক্ষণেক কাল নীরবে ভাবিল। পরে বলিল, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রফুল্ল! আমায় বুঝাইয়া দাও। তোমার এত লোক—কেহ নাই! বজরার মাঝিরা পর্য্যন্ত নাই! কেবল দুইটি স্ত্রীলোক আছে, তাহাদেরও বিদায় করিতে চাহিতেছ। সম্মুখে বিঘ্ন বলিতেছ—আমাকে থাকিতে নিষেধ করিতেছ। আর এ জন্মে সাক্ষাৎ হইবে না বলিতেছ। এ সব কি? সম্মুখে কি বিঘ্ন আমাকে না বলিলে, আমি যাইব না। বিঘ্ন কি, শুনিলেও যাইব কি না, তাও বলিতে পারি না।"

প্রফুল্ল। সে সব কথা তোমার শুনিবার নয়।

ব্র। তবে আমি কি তোমার কেহ নই?

এমন সময় দুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল—ব্রজেশ্বরের মুখের কথা মুখে রহিল, দুই জনে চমকিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, দূরে পাঁচখানা ছিপ আসিতেছে, বটিয়ার তাড়নে জল চাঁদের আলোয় জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে দেখা গেল, পাঁচখানা ছিপ সিপাহী-ভরা। ডাঙ্গা-পথের সিপাহীরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তারই সঙ্কেত বন্দুকের শব্দ। শুনিয়াই পাঁচখানা ছিপ খুলিয়াছিল। দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল, "আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না। শীঘ্র আপনার পান্সীতে উঠিয়া চলিয়া যাও।"

ব্র। কেন? এ ছিপগুলো কিসের? বন্দুক কিসের?

প্র। না শুনিলে যাইবে না?

ব্র। কোন মতেই না।

প্র। এ ছিপে কোম্পানির সিপাহী আছে। এ বন্দুক ডাঙ্গা হইতে কোম্পানির সিপাহী আওয়াজ করিল।

ব্র। কেন এত সিপাহী এদিকে আসিতেছে? তোমাকে ধরিবার জন্য?

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তুমি পূর্ব হইতে এই সংবাদ জানিতে।"

প্র। জানিতাম—আমার চর সর্ব্বত্র আছে।

ব্র। এ ঘাটে আসিয়া জানিয়াছ, না আগে জানিয়াছ?

প্র। আগে জানিয়াছিলাম।

ব্র। তবে জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলে কেন?

প্র। তোমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া।

ব্র। তোমার লোকজন কোথায়?

প্র। বিদায় দিয়াছি। তারা কেন আমার জন্য মরিবে?

ব্র। নিশ্চিত ধরা দিবে, স্থির করিয়াছ?

প্র। আর বাঁচিয়া কি হইবে? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম, তুমি আমায় ভালবাস, তাহা শুনিলাম। আমার যে কিছু ধন ছিল, তাহাও বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। আর এখন বাঁচিয়া কোন্ কাজ কবিব বা কোন্ সাধ মিটাইব? আর বাঁচিব কেন?

ব্র। বাঁচিয়া, আমার ঘরে গিয়া, আমার ঘর করিবে।

প্র। সত্য বলিতেছ?

ব্র। তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব।

প্র। আমার শ্বশুর কি বলিবেন?

ব্র। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করিব।

প্র। হায়! এ কথা কাল শুনি নাই কেন?

ব্র। কাল শুনিলে কি হইত?

প্র। তাহা হইলে কার সাধ্য আজ আমায় ধরে?

ব্র। এখন?

প্র। এখন আর উপায় নাই। তোমার পাল্কী ডাক—নিশি ও দিবাকে লইয়া শীঘ্র যাও।

ব্রজেশ্বর আপনার পাল্কী ডাকিল। পাল্কীওয়ালা নিকটে আসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, "তোরা শীঘ্র পালা, ঐ কোম্পানির সিপাহীর ছিপ আসিতেছে; তোদের দেখিলে উহারা বেগার ধরিবে। শীঘ্র পালা, আমি যাইব না, এইখানে থাকিব।"

পাল্কীর মাঝি মহাশয়, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ পাল্কী খুলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বর চেনা লোক, টাকার ভাবনা নাই।

পাল্কী চলিয়া গেল দেখিয়া, প্রফুল্ল বলিল, "তুমি গেলে না?"

ব্র। কেন, তুমি মরিতে জান, আমি জানি না? তুমি আমার স্ত্রী—আমি তোমায় শত বার ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার স্বামী—বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি রক্ষা করিতে পারিব না—তাই বলিয়া কি বিপদ্‌-কালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?

"তবে কাজেই আমি স্বীকার করিলাম, প্রাণরক্ষার যদি কোন উপায় হয়, তা আমি করিব।" এই বলিতে বলিতে প্রফুল্ল আকাশপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে যেন কিছু ভরসা হইল। আবার তখনই নির্ভরসা হইয়া বলিল, "কিন্তু আমার প্রাণরক্ষায় আর এক অমঙ্গল আছে।"

ব্র। কি?

প্র। এ কথা তোমায় বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর না বলিলে নয়। এই সিপাহীদের সঙ্গে আমার শ্বশুর আছেন। আমি ধরা না পড়িলে তাঁর বিপদ ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

ব্রজেশ্বর শিহরিল—মাথায় করাঘাত করিল। বলিল, "তিনিই কি গোইন্দা?"

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বরের বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। এখানে আজিকার রাত্রে যে দেবী চৌধুরাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, এ কথা হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর আর কাহারও কাছে এ কথা বলেন নাই; দেবীরও যে গূঢ় মন্ত্রণা, আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ দেবী এ ঘাটে আসিবার আগে কোম্পানির সিপাহী রঙ্গপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; নহিলে ইহারই মধ্যে পৌঁছিত না আর ইতিপূর্ব্বেই হরবল্লভ কোথায় যাইতেছেন, কাহারও কাছে প্রকাশ না করিয়া দূরযাত্রা করিয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। কথাটা বুঝিতে দেরী হইল না। তাই হরবল্লভ টাকা পরিশোধের কোন উদ্যোগ করেন নাই। তথাপি ব্রজেশ্বর ভুলিলেন না যে,

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিলেন, "আমি মরি কোন ক্ষতি নাই। তুমি মরিলে, আমার মরার অধিক হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

প্র। সে জন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না, অতএব তাঁর কোন ভয় নাই তিনি তোমায় রক্ষা করিলে করিতে পারিবেন, তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে, আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিব না। তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।

এই কথা দেবী আন্তরিক বলিয়াছিল। হরবল্লব প্রফুল্লের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; হরবল্লভ এখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত। তবু দেবী তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কেন না প্রফুল্ল নিষ্কাম। যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।

কিন্তু এ সময়ে তীরবর্ত্তী অরণ্যমধ্য হইতে গভীর তূর্য্যধ্বনি হইল। দুইজনেই চমকিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবী ডাকিল, "নিশি!"

নিশি ছাদের উপর আসিল।

দেবী। কার ভেরী ঐ?

নিশি। যেন দাড়ি বাবাজীর বলিয়া বোধ হয়।

দেবী। রঙ্গরাজের?

নিশি। সেই রকম।

দেবী। সে কি? আমি রঙ্গরাজকে প্রাতে দেবীগড় পাঠাইয়াছি।

নিশি। বোধ হয়, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দেবী। রঙ্গরাজকে ডাক।

ব্রজেশ্বর বলিল, "ভেরীর আওয়াজ অনেক দূর হইতে হইয়াছে। এখান হইতে ডাকিলে ডাক শুনিতে পাইবে না। আমি নামিয়া গিয়া ভেরীওয়ালাকে খুঁজিয়া আনিতেছি।"

দেবী বলিল, "কিছু করিতে হইবে না। তুমি একটু নীচে গিয়া নিশির কৌশল দেখ।"

নিশি ও ব্রজ নীচে আসিল। নিশি নীচে গিয়া, এক বাঁশী বাহির করিল। নিশি গীত বাদ্যে বড় পটু, সে শিক্ষাটা রাজবাড়ীতে হইয়াছিল। নিশিই দেবীর বীণার ওস্তাদ। নিশি বাঁশীতে ফুঁ দিয়া মল্লারে তান মারিল। অনতিবিলম্বে রঙ্গরাজ বজরায় আসিয়া উঠিয়া, দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিল।

এই সময়ে ব্রজেশ্বর নিশিকে বলিল, "তুমি ছাদে যাও। তোমার কাছে কেহ বোধ হয়, কথা লুকাইবে না। কি কথা হয়, শুনিয়া আসিয়া আমাকে সব বলিও।"

নিশি স্বীকৃত হইয়া, কামরার বাহির হইল—বাহির হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "আপনি একটু বাহিরে আসিয়া দেখুন।"

ব্রজেশ্বর মুখ বাড়াইয়া দেখিল। দেখিতে পাইল, জঙ্গলের ভিতর হইতে অগণিত মনুষ্য বাহির হইতেছে। নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "উহারা কারা। সিপাই?"

নিশি বলিল, "বোধ হয় উহারা বর্‌কন্দাজ। রঙ্গরাজ আনিয়া থাকিবে।"

দেবীও সেই মনুষ্যশ্রেণী দেখিতেছিল, এমন সময়ে রঙ্গরাজ আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেন, রঙ্গরাজ?"

রঙ্গরাজ প্রথমে কোন উত্তর করিল না। দেবী পুনরপি বলিল, "আমি সকালে তোমাকে দেবীগড় পাঠাইয়াছিলাম। সেখানে যাও নাই কেন? আমার কথা অমান্য করিয়াছ কেন?"

রঙ্গ। আমি দেবীগড় যাইতেছিলাম—পথে ঠাকুরজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

দেবী। ভবানীঠাকুর?

রঙ্গ। তাঁর কাছে শুনিলাম, কোম্পানির সিপাহী আপনাকে ধরিতে আসিতেছে। তাই আমরা দুইজনে বর্‌কন্দাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছি। বর্‌কন্দাজ জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া আমি তীরে বসিয়াছিলাম। ছিপ আসিতেছে দেখিয়া আমি ভেরী বাজাইয়া সঙ্কেত করিয়াছি।

দেবী। ও জঙ্গলেও সিপাহী আছে?

রঙ্গ। তাহাদের আমরা ঘেরিয়া ফেলিয়াছি।

দেবী। ঠাকুরজি কোথায়?

রঙ্গ। ঐ বর্‌কন্দাজ লইয়া বাহির হইতেছেন।

দেবী। তোমরা কত বর্‌কন্দাজ আনিয়াছ?

রঙ্গ। প্রায় হাজার হইবে।

দেবী। সিপাহী কত?

রঙ্গ। শুনিয়াছি পাঁচ শ।

দেবী। এই পনের শ লোকের লড়াই হইলে, মরিবে কত?

রঙ্গ। তা দুই চারি শ মরিলেও মরিতে পারে।

দেবী। ঠাকুরজিকে গিয়া বল—তুমিও শোন যে, তোমাদের এই আচরণে আমি আজ মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া পাইলাম।

রঙ্গ। কেন, মা?

দেবী। একটা মেয়েমানুষের প্রাণের জন্য এত লোক তোমরা মারিবার বাসনা করিয়াছ—তোমাদের কি কিছু ধর্ম্মজ্ঞান নাই? আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, আমি একা মরিব—আমার জন্য চারি শ লোক কেন মরিবে? আমায় কি তোমরা এমন অপদার্থ ভাবিয়াছ যে, আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব।

রঙ্গ। আপনি বাঁচিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইবে!

দেবী রাগে, ঘৃণায়, অধীর হইয়া বলিল, "ছি"। সেই ধিক্কারে রঙ্গরাজ অধোবদন হইল—মনে করিল, "পৃথিবী দ্বিধা হউক, আমি প্রবেশ করি।"

দেবী তখন বিস্ফারিত নয়নে ঘৃণাস্ফুরিত কম্পিতাধরে বলিতে লাগিল, "শোন রঙ্গরাজ। ঠাকুরজিকে গিয়া বল, এই মুহূর্ত্তে বরকন্দাজ সকল ফিরাইয়া লইয়া যাউন। তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইলে, আমি এই জলে ঝাঁপ দিয়া মরিব, তোমরা কেহ রাখিতে পারিবে না।"

রঙ্গরাজ এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, "আমি চলিলাম। ঠাকুরজিকে এই সকল কথা জানাইব। তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহা করিবেন। আমি উভয়েরই আজ্ঞাকারী।"

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। নিশি ছাদে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছিল। রঙ্গরাজ গেলে সে দেবীকে বলি, "ভাল, তোমার প্রাণ লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কাহারও নিষেধ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী—তাঁর জন্যেও ভাবিলে না?"

দেবী। ভাবিয়াছি ভগিনি! ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। জগদীশ্বর মাত্র ভরসা। যাহা হইবার, হইবে। কিন্তু যাই হউক নিশি—এক কথা সার। আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?

নিশি মনে মনে দেবীকে ধন্য ধন্য বলিল। ভাবিল, "এই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়াছিল। ইহার সঙ্গে মরিয়াও সুখ।"

নিশি গিয়া, সকল কথা ব্রজেশ্বরকে শুনাইল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে আর আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারিল না; মনে মনে বলিল, "যথার্থ দেবীই বটে। আমি নরাধম! আমি আবার ইহাকে ডাকাইত বলিয়া ভৎ‌র্সনা করিতে গিয়াছিলাম।"

এদিকে পাঁচ দিক্ হইতে পাঁচখানা ছিপ আসিয়া বজরার অতি নিকটবর্ত্তী হইল। প্রফুল্ল সেদিকে দৃক্‌পাতও করিল না, প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ শরীরে ছাদের উপরে বসিয়া রহিল। প্রফুল্ল ছিপ দেখিতে ছিল না—বরকন্দাজ দেখিতেছিল না। দূর

আকাশ প্রান্তে তাহার দৃষ্টি। আকাশপ্রান্তে একখানা ছোট মেঘ অনেকক্ষণ হইতে দেখা দিয়াছিল। প্রফুল্ল তাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন সেখানা একটু বাড়িল ; তখন "জয় জগদীশ্বর !" বলিয়া প্রফুল্ল ছাদ হইতে নামিল।

প্রফুল্লকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া, নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবে ?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার স্বামীকে বাঁচাইব।"

নিশি। আর তুমি ?

দেবী। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আমি যাহা বলি, যাহা করি, এখন তাহাতে বড় সাবধানে মনোযোগ দাও। তোমার আমার অদৃষ্টে যাই হোক, আমার স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে, দিবাকে বাঁচাইতে হইবে, শ্বশুরকে বাঁচাইতে হইবে।

এই বলিয়া দেবী একটা শাঁক লইয়া ফু দিল। নিশি বলিল, "তবু ভাল।"

দেবী বলিল, "ভাল কি মন্দ বিবেচনা করিয়া দেখ। যাহা যাহা করিতে হইবে, তোমাকে বলিয়া দিতেছি। তোমার উপর সব নির্ভর।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিপীলিকা শ্রেণীবৎ বরকন্দাজের দল ত্রিস্রোতার তীর-বন সকল হইতে বাহির হইতে লাগিল। মাথায় লাল পাগড়ী, মাল কোঁচামারা, খালি পা—জলে লড়াই করিতে হইবে বলিয়া কেহ জুতা আনে নাই। সবার হাতে ঢাল সড়কি—কাহারও কাহারও বন্দুক আছে—কিন্তু বন্দুকের ভাগ অল্প। সকলেরই পিঠে লাঠি বাঁধা—এই বাঙ্গালার জাতীয় হাতিয়ার। বাঙ্গালী ইহার প্রকৃত ব্যবহার জানিত ; লাঠি ছাড়িয়াই বাঙ্গালী নির্জীব হইয়াছে।

বরকন্দাজেরা দেখিল, ছিপগুলি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে—বজরা ঘেরিবে ! বরকন্দাজ দৌড়াইল—"রাণীজি-কি জয়" বলিয়া, তাহারাও বজরা ঘেরিতে চলিল। তাহারা বজরার মাঝি মাল্লা—নৌকার কাজ করে, আবশ্যকমত লাঠি সড়কিও চালায় ! তাহারা আপাততঃ লড়ায়ে প্রবৃত্ত হইবার কোন ইচ্ছা দেখাইল না। দাঁড়ে হালে, পালের রসি ধরিয়া, লগি ধরিয়া, যাহার যেস্থান, সেইখানে বসিল। আরও অনেক বরকন্দাজ বজরায় উঠিল। তিন চারি শ বরকন্দাজ তীরে রহিল—সেইখান হইতে ছিপের উপর সড়কি চালাইতে লাগিল। কতক সিপাহী ছিপ হইতে নামিয়া, বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। যে বরকন্দাজেরা বজরা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অবশিষ্ট সিপাহীরা তাহাদের উপর পড়িল। সর্ব্বত্র হাতাহাতি লড়াই হইতে লাগিল। তখন মারামারি কাটাকাটি, চেঁচাচেঁচি, বন্দুকের হুড়মুড়, লাঠির

ঠক্‌ঠকি, ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল ; কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না—কেহ কোন স্থানে স্থির হইতে পারে না।

দূর হইতে লড়াই হইলে সিপাহীর কাছে লাঠিয়ালেরা অধিকক্ষণ টিকিত না—কেন না, দূরে লাঠি চলে না। কিন্তু ছিপের উপর থাকিতে হওয়ায় সিপাহীদের বড় অসুবিধা হইল। যাহারা তীরে উঠিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সে সিপাহীরা লাঠিয়ালদিগকে সঙ্গীনের মুখে হটাইতে লাগিল, কিন্তু যাহারা জলে লড়াই করিতেছিল, তাহারা বরকন্দাজদিগের লাঠি সড়কিতে হাত পা মাথা ভাঙ্গিয়া কাবু হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল নীচে আসিবার অল্পমাত্র পরেই এই ব্যাপার আরম্ভ হইল। প্রফুল্ল মনে করিল, "হয় ভবানীঠাকুরের কাছে আমার কথা পৌঁছে নাই—নয় তিনি আমার কথা রাখিলেন না ; মনে করিয়াছেন, আমি মরিতে পারিব না। ভাল, আমার কাজটাই তিনি দেখুন।"

দেবীর রাণীগিরিতে গুটিকতক চমৎকার গুণ জন্মিয়াছিল। তার একটি এই যে, যে সামগ্রীর কোন প্রকার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা আগে গুছাইয়া হাতের কাছে রাখিতেন। এ গুণের পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। দেবী এখন হাতের কাছেই পাইলেন—একটি সাদা নিশান। নিশানটি বাহিরে লইয়া স্বহস্তে উঁচু করিয়া ধরিলেন।

সেই নিশান দেখাইবামাত্র লড়াই একেবারে বন্ধ হইল। যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই হাতিয়ার ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝড় তুফান যেন হঠাৎ থামিয়া গেল, প্রমত্ত সাগর যেন অকস্মাৎ প্রশান্ত হ্রদে পরিণত হইল।

দেবী দেখিল, পাশে ব্রজেশ্বর। এই যুদ্ধের সময়ে দেবীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া, ব্রজেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। দেবী তাঁহাকে বলিল, "তুমি এই নিশান এইরূপ ধরিয়া থাক। আমি ভিতরে গিয়া নিশি ও দিবার সঙ্গে, একটা পরামর্শ আঁটিব। রঙ্গরাজ যদি এখানে আসে তাহাকে বলিও, সে দরওয়াজা হইতে আমার হুকুম লয়।"

এই বলিয়া দেবী ব্রজেশ্বরের হাতে নিশান দিয়া চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর নিশান তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সেখানে রঙ্গরাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গরাজ ব্রজেশ্বরের হাতে সাদা নিশান দেখিয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "তুমি কার হুকুমে সাদা নিশান দেখাইলে।"

ব্রজ। রাণীজির হুকুম।

রঙ্গ। রাণীজির হুকুম? তুমি কে?

ব্রজ। চিনিতে পার না?

রঙ্গরাজ একটু নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "চিনিয়াছি। তুমি ব্রজেশ্বরবাবু? এখান কি মনে করে? বাপ-বেটায় এক কাজে নাকি? কেহ একে বাঁধ।"

রঙ্গরাজের ধারণা হইল, যে, হরবল্লভের ন্যায় দেবীকে ধরাইয়া দিবার জন্যই ব্রজেশ্বর কোন ছলে বজরায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার আজ্ঞা পাইয়া দুইজন ব্রজেশ্বরকে বাঁধিতে আসিল। ব্রজেশ্বর কোন অপত্তি করিলেন না, বলিলেন "আমায় বাঁধ, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কথা বুঝাইয়া দাও। সাদা নিশান দেখিয়াই দুই দলে যুদ্ধ বন্ধ করিল কেন?"

রঙ্গরাজ বলিল, "কচি খোকা আর কি? জান না, সাদা নিশান দেখাইলে ইংরেজের আর যুদ্ধ করিতে নাই?"

ব্র। তা আমি জানিতাম না। তা আমি জানিয়াই করি, আর না জানিয়াই করি, রাণীজির হুকুম মত সাদা নিশান দেখাইয়াছি কি না, তুমি না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আর তোমারও আজ্ঞা আছে যে, তুমি দরওয়াজা হইতে রাণীজির হুকুম লইবে।

রঙ্গরাজ বরাবর কামরার দরজায় গেল। কামরার দরওয়াজা বন্ধ আছে দেখিয়া বাহির হইতে ডাকিল, "রাণী মা!"

ভিতর হইতে উত্তর, "কে, রঙ্গরাজ?"

রঙ্গ। আজ্ঞা হাঁ—একটা সাদা নিশান আমাদের বজরা হইতে দেখান হইয়াছে —লড়াই সেইজন্য বন্ধ আছে।

ভিতর হইতে—"সে আমারই হুকুম মত হইয়াছে। এখন তুমি ঐ সাদা নিশান লইয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেবের কাছে যাও। গিয়া বল যে, লড়ায়ে প্রয়োজন নাই, আমি ধরা দিব।"

রঙ্গ। আমার শরীর থাকিতে তাহা কিছুতেই হইবে না।

দেবী। শরীরপাত করিয়াও আমায় রক্ষা করিতে পারিবে না।

রঙ্গ। তথাপি শরীরপাত করিব।

দেবী। শোন, মূর্খের মত গোল করিও না। তোমার প্রাণ দিয়া আমায় বাঁচাইতে পারিবে না—এ সিপাহীর বন্দুকের কাছে লাঠি-সোঁটা কি করিবে?

রঙ্গ। কি না করিবে?

দেবী। যাই করুক—আর একবিন্দু রক্তপাত হইবার আগে আমি প্রাণ দিব,—বাহিরে গিয়া গুলির মুখে দাঁড়াইব—রাখিতে পারিবে না। বরং এখন আমি ধরা

দিলে পলাইবার ভরসা রহিল। বরং এক্ষণে আপন আপন প্রাণ রাখিয়া সুবিধা মত যাহাতে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সে চেষ্টাও করিও। আমার অনেক টাকা আছে। কোম্পানির লোক সকল অর্থের বশ—আমার পলাইবার ভাবনা কি ?

দেবী মুহূর্ত্ত জন্যও মনে করেন নাই যে, ঘুষ দিয়া তিনি পলাইবেন। সে রকম পলাইবার ইচ্ছাও ছিল না। এ কেবল রঙ্গরাজকে ভুলাইতেছিলেন। তাঁর মনের ভিতর যে গভীর কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল, রঙ্গরাজের বুঝিবার সাধ্য ছিল না—সুতরাং রঙ্গরাজকে তাহা বুঝাইলেন না। সরলভাবে ইংরেজকে ধরা দিবেন, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ আপনার বুদ্ধিতে সব খোয়াইবে। ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে, শত্রুর কোন অনিষ্ট করিবেন না, বরং শত্রুকে সতর্ক করিয়া দিবেন। তবে স্বামী, শ্বশুর, সখীদিগের উদ্ধারের জন্য যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাও করিবেন : যাহা যাহা হইবে, দেবী যেন দর্পণের ভিতর সকল দেখিতে পাইতেছিলেন।

রঙ্গরাজ বলিল, "যাহা দিয়া কোম্পানির লোক বশ করিবেন, তাহা ত বজরাতেই আছে। আপনি ধরা দিলে, ইংরেজ বজরাও লইবে।"

দেবী। সেইটি নিষেধ করিও। বলিও যে, আমি ধরা দিব, কিন্তু বজরা দিব না ; বজরায় যাহা আছে, তাহার কিছুই দিব না ; বজরায় যাহারা আছে, তাহাদের কাহাকেও তিনি ধরিতে পারিবেন না। এই নিয়মে আমি ধরা দিতে রাজি।

রঙ্গ। ইংরেজ যদি না শুনে, যদি বজরা লুঠিতে আসে।

দেবী। বারণ করিও—বজরায় না আসে, বজরা না স্পর্শ করে। বলিও যে, তাহা করিলে ইংরেজের বিপদ ঘটিবে। বজরায় আসিলে আমি ধরা দিব না। যে মুহূর্ত্তে ইংরেজ বজরায় উঠিবে, সেই দণ্ডে আবার যুদ্ধ আরম্ভ জানিবেন। আমার কথায় তিনি স্বীকৃত হইলে, তাঁহাদের কাহাকে এখানে আসিতে হইবে না। আমি নিজে তাঁহার ছিপে যাইব।

রঙ্গরাজ বুঝিল, ভিতরে একটা গভীর কৌশল আছে। দৌত্যে স্বীকৃত হইল। তখন দেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবানীঠাকুর কোথায় ?"

রঙ্গ। তিনি তীরে বরকন্দাজ লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। আমার কথা শোনেন নাই। বোধ করি, এখনও সেইখানে আছেন।

দেবী। আগে তাঁর কাছে যাও। সব বরকন্দাজ লইয়া নদীর তীরে তীরে স্বস্থানে যাইতে বল। বলিও যে, আমার বজরার লোকগুলি রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে। আর বলিও যে, আমার রক্ষার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই—আমার

রক্ষার জন্ত ভগবান্ উপায় করিয়াছেন। ইহাতে যদি তিনি আপত্তি করেন, আকাশ-পানে চাহিয়া দেখিতে বলিও—তিনি বুঝিতে পারিবেন।

রঙ্গরাজ তখন স্বয়ং আকাশপানে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, বৈশাখী নবীন নীরদমালায় গগন অন্ধকার হইয়াছে।

রঙ্গরাজ বলিল, "মা! আর একটা আজ্ঞার প্রার্থনা করি। হরবল্লভ রায় আজিকায় গোইন্দা। তার ছেলে ব্রজেশ্বরকে নৌকায় দেখিলাম। অভিপ্রায়টা মন্দ, সন্দেহ নাই! তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি।"

শুনিয়া নিশি ও দিবা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেবী বলিল, "বাঁধিও না। এখন গোপনে ছাদের উপর বসিয়া থাকিতে বল। পরে যখন দিবা নামিতে হুকুম দিবে, তখন নামিবেন।"

আজ্ঞামত রঙ্গরাজ আগে ব্রজেশ্বরকে ছাদে বসাইল। তারপর ভবানীঠাকুরের কাছে গেল, এবং দেবী যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, বলিল। রঙ্গরাজ মেঘ দেখাইল—ভবানী দেখিল। ভবানী আর আপত্তি না করিয়া, তীরের ও জলের বরকন্দাজ সকল জমা করিয়া লইয়া, ত্রিস্রোতার তীরে তীরে স্বস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিল।

এদিকে দিবা ও নিশি, এই অবসরে বাহিরে আসিয়া, বরকন্দাজবেশী দাঁড়ী মাঝিদিগকে চুপিচুপি কি বলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এদিকে ভবানীঠাকুরকে বিদায় দিয়া, রঙ্গরাজ সাদা নিশান হাতে করিয়া, জলে নামিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাহেবের ছিপে গিয়া উঠিল। সাদা নিশান হাতে দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। সে ছিপে উঠিলে, সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তোমরা সাদা নিশান দেখাইয়াছ, ধরা দিবে?"

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব কি? যাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছেন, তিনিই ধরা দিবেন, সেই কথা বলিতে আসিয়াছি।

সাহেব। দেবী চৌধুরাণী ধরা দিবেন?

রঙ্গ। দিবেন। তাই বলিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সা। আর তোমরা?

রঙ্গ। আমরা কারা?

সা। দেবী চৌধুরাণীর দল।

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব না।

সা। আমি দলশুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছি।

রঙ্গ। এই দল কারা? কি প্রকারে এই হাজার বরকন্দাজের মধ্যে দল বেদল চিনিবেন?

যখন রঙ্গরাজ এই কথা বলিল, তখন ভবানীঠাকুর বরকন্দাজ সৈন্য লইয়া চলিয়া যান নাই। যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সাহেব বলিল, "এই হাজার বরকন্দাজ সবাই ডাকাইত; কেন না, উহারা ডাকাইতের হইয়া সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।"

রঙ্গরাজ। উহারা যুদ্ধ করিবে না, চলিয়া যাইতেছে দেখুন।

সাহেব দেখিলেন, বরকন্দাজ সৈন্য পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সাহেব তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! তোমরা সাদা নিশানের ভাণ করিয়া পলাইতেছ?"

রঙ্গরাজ। সাহেব, ধরিলে কবে যে পলাইলাম? এখনও কেহ পলায় নাই। পার, ধর। সাদা নিশান ফেলিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সাদা নিশান ফেলিয়া দিল। কিন্তু সিপাহীরা সাহেবের আজ্ঞা না পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

সাহেব ভাবিতেছিলেন, "উহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া বৃথা। পিছু ছুটিতে ছুটিতে উহারা নিবিড় জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিবে। একে রাত্রিকাল, তাহাতে মেঘাড়ম্বর, জঙ্গলে ঘোর অন্ধকার সন্দেহ নাই। আমার সিপাহীরা পথ চেনে না, বরকন্দাজেরা পথ চেনে। সুতরাং তাহাদের ধরা সিপাহীর সাধ্য নহে।" কাজেই সাহেব সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। বলিলেন, "যাক, উহাদের চাই না। যে কথা হইতেছিল, তাই হৌক, তোমরা সকলে ধরা দিবে?"

রঙ্গ। এক জনও না। কেবল দেবী রাণী।

সাহেব। পীষ্! এখন আর লড়াই করিবে কে? এই যে কয় জন, তাহারা কি আর পাঁচ শ সিপাহীর সঙ্গে লড়াই করিতে পারিবে? তোমার বরকন্দাজ সেনা ত জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল, দেখিতেছি।

রঙ্গরাজ দেখিল, বাস্তবিক ভবানীঠাকুরের সেনা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল।

রঙ্গরাজ বলিল, আমি অত জানি না। আমায় আমাদের প্রভু যা বলিয়াছেন, তাই বলিতেছি। বজরা পাইবেন না, বজরায় যে ধন, তাহা পাইবেন না, আমাদের কাহাকেও পাইবেন না। কেবল দেবী রাণীকে পাইবেন।"

সা। কেন?

রঙ্গ। তা জানি না।

সা। জান আর নাই জান, বজরা এখন আমার, আমি উহা দখল করিব।

রঙ্গ। সাহেব, বজরাতে উঠিও না, বজরা ছুঁইও না, বিপদ্ ঘটিবে।

সা। পুঃ! পাঁচ শ সিপাহী লইয়া তোমাদের জন দুই চারি লোকের কাছে বিপদ্!

এই বলিয়া সাহেব সাদা নিশান ফেলিয়া দিলেন। সিপাহীদের হুকুম দিলেন, "বজরা ঘেরাও কর।"

সিপাহীরা পাঁচখানা ছিপ সমেত বজরা ঘেরিয়া ফেলিল। তখন সাহেব বলিলেন, "বজরার উপর উঠিয়া বরকন্দাজদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লও।"

এ হুকুম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে দিলেন। কথা দেবীর কানে গেল। দেবীও বজরার ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে হুকুম দিলেন, "বজরায় যাহার যাহার হাতে হাতিয়ার আছে, সব জলে ফেলিয়া দাও।"

শুনিবামাত্র, বজরায় যাহার যাহার হাতে অস্ত্র ছিল, সব জলে ফেলিয়া দিল। রঙ্গরাজও আপনার অস্ত্র সকল জলে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "চল, এখন বজরায় গিয়া দেখি, কি আছে?"

রঙ্গ। সাহেব, আপনি জোর করিয়া বজরায় যাইতেছেন, আমার দোষ নাই।

সা। তোমার আবার দোষ কি?

এই বলিয়া সাহেব একজন মাত্র সিপাহী সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে বজরায় উঠিলেন। এটা বিশেষ সাহসের কাজ নহে; কেন না, বজরার উপর যে কয়জন লোক ছিল, তাহারা সকলেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। সাহেব বুঝেন নাই যে, দেবীর স্থিরবুদ্ধিই শাণিত মহাস্ত্র; তার অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

সাহেব রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার দরজায় আসিলেন। দ্বার তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে দুইজনেই বিস্মিত হইলেন।

দেখিলেন, যেদিন প্রথম ব্রজেশ্বর বন্দী হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দিন যেমন ইহার মনোহর সজ্জা, আজিও সেইরূপ; দেয়ালে তেমনি চারু চিত্র। তেমনি সুন্দর গালিচা পাতা। তেমনি আতরদান, গোলাবপাশ, তেমনি সোনার পুষ্পপাত্রে ফুল ভরা, সোনার আলবোলায় তেমনি মৃগনাভিগন্ধি তামাকু সাজা। তেমনি রূপার পুতুল, রূপার ঝাড়, সোনার শিকলে দোলান সোনার প্রদীপ। কিন্তু আজ একটা মসনদ নয়—দুইটা। দুইটা মসনদের উপর সুবর্ণমণ্ডিত উপাধানে দেহরক্ষা করিয়া, দুইটি সুন্দরী রহিয়াছে। তাহাদের পরিধানে মহার্ঘ বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে মহামূল্য

রত্নভূষা। সাহেব তাদের চেনে না—রঙ্গরাজ চিনিল। চিনিল যে, একজন নিশি—আর একজন দিবা।

সাহেবের জন্য একখানা রূপার চৌকি রাখা হইয়াছিল, সাহেব তাহাতে বসিলেন। রঙ্গরাজ খুঁজিতে লাগিলেন, দেবী কোথা? দেখিলেন, কামরার একধারে দেবীর সহজ বেশে দেবী দাঁড়াইয়া আছে, গড়া পরা, কেবল কড় হাতে, এলোচুল, কোন বেশভূষা নাই।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দেবী চৌধুরাণী? কাহার সঙ্গে কথা কহিব?" নিশি বলিল, "আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। আমি দেবী।"

দিবা হাসিল, বলিল, "ইংরেজ দেখিয়া রঙ্গ করিতেছিস্? এ কি রঙ্গের সময়? লেফ্‌টেনাণ্ট্ সাহেব! আমার এ ভগিনী কিছু রঙ্গ তামাসা ভালবাসে, কিন্তু এ তার সময় নয়। আপনি আমার সঙ্গে কথা কহিবেন—আমি দেবী চৌধুরাণী।"

নিশি বলিল, "আ মরণ! তুই কি আমার জন্য ফাঁসি যেতে চাস্ না কি?" সাহেবের দিকে ফিরিয়া নিশি বলিল, "সাহেব, আমার ভগিনী—বোধ হয়, স্নেহ বশতঃ আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে প্রতারণা করিতেছে। কিন্তু কেমন করিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া বহিনের প্রাণদণ্ড করিয়া, আপনার প্রাণরক্ষা করিব? প্রাণ অতি তুচ্ছ, আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, অক্লেশে ত্যাগ করিতে পারি। চলুন, আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন, যাইতেছি। আমিই দেবী রাণী।"

দিবা বলিল, "সাহেব! তোমার যিশু খ্রীষ্টের দিব্য, তুমি যদি নিরপরাধিনীকে ধরিয়া লইয়া যাও। আমি দেবী।"

সাহেব বিরক্ত হইয়া রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি তামাসা? কে দেবী চৌধুরাণী, তুমি যথার্থ বলিবে?"

রঙ্গরাজ কিছু বুঝিল না, কেবল অনুভব করিল যে, ভিতরে একটা কি কৌশল আছে। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া সে নিশিকে দেখাইয়া, হাতজোড় করিয়া বলিল, "হুজুর! এ-ই যথার্থ দেবী রাণী।"

তখন দেবী প্রথম কথা কহিল। বলিল, "আমার ইহাতে কথা কহা বড় দোষ। কিন্তু কি জানি, এরপর মিছা কথা ধরা পড়িলে, যদি সকলে মারা যায়, তাই বলিতেছি, এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য নহে।" পরে নিশিকে দেখাইয়া বলিল, "এ দেবী নহে। যে উহাকে দেবী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সে রাণীজিকে মা বলে, রাণীজিকে মার মত ভক্তি করে, এই জন্য সে রাণীজিকে বাঁচাইবার জন্য অন্য ব্যক্তিকে নিশান দিতেছে।"

তখন সাহেব দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী তবে কে?"

দেবী বলিল, "আমি দেবী।"

দেবী এই কথা বলিলে নিশিতে, দিবাতে, রঙ্গরাজে ও দেবীতে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। নিশি বলে, "আমি দেবী," দিবা বলে, "আমি দেবী," রঙ্গরাজ নিশিকে বলে, "এই দেবী," দেবী বলে, "আমি দেবী"। বড় গোলমাল।

তখন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব মনে করিলেন, এ ফেরেব্‌বাজির একটা চূড়ান্ত করা উচিত। বলিলেন, "তোমাদের দুইজনের মধ্যে একজন দেবী চৌধুরাণী বটে। ওটা চাকরাণী, ওটা দেবী নহে। এই দুইজনের মধ্যে কে সে পাপিষ্ঠা, তাহা তোমরা চাতুরী করিয়া আমাকে জানিতে দিতেছ না। কিন্তু তাহাতে তোমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। আমি এখন দুইজনকেই ধরিয়া লইয়া যাইব। ইহার পর প্রমাণের দ্বারা যে দেবী চৌধুরাণী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, সেই ফাঁসি যাইবে। যদি প্রমাণের দ্বারা একথা পরিষ্কার না হয়, তবে দুইজনেই ফাসি যাইবে।"

তখন নিশি ও দিবা দুইজনেই বলিল,"এত গোলযোগে কাজ কি? আপনার সঙ্গে কি গোইন্দা নাই? যদি গোইন্দা থাকে, তবে তাহাকে ডাকাইলেই ত সে বলিয়া দিতে পারিবে,—কে যথার্থ দেবী চৌধুরাণী।"

হরবল্লভকে বজরায় আনিবে, দেবীর এই প্রধান উদ্দেশ্য। হরবল্লভের রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, দেবী আত্মরক্ষার উপায় করিবে না, ইহা স্থির। তাঁহাকে বজরায় না আনিতে পারিলে হরবল্লভের রক্ষার নিশ্চয়তা হয় না।

সাহেব মনে করিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নহে।" তখন তাঁহার সঙ্গে যে সিপাহী আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, "গোইন্দাকে ডাক।" সিপাহী এক ছিপের একজন জমাদ্দার সাহেবকে ডাকিয়া বলিল, "গোইন্দাকে ডাক।" তখন গোইন্দাকে ডাকাডাকির গোল পড়িয়া গেল। গোইন্দা কোথায়, গোইন্দা কে, তাহা কেহই জানে না, কেবল চারিদিকে ডাকাডাকি করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বস্তুতঃ হরবল্লভ রায় মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, ঘটনাধীন। প্রথমে বড় ঘেঁষেন নাই। "শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং" ইত্যাদি চাণক্যপ্রদত্ত সদুপদেশ স্মরণ করিয়া, তিনি সিপাহীদিগের ছিপে উঠেন নাই। একখানা পৃথক্ ডিঙ্গীতে থাকিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেবকে বজরা দেখাইয়া দিয়া, অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে পলাইয়া গিয়া ডিঙ্গী ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তারপর দেখিলেন, আকাশে বড়

ঘনঘটা। মনে করিলেন, ঝড় উঠিবে ও এখনই আমার ডিঙ্গী ডুবিয়া যাইবে, টাকার লোভে আসিয়া আমি প্রাণ হারাইব—আমার সৎকারও হইবে না। তখন রায় মহাশয় ডিঙ্গী হইতে তীরে অবতরণ করিলেন। কিন্তু তীরে সেখানে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া বড় ভয় হইল। সাপের ভয়, বাঘের ভয়, চোর ডাকাইতের ভয়, ভূতেরও ভয়। হরবল্লভের মনে হইল, কেন এমন ঝক্‌মারি করিতে আসিয়াছিলাম। হরবল্লভের কান্না আসিল।

এমন সময়ে হঠাৎ বন্দুকের হুড়মুড়ি, সিপাহী বরকন্দাজের হৈ হৈ শব্দ সব বন্ধ হইয়া গেল। হরবল্লভের বোধ হইল, অবশ্য সিপাহীর জয় হইয়াছে, ডাকাইত মাগী ধরা পড়িয়াছে, নহিলে লড়াই বন্ধ হইবে কেন? তখন হরবল্লভ ভরসা পাইয়া, যুদ্ধস্থানে যাইতে অগ্রসর হইলেন। তবে এ রাত্রিকালে, এ অন্ধকারে, এ বন-জঙ্গলের মাঝে অগ্রসর হন কিরূপে? ডিঙ্গীর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বাপু মাঝি,—বলি, ওদিকে যাওয়া যায় কিরূপে বল্‌তে পার?

মাঝি বলিল, "যাওয়ার ভাবনা কি? ডিঙ্গীতে উঠুন না, নিয়ে যাচ্ছি। সিপাহীরা মারবে ধরবে না ত? আবার যদি লড়াই বাধে?"

হর। সিপাহীরা আমাদের কিছু বলিবে না। লড়াই আর বাধিবে না—ডাকাইত ধরা পড়েছে। কিন্তু যেরকম মেঘ করেছে, এখনই ঝড় উঠবে—ডিঙ্গীতে উঠি কিরূপে?

মাঝি বলিল, "ঝড়ে ডিঙ্গী কখনও ডুবে না।"

হরবল্লভ প্রথমে সে সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন না—শেষ অগত্যা ডিঙ্গীতে উঠিলেন। মাঝিকে উপদেশ দিলেন, কেনারায় কেনারায় ডিঙ্গী লইয়া যাইবে। মাঝি তাহাই করিল। শীঘ্র আসিয়া ডিঙ্গী বজরায় লাগিল। হরবল্লভ সিপাহীদের সঙ্কেতবাক্য জানিতেন, সুতরাং সিপাহীরা আপত্তি করিল না। সেই সময়ে "গোইন্দা! গোইন্দা!" করিয়া ডাকাডাকি হইতেছিল। হরবল্লভ বজরায় উঠিয়া সম্মুখস্থ আরদালির সিপাহীকে বলিল, "গোইন্দাকে খুঁজিতেছ? আমি গোইন্দা।"

সিপাহী বলিল, "তোমাকে কাপ্তেন সাহেব তলব করিয়াছেন।"

হর। কোথায় তিনি?

সিপা। কামরার ভিতর। তুমি কামরার ভিতর যাও।

হরবল্লভ আসিতেছে জানিতে পারিয়া, দেবী প্রস্থানের উদ্যোগ দেখিল। "কাপ্তেন সাহেবের জন্য কিছু জলযোগের উদ্যোগ দেখি" বলিয়া ভিতরের কামরায় চলিয়া গেল।

এদিকে হরবল্লভ কামরার দিকে গেলেন। কামরার দ্বারে উপস্থিত হইয়া

কামরার সজ্জা ও ঐশ্বর্য্য, দিবা ও নিশির রূপ ও সজ্জা দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন। সাহেবকে সেলাম্ করিতে গিয়া ভুলিয়া নিশিকে সেলাম্ করিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া নিশি কহিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! মেজাজ্ সরিফ্?"

শুনিয়া দিবা কহিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! আমার একটা কুর্ণিস হ'ল না—আমি হলেম এদের রাণী।"

সাহেব হরবল্লভকে বলিলেন, "ইহারা ফেরেব্ করিয়া দুইজনেই বলিতেছে, 'আমি দেবী চৌধুরাণী।' কে দেবী চৌধুরাণী, তাহার ঠিকানা না হওয়ায় আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। কে দেবী?"

হরবল্লভ বড় প্রমাদে পড়িলেন। ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষের ভিতর কখনও দেবীকে দেখেন নাই। কি করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে দেখাইয়া দিলেন। নিশি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া, 'ভুল হইয়াছে' বলিয়া হরবল্লভ দিবাকে দেখাইলেন। দিবা লহর তুলিয়া হাসিল। বিষণ্ণ মনে হরবল্লভ আবার নিশিকে দেখাইল; সাহেব তখন গরম হইয়া হরবল্লভকে বলিলেন, "টোম্ বড্‌ঝাট্—শূওর! তোম্ পছান্‌টে নেহি?"

তখন দিবা বলিল, "সাহেব, রাগ করিবেন না। উনি চেনেন না। উঁহার ছেলে চেনে। উঁহার ছেলে বজরার ছাদে বসিয়া আছে, তাহাকে আনুন—সে চিনিবে।"

হরবল্লভ আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, "আমার ছেলে!"

দিবা। এইরূপ শুনি।

হর। ব্রজেশ্বর?

দিবা। তিনিই

হর। কোথা?

দিবা। ছাদে।

হর। ব্রজ এখানে কেন?

দিবা। তিনি বলিবেন।

সাহেব হুকুম দিলেন, "তাঁহাকে আন।"

দিবা রঙ্গরাজকে ইঙ্গিত করিল। তখন রঙ্গরাজ ছাদে গিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, "চল, দিবা ঠাকুরাণীর হুকুম।"

ব্রজেশ্বর নামিয়া কামরার ভিতর আসিল। দেবীর হুকুম আগেই প্রচার হইয়াছিল, দিবার হুকুম পাইলেই ব্রজেশ্বর ছাদ হইতে নামিবে। এমনই দেবীর বন্দোবস্ত।

সাহেব ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দেবী চৌধুরাণীকে চেন ?"

ব্রজ। চিনি।

সাহেব। এখানে দেবী আছে ?

ব্রজ। না।

সাহেব তখন রাগান্ধ হইয়া বলিলেন, "সে কি ইহারা দুইজনের একজনও দেবী চৌধুরাণী নয় ?"

ব্র। এরা তার দাসী।

সা। এঃ! তুমি দেবীকে চেন ?

ব্র। বিলক্ষণ চিনি।

সা। যদি এরা কেহ দেবী না হয়, তবে দেবী অবশ্য এ বজরার কোথাও লুকাইয়া আছে। বোধ হয়, দেবী সেই চাকরাণীটা। আমি বজরা তল্লাশী করিতেছি—তুমি নিশানদিহি করিবে, আইস।

ব্র। সাহেব, তোমার বজরা তল্লাশ করিতে হয়, কর—আমি নিশানদিহি করিব কেন ?

সাহেব বিস্মিত হইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "কেঁও বদ্‌জাত্‌ ? তোম্‌ গোইন্দা নেহি ?

"নেহি।" বলিয়া ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে বিরাশী সিক্কার এক চপেটাঘাত করিল।

"করিলে কি ? করিলে কি ? সর্ব্বনাশ করিলে ?" বলিয়া, হরবল্লভ কাঁদিয়া উঠিল।

"হুজুর! তুফান উঠা।" বলিয়া বাহির হইতে জোমাদ্দার হাঁকিল।

সোঁ সোঁ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে শুনা গেল।

কামরার ভিতর হইতে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—যে মুহূর্ত্তে সাহেবের গালে ব্রজেশ্বরের চড় পড়িল—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আবার শাঁক বাজিল। এবার দুই ফুঁ।

বজরার নোঙ্গর ফেলা ছিল না—পূর্ব্বে বলিয়াছি, খোঁটায় কাছি বাঁধা ছিল, খোঁটার কাছে দুইজন নাবিক বসিয়াছিল। যেমন শাঁক বাজিল, অমনি তাহারা কাছি ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল। তীরের উপর যে সিপাহীরা বজরা ঘেরাও করিয়াছিল তাহারা উহাদিগকে মারিবার জন্য সঙ্গীন উঠাইল—কিন্তু তাহাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিল, পলক ফেলিতে না ফেলিতে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া গেল। দেবীর কৌশলে এক পলক মধ্যে সেই পাঁচ শত কোম্পানির সিপাই পরাস্ত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রথমাবধিই বজরায় চারিখানা পাল খাটান ছিল। বলিয়াছি যে, মধ্যে নিশি ও দিবা আসিয়া, নাবিকদিগকে কি উপদেশ দিয়া গিয়াছিল। সেই উপদেশ অনুসারেই খোঁটার কাছে লোক বসিয়াছিল। আর সেই উপদেশ অনুসারে পালের কাছির কাছে চারিজন নাবিক বসিয়াছিল। শাঁকের শব্দ শুনিবা মাত্র তাহারা পালের কাছি সকল টানিয়া ধরিল। মাঝি হাল আঁটিয়া ধরিল। অমনি সেই প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা আসিয়া চারিখানা পালে লাগিল। বজরা ঘুরিল—যে দুইজন সিপাহী সঙ্গীন তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গীন উঁচু হইয়া রহিল—বজরার মুখ পঞ্চাশ হাত তফাতে গেল। বজরা ঘুরিল—তারপর ঝড়ের বেগে পালভরা বজরা কাত হইল, প্রায় ডুবে। লিখিতে এতক্ষণ লাগিল—কিন্তু এতখানা ঘটিল একনিমেষ মধ্যে। সাহেব ব্রজেশ্বরের চড়ের প্রত্যুত্তরে ঘুষি উঠাইয়াছেন মাত্র, ইহারই মধ্যে এতখানা সব হইয়া গেল। তাঁহারও হাতের ঘুষি হাতে রহিল, যেমন বজরা কাত হইল, অমনি সাহেব টলিয়া মুষ্টিবদ্ধ-হস্তে দিবা সুন্দরীর পাদমূলে পতিত হইলেন। ব্রজেশ্বর খোদ সাহেবের ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেল—এবং রঙ্গরাজ তাহার উপর পড়িয়া গেল। হরবল্লভ প্রথমে নিশিঠাকুরাণীর ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে পদচ্যুত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে রঙ্গরাজের নাগরা জুতায় আটকাইয়া গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, "নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে!"

কিন্তু নৌকা ডুবিল না—কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল। যাহারা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল—সাহেব আবার ঘুষি তুলিলেন। কিন্তু সাহেবের ফৌজ যাহারা জলে দাঁড়াইয়াছিল, বজরা তাহাদের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। অনেকে জলে ডুবিয়া প্রাণরক্ষা করিল; কেহ দূর হইতে বজরা ঘুরিতেছে দেখিতে পাইয়া, পলাইয়া বাঁচিল; কেহ বা আহত হইল; কেহ মরিল না। ছিপগুলি বজরার নীচে পড়িয়া ডুবিয়া গেল—জল সেখানে এমন বেশী নহে—স্রোত বড় নাই—সুতরাং সকলেই বাঁচিল। কিন্তু বজরা আর কেহ দেখিতে পাইল না। নক্ষত্রবেগে উড়িয়া বজরা কোথায় ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে পাইল না। সিপাহী সেনা ছিন্নভিন্ন হইল। দেবী তাহাদের পরাস্ত করিয়া, পাল উড়াইয়া চলিল, লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব ও হরবল্লভ দেবীর নিকট বন্দী হইল। নিমেষমধ্যে যুদ্ধ জয় হইল। দেবী তাই আকাশ দেখাইয়া বলিয়াছিল, "আমার রক্ষার উপায় ভগবান্‌ করিতেছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বজরা জলের রাশি ভাঙ্গিয়া, দুলিতে দুলিতে নক্ষত্র-বেগে ছুটিল। শব্দ ভয়ানক। বজরার মুখে ক্রুদ্ধ তরঙ্গরাশির গর্জ্জন ভয়ানক—ঝড়ের শব্দ ভয়ানক। কিন্তু নৌকার গঠন অনুপম, নাবিকদিগের দক্ষতা ও শিক্ষা প্রসিদ্ধ। নৌকা এই ঝড়ের মুখে চারিখানা পাল দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিল। আরোহিবর্গ যাঁহারা প্রথমে কুষ্মাণ্ডাকারে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে স্বপদস্থ হইলেন। হরবল্লভ রায় মহাশয়, অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়িত করিয়া, দুর্গানাম জপিতে আরম্ভ করিলেন, আবার না ডুবি। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাহেব সেই মুলতুবী ঘুষিটা আবার পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টায় হস্তোত্তোলন করিলেন, অমনি ব্রজেশ্বর তাঁর হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। হরবল্লভ ছেলেকে ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, "ও কি কর, ইংরেজের গায়ে হাত তোল ?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "আমি ইংরেজের গায়ে হাত তুলেছি, না ইংরেজ আমার গায়ে হাত তুলিতেছে ?"

হরবল্লভ সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর ! ও ছেলেমানুষ, আজও বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি, আপনি ওর অপরাধ লইবেন না। মাফ করুন।"

সাহেব বলিলেন, "ও বড় বদ্‌মাস। তবে যদি আমার কাছে ও যোড়হাত করিয়া মাফ চায়, তবে আমি মাফ করিতে পারি।"

হরবল্লভ। ব্রজ, তাই কর। যোড়হাত করিয়া সাহেবকে বল, "আমায় মাফ করুন।"

ব্রজেশ্বর। সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতার আজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে যোড়হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি আমাকে মাফ করুন।

সাহেব ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া ব্রজেশ্বরকে ক্ষমা করিলেন ; আর ব্রজেশ্বরের হাত লইয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিলেন। ব্রজেশ্বরের চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কখন জানে না, সেক্‌হ্যাণ্ড কাকে বলে—সুতরাং ব্রজেশ্বর একটু ভেকা হইয়া রহিল। মনে করিল, "কি জানি, যদি আবার বাঁধে।" এই ভাবিয়া ব্রজেশ্বর বাহিরে গিয়া বসিল। কেবল ঝড়,—বৃষ্টি বড় নাই,—ভিজিতে হইল না।

রঙ্গরাজও বাহিরে আসিয়া, কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল—দুইদিকের পাহারায়। বিশেষ, এ সময়ে বাহিরে একটু সতর্ক থাকা ভাল, বজরা বড় তীব্রবেগে যাইতেছে, হঠাৎ বিপদ্ ঘটাও বিচিত্র নহে।

দিবা উঠিয়া দেবীর কাছে গেল—পুরুষ-মহলে এখন আর প্রয়োজন নাই।

নিশি উঠিল না—তার কিছু মতলব ছিল। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত—সুতরাং অগাধ সাহস।

সাহেব ঝাঁকিয়া আবার রূপার চৌকিতে বসিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, "ডাকাইতের হাত হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? যাহাকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, তাহারই কাছে ধরা পড়িলাম—স্ত্রীলোকের কাছে পরাজিত হইলাম, ইংরেজ-মহলে আর কি বলিয়া মুখ দেখাইব? আমার না ফিরিয়া যাওয়াই ভাল।"

হরবল্লভ আর বসিবার স্থান না পাইয়া নিশি সুন্দরীর মসনদের কাছে বসিলেন। দেখিয়া নিশি বলিল, "আপনি একটু নিদ্রা যাবেন?"

হর। আজ কি আর নিদ্রা হয়?

নিশি। আজ না হইল ত আর হইল না।

হর। সে কি?

নিশি। আবার ঘুমাইবার দিন কবে পাইবেন?

হর। কেন?

নিশি। আপনি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন?

হর। তা—তা—কি জান—

নিশি। ধরা পড়িলে দেবীর কি হইত, জান?

হর। আ—এমন কি—

নিশি। এমন কিছু নয়, ফাঁসি!

হর। তা—না—এই—তা কি জান—

নিশি। দেবী তোমার কোন অনিষ্ট করে নাই, বরং ভারী উপকার করিয়াছিল—যখন তোমার জাতি যায়, প্রাণ যায়, তখন তোমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়া, তোমায় রক্ষা করিয়াছিল। তার প্রত্যুপকারে তুমি তাহাকে ফাঁসি দিবার চেষ্টায় ছিলে। তোমার যোগ্য কি দণ্ড বল দেখি?

হরবল্লভ চুপ করিয়া রহিল।

নিশি বলিতে লাগিল, "তাই বলিতেছিলাম, এই বেলা ঘুমাইয়া লও—আর রাত্রের মুখ দেখিবে না। নৌকা কোথায় যাইতেছে বল দেখি?"

হরবল্লভের কথা কহিবার শক্তি নাই।

নিশি বলিতে লাগিল, ডাকিনীর শ্মশান বলিয়া এক প্রকাণ্ড শ্মশান আছে। আমরা যাদের প্রাণে মারি, তাদের সেইখানে লইয়া গিয়া মারি। বজরা এখন সেইখানে

যাইতেছে। সেইখানে পৌঁছিলে সাহেব ফাঁসি যাইবে, রাণীজির হুকুম হইয়া গিয়াছে। আর তোমায় কি হুকুম হইয়াছে, জান?"

হরবল্লভ কাঁদিতে লাগিল—যোড়হাত করিয়া বলিল, "আমায় রক্ষা কর!"

নিশি বলিল, "তোমায় রক্ষা করিবে, এমন পাষণ্ড পামর কে আছে? তোমায় শূলে দিবার হুকুম হইয়াছে।"

হরবল্লভ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঝড়ের শব্দ বড় প্রবল; সে কান্নার শব্দ ব্রজেশ্বর শুনিতে পাইল না—দেবীও না। সাহেব শুনিল। সাহেব কথাগুলি শুনিতে পায় নাই—কান্না শুনিতে পাইল। সাহেব ধমকাইল, "রোও মৎ—উল্লুক। মরনা এক রোজ আল্‌বাৎ হ্যায়"

সে কথা কানে না তুলিয়া, নিশির কাছে যোড়হাত করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "হাঁ গা! আমায় কি কেউ রক্ষা করিতে পারে না গা?"

নিশি। তোমার মত নরাধমকে বাঁচাইয়া কে পাতকগ্রস্ত হইবে? আমাদের রাণী দয়াময়ী, কিন্তু তোমার জন্য কেহই তাঁর কাছে দয়ার ভিক্ষা করিব না।

হয়। আমি লক্ষ টাকা দিব।

নিশি। মুখে আনিতে লজ্জা করে না? পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য এই কৃতঘ্নের কাজ করিয়াছ—আবার লক্ষ টাকা হাঁক?

হর। আমাকে যা বলিবে, তাই করিব।

নিশি। তোমার মত লোকের দ্বারা কোন্ কাজ হয় যে, তুমি যা বলিব, তাই করিবে?

হর। অতি ক্ষুদ্রের দ্বারাও উপকার হয়—ওগো, কি করিতে হইবে বল, আমি প্রাণপণ করিয়া করিব—আমায় বাঁচাও।

নিশি। (ভাবিতে ভাবিতে) তোমার দ্বারাও আমার একটা উপকার হইলে হইতে পারে—তা তোমার মত লোকের দ্বারা সে উপকার না হওয়াই ভাল।

হর। তোমার কাছে যোড়হাত করিতেছি—তোমার হাতে ধরিতেছি—

হরবল্লভ বিহ্বল—নিশি ঠাকুরাণীর বাঁউড়ী-পরা গোলগাল হাতখানি প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কি! চতুরা নিশি আগে হাত সরাইয়া লইল—বলিল, "সাবধান! ও হাত শ্রীকৃষ্ণের গৃহীত। কিন্তু তোমায় হাতে পায়ে ধরিয়া কাজ নাই—তুমি যদি এতই কাতর হইয়াছ, তবে তুমি যাতে রক্ষা পাও, আমি তা করিতে রাজি হইতেছি। কিন্তু তোমায় যা বলিব, তা যে তুমি করিবে, এ বিশ্বাস হয় না। তুমি জুয়াচোর, কৃতঘ্ন, পামর, গোইন্দাগিরি কর—তোমার কথার বিশ্বাস কি?"

হর। যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিতেছি।

নিশি। তোমার আবার দিব্য—কি দিব্য করিবে ?

হর। গঙ্গাজল তামা তুলসী দাও—আমি স্পর্শ করিয়া দিব্য করিতেছি।

নিশি। ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতে পার ?

হরবল্লভ গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল, "তোমাদের যা ইচ্ছা, তাহা কর। আমি তা পারিব না।"

কিন্তু এ তেজ ক্ষণিকমাত্র। হরবল্লভ আবার তখনই হাত কচ্‌লাইতে লাগিল—বলিল, "আর যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিব, রক্ষা কর।"

নিশি। আচ্ছা, দিব্য করিতে হইবে না—তুমি আমাদের হাতে আছ। শোন, আমি বড় কুলীনের মেয়ে। আমাদের ঘরে পাত্র যোটা ভার। আমার একটি পাত্র যুটিয়াছিল, (পাঠক জানেন, সব মিথ্যা) কিন্তু আমার ছোট বহিনের যুটিল না। আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই।

হর। বয়স কত হইয়াছে ?

নিশি। পঁচিশ ত্রিশ।

হর। কুলীনের মেয়ে অমন অনেক থাকে।

নিশি। থাকে, কিন্তু আর তার বিবাহ না হইলে অঘরে পড়িবে, এমন গতিক হইয়াছে। তুমি আমার বাপের পালটি ঘর। তুমি যদি আমার ভগিনীকে বিবাহ কর, আমার বাপের কুল থাকে। আমিও এই কথা বলিয়া রাণীজির কাছে তোমার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লই।

হরবল্লভের মাথার উপর হইতে পাহাড় নামিয়া গেল। আর একটা বিবাহ বৈ ত নয়—সেটা কুলীনের পক্ষে শক্ত কাজ নয়—তা যত বড় মেয়েই হোক্ না কেন! নিশি যে উত্তরের প্রত্যাশা করিয়াছিল, হরবল্লভ ঠিক সেই উত্তর দিল, বলিল, "এ আর বড় কথা কি ? কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। তবে একটা কথা এই, আমি বুড়া হইয়াছি, আমার আর বিবাহের বয়স নাই। আমার ছেলে বিবাহ করিলে হয় না ?"

নিশি। তিনি রাজি হবেন ?

হর। আমি বলিলেই হইবে।

নিশি। তবে আপনি কাল প্রাতে সেই আজ্ঞা দিয়া যাইবেন। তাহা হইলে, আমি পাল্কী বেহারা আনিয়া আপনাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। আপনি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করিবেন। আমরা বরের বিবাহ দিয়া বৌ সঙ্গে পাঠাইয়া দিব।

হরবল্লভ হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল—কোথায় শূলে যায়—কোথায় বৌভাতের

ঘটা। হরবল্লভের আর দেরী সয় না। বলিল, "তবে তুমি গিয়া রাণীজিকে এ সকল কথা জানাও।"

নিশি বলিল, "চলিলাম।" নিশি দ্বিতীয় কামরার ভিতর প্রবেশ করিল।

নিশি গেলে, সাহেব হরবল্লভকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রীলোকটা তোমাকে কি বলিতেছিল?"

হর। এমন কিছুই না।

সাহেব। কাঁদিতেছিলে কেন?

হর। কই? কাঁদি নাই।

সাহেব। বাঙ্গালী এমনই মিথ্যাবাদী বটে।

নিশি ভিতরে আসিলে, দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার শ্বশুরের সঙ্গে এত কি কথা কহিতেছিলে?"

নিশি। দেখিলাম, যদি তোমার শাশুড়ীগিরিতে বাহাল হইতে পারি।

দেবী। নিশি ঠাকুরাণি! তোমার মন-প্রাণ, জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছ—কেবল জুয়াচুরিটুকু নয়। সেটুকু নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছ।

নিশি। দেবতাকে ভাল সামগ্রীই দিতে হয়। মন্দ সামগ্রী কি দিতে আছে?

দেবী। তুমি নরকে পচিয়া মরিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

ঝড় থামিল; নৌকাও থামিল। দেবী বজরার জানালা হইতে দেখিতে পাইলেন, প্রভাত হইতেছে। বলিলেন, "নিশি! আজ সুপ্রভাত!"

নিশি বলিল, "আমি আজ সুপ্রভাত!"

দিবা। তুমি অবসান, আমি সুপ্রভাত!

নিশি। যেদিন আমার অবসান হইবে, সেইদিনই আমি সুপ্রভাত বলিব। এ অন্ধকারের অবসান নাই। আজ বুঝিলাম, দেবী চৌধুরাণীর সুপ্রভাত—কেন না, আজ দেবী চৌধুরাণীর অবসান।

দিবা। ও কি কথা লো পোড়ারমুখী?

নিশি। কথা ভাল। দেবী মরিয়াছে। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ী চলিল।

দেবী। তার এখন দেরী ঢের। যা বলি, কর দেখি। বজরা বাঁধিতে বল দেখি।

নিশি হুকুম জারি করিল—মাঝিরা তীরে লাগাইয়া বজরা বাঁধিল। তারপর দেবী বলিল, "রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় আসিয়াছি? রঙ্গপুর কত দূর? ভূতনাথ কত দূর?"

রঙ্গরাজ জিজ্ঞাসায় বলিল, "একরাত্রে চারিদিনের পথ আসিয়াছি। রঙ্গপুর এখান হইতে অনেক দিনের পথ। ডাঙ্গা-পথে ভুতনাথে একদিনে যাওয়া যাইতে পারে।"

"পাল্কী বেহারা পাওয়া যাইবে?"

"আমি চেষ্টা করিলে সব পাওয়া যাইবে।"

দেবী নিশিকে বলিল, "তবে আমার শ্বশুরকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দাও।"

দিবা। এত তাড়াতাড়ি কেন?

নিশি। শ্বশুরের ছেলে সমস্ত রাত্রি বাহিরে বসিয়া আছে, মনে নাই? বাছাধন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিতে পারিতেছে না, দেখিতেছ না?

এই বলিয়া নিশি রঙ্গরাজকে ডাকিয়া, হরবল্লভের সাক্ষাতে বলিল, "সাহেবটাকে ফাঁসি দিতে হইবে। ব্রাহ্মণটাকে এখন শূলে দিয়া কাজ নাই। উহাকে পাহারাবন্দী করিয়া স্নানাহ্নিকে পাঠাইয়া দাও।"

হরবল্লভ বলিলেন, "আমার উপর হুকুম কিছু হইয়াছে?"

নিশি চোখ টিপিয়া বলিল, "আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। তুমি স্নানাহ্নিক করিয়া আইস।"

নিশি রঙ্গরাজের কানে কানে বলিল, "পাহারা মানে জল-আচরণী ভৃত্য।" রঙ্গরাজ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হরবল্লভকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দিল।

তখন দেবী নিশিকে বলিল, "সাহেবটাকে ছাড়িয়া দিতে বল। সাহেবকে রঙ্গপুর ফিরিয়া যাইতে বল। রঙ্গপুর অনেক দূর, একশত মোহর উহাকে পথখরচ দাও, নহিলে এত পথ যাইবে কি প্রকারে?"

নিশি শত স্বর্ণ লইয়া গিয়া রঙ্গরাজকে দিল, আর কানে কানে উপদেশ দিল। উপদেশে দেবী যাহা বলিয়াছিল,তাহা ছাড়া আরও কিছু ছিল।

রঙ্গরাজ তখন দুইজন বরকন্দাজ লইয়া আসিয়া সাহেবকে ধরিল। বলিল, "উঠ।"

সাহেব। কোথা যাইতে হইবে?

রঙ্গ। তুমি কয়েদী—জিজ্ঞাসা করিবার কে?

সাহেব বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গরাজের পিছু পিছু দুইজন বরকন্দাজের মাঝে চলিল। যে ঘাটে হরবল্লভ স্নান করিতেছিলেন, সেই ঘাট দিয়া তাহারা যায়।

হরবল্লভ জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেবকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

রঙ্গরাজ বলিল,"এই জঙ্গলে।"

হর। কেন?

রঙ্গ। জঙ্গলের ভিতর গিয়া উহাকে ফাঁসি দিব।

হরবল্লভের গা কাঁপিল। সে সন্ধ্যা-আহ্নিকের সব মন্ত্র ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যাহ্নিক ভাল হইল না।

রঙ্গরাজ জঙ্গলে সাহেবকে লইয়া গিয়া বলিল,“আমরা কাহাকে ফাঁসি দিই না। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও, আমাদের পিছনে আর লেগো না। তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।”

সাহেব প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল—তারপর ভাবিল, “ইংরেজকে ফাঁসি দেয়, বাঙ্গালীর এত কি ভরসা ?”

তারপর রঙ্গরাজ বলিল, “সাহেব ! রঙ্গপুর অনেক পথ, যাবে কি প্রকারে ?”

সাহেব। যে প্রকারে পারি।

রঙ্গ। নৌকা ভাড়া কর, নয় গ্রামে গিয়া ঘোড়া কেন—নয় পাল্কী কর। তোমাকে আমাদের রাণী একশত মোহর পথখরচ দিয়াছেন।

রঙ্গরাজ মোহর গণিয়া দিতে লাগিল। সাহেব পাঁচ খান মোহর লইয়া আর লইল না। বলিল, “ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। এ আমি কর্জ্জ লইলাম।”

রঙ্গরাজ। আচ্ছা, আমরা যদি তোমার কাছে আদায় করতে যাই ত শোধ দিও। আর তোমার সিপাহী যদি কেহ জখম হইয়া থাকে, তবে তাহাকে পাঠাইয়া দিও। যদি কেহ মরিয়া থাকে, তবে তাদের ওয়ারেশকে পাঠাইয়া দিও।

সাহেব। কেন ?

রঙ্গ। এমন অবস্থায় রাণী কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন।

সাহেব বিশ্বাস করিল না। ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

রঙ্গরাজ তখন পাল্কী বেহারার সন্ধানে গেল। তার প্রতি সে আদেশও ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে পথ সাফ দেখিয়া, ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে দেবীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

দেবী বলিল, “ভাল হইল, দেখা দিলে। তোমার কথা ভিন্ন আজিকার কাজ হয় না। তুমি প্রাণ রাখিতে হুকুম দিয়াছিলে, তাই প্রাণ রাখিয়াছি। দেবী মরিয়াছে, দেবী চৌধুরাণী আর নাই। কিন্তু প্রফুল্ল এখনও আছে। প্রফুল্ল থাকিবে, না দেবীর সঙ্গে যাইবে ?

ব্রজেশ্বর আদর করিয়া প্রফুল্লর মুখচুম্বন করিল। বলিল, “তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আলো হইবে। তুমি না যাও—আমি যাইব না।”

প্রফুল্ল। আমি ঘরে গেলে আমার শ্বশুর কি বলিবেন ?

ব্র। সে ভার আমার। তুমি উদ্যোগ করিয়া তাঁকে আগে পাঠাইয়া দাও। আমরা পশ্চাৎ যাইব।

প্র। পাল্কী বেহারা আনিতে গিয়াছে।

পাল্কী বেহারা শীঘ্রই আসিল। হরবল্লভও সন্ধ্যাহ্নিক সংক্ষেপে সারিয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, নিশি ঠাকুরাণী ক্ষীর, ছানা, মাখন ও উত্তম সুপক্ক আম্র, কদলী প্রভৃতি ফল তাঁহার জলযোগের জন্য সাজাইতেছে। নিশি অনুনয় বিনয় করিয়া, তাঁহাকে জলযোগে বসাইল। বলিল, "এখন আপনি আমার কুটুম্ব হইলেন ; জলযোগ না করিয়া যাইতে পারিবেন না।"

হরবল্লভ জলযোগে না বসিয়া বলিল, "ব্রজেশ্বর কোথায় ? কাল রাত্রে বাহিরে উঠিয়া গেল—আর তাকে দেখি নাই।"

নিশি। তিনি আমার ভগিনীপতি হইবেন—তাঁর জন্য ভাবিবেন না। তিনি এইখানেই আছেন—আপনি জলযোগে বসুন, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। সেই কথাটা তাঁকে বলিয়া যাউন।

হরবল্লভ জলযোগে বসিলেন। নিশি ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ভিতরের কামরা হইতে ব্রজেশ্বর বাহির হইল দেখিয়া উভয়ে কিছু অপ্রতিভ হইলেন। হরবল্লভ ভাবিলেন, আমার চাঁদপানা ছেলে দেখে, ডাকিনী বেটিরা ভুলে গিয়েছে। ভালই।

ব্রজেশ্বরকে হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু হে, তুমি যে এখানে কি প্রকারে আসিলে, আমি ত তা এখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। তা যাক্—সে এখনকার কথা নয়, সে কথা পরে হবে। এক্ষণে আমি একটু অনুরোধে পড়েছি—তা অনুরোধটা রাখিতে হইবে। এই ঠাকুরাণীটি সৎকুলীনের মেয়ে—ওঁর বাপ আমাদেরই পালটি—তা ওঁর একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—পাত্র পাওয়া যায় না—কুল যায়। তা কুলীনের কুলরক্ষা কুলীনেরই কাজ—মুটে মজুরের ত কাজ নয়। আর তুমিও পুনর্ব্বার সংসার কর, সেটাও আমার ইচ্ছা বটে, তোমার গর্ভধারিণীরও ইচ্ছা বটে। বিশেষ বড় বউমাটির পরলোকের পর থেকে আমরা কিছু এ বিষয়ে কাতর আছি। তাই বল্‌ছিলাম, যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন এ কর্ত্তব্যই হয়েছে। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এঁর ভগিনীকে বিবাহ কর।"

ব্রজেশ্বর মোটের উপর বলিল, "যে আজ্ঞা।"

নিশির বড় হাসি পাইল, কিন্তু হাসিল না। হরবল্লভ বলিতে লাগিলেন, 'তা আমার

পাল্কী বেহারা এসেছে, আমি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করি। তুমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করে বৌ নিয়ে বাড়ী যেও।"

ব্র। যে আজ্ঞা।

হর। তা তোমায় আর বলিব কি, তুমি ছেলেমানুষ নও—কুল, শীল, জাতি, মর্য্যাদা, সব আপনি দেখেশুনে বিবাহ করবে। (পরে একটু আওয়াজ খাটো করিয়া বলিতে লাগিলেন) আর আমাদের যেটা ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা, তাও ত জান?

ব্রজ। যে আজ্ঞা।

হরবল্লভ জলযোগ সমাপন করিয়া বিদায় হইলেন। ব্রজ ও নিশি তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি পাল্কীতে চড়িয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুর্গানাম করিয়া প্রাণ পাইলেন। ভাবিলেন, "ছেলেটি ডাকিনী বেটিদের হাতে রহিল—তা ভয় নাই। ছেলে আপনার পথ চিনিয়াছে। চাঁদমুখের সর্ব্বত্র জয়।"

হরবল্লভ চলিয়া গেলে, ব্রজেশ্বর নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি ছল? তোমার ছোট বোন্ কে?"

নিশি। চেন না? তার নাম প্রফুল্ল।

ব্রজ। ওহো বুঝিয়াছি। কি রকমে এ সম্বন্ধে কর্ত্তাকে রাজি করিলে?

নিশি। মেয়েমানুষের অনেক রকম আছে। ছোট বোনের শাশুড়ী হইতে নাই, নহিলে আরও একটা সম্বন্ধে তাঁকে রাজি করিতে পারিতাম।

দিবা রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি শীগ্‌গির মর। লজ্জা সরম কিছুই নাই? পুরুষমানুষের সঙ্গে কি অমন করে কথা কহিতে হয়?"

নিশি। কে আবার পুরুষমানুষ? ব্রজেশ্বর? কাল দেখা গিয়াছে—কে পুরুষ, কে মেয়ে।

ব্র। আজিও দেখিবে। তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত মোটা বুদ্ধির কাজ করিয়াছ। কাজটা ভাল হয় নাই।

নিশি। সে আবার কি?

ব্র। বাপের সঙ্গে প্রবঞ্চনা চলে? বাপের চোখে ধূলা দিয়া, মিছে কথা বহাল রাখিয়া, আমি স্ত্রী লইয়া সংসার করিব? যদি বাপকে ঠকাইলাম, তবে পৃথিবীতে কার কাছে জুয়াচুরি করিতে আমার আটকাইবে?

নিশি অপ্রতিভ হইল, মনে মনে স্বীকার করিল ব্রজেশ্বর পুরুষ বটে। কেবল লাঠিবাজিতে পুরুষ হয় না, নিশি তা বুঝিল। বলিল, "এখন উপায়।"

ব্র। উপায় আছে। চল, প্রফুল্লকে লইয়া ঘরে যাই। সেখানে গিয়া বাপকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিব। লুকাচুরি হইবে না।

নিশি। তাহা হইলে তোমার বাপ কি দেবী চৌধুরাণীকে বাড়ীতে উঠিতে দিবেন ?

দেবী বলিল, "দেবী চৌধুরাণী কে ? দেবী চৌধুরাণী মরিয়াছে, তার নাম এ পৃথিবীতে মুখেও আনিও না। প্রফুল্লের কথা বল।"

নিশি। প্রফুল্লকেই কি তিনি ঘরে স্থান দিবেন ?

ব্র। আমি ত বলিয়াছি, সে ভার আমার।

প্রফুল্ল সন্তুষ্ট হইল। বুঝিয়াছিল যে, ব্রজেশ্বরের ভার বহিবার ক্ষমতা না থাকিলে, সে ভার লইবার লোক নহে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তখন ভূতনাথে যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। রঙ্গরাজকে সেইখান হইতে বিদায় দিবার কথা স্থির হইল। কেন না, ব্রজেশ্বরের দ্বারবানেরা একদিন তাহার লাঠি খাইয়াছিল, যদি দেখিতে পায়, তবে চিনিবে। রঙ্গরাজকে ডাকিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল, কতক নিশি বুঝাইল, কতক প্রফুল্ল নিজে বুঝাইল। রঙ্গরাজ কাঁদিল—বলিল, "মা, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন, তা ত কখনও জানিতাম না।" সকলে মিলিয়া রঙ্গরাজকে সান্ত্বনা করিল। দেবীগড়ে প্রফুল্লের ঘর বাড়ী, দেবসেবা, দেবত্র সম্পত্তি ছিল। সে সকল প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে দিলেন, বলিলেন, "সেইখানে গিয়া বাস কর। দেবতার ভোগ হয়, প্রসাদ খাইয়া দিনপাত করিও। আর কখনও লাঠি ধরিও না। তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন। ঠেঙ্গা লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন—তুমি আমি কে ? শিষ্টের পালনের ভার লইও—কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও। এই সকল কথাগুলি আমার পক্ষ হইতে ভবানীঠাকুরকেও বলিও ; তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও।"

রঙ্গরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইল। দিবা ও নিশি সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের ঘাট পর্য্যন্ত চলিল। সেই বজরায় ফিরিয়া তাহারা দেবীগড়ে গিয়া বাস করিবে, প্রসাদ খাইবে আর হরিনাম করিবে। বজরায় দেবীর রাণীগিরির আসবাব সব

ছিল, পাঠক দেখিয়াছেন। তাহার মূল্য অনেক টাকা। প্রফুল্ল সব দিবা ও নিশিকে দিলেন। বলিলেন, "এ সকল বেচিয়া যাহা হইবে, তাহার মধ্যে তোমাদের যাহা প্রয়োজন, ব্যয় করিবে। বাকী দরিদ্রকে দিবে। এ সকল আমার কিছুই নয়—আমি ইহার কিছুই লইব না।" এই বলিয়া প্রফুল্ল আপনার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারগুলি নিশি ও দিবাকে দিলেন।

নিশি বলিল, "মা! নিরাভরণে শ্বশুরবাড়ী উঠিবে?"

প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকের এই আভরণ সকলের ভাল। আর আভরণে কাজ কি, মা?"

নিশি বলিল, "আজ তুমি প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছ; আমি আজ তোমাকে কিছু যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিব। তুমি মানা করিও না, এই আমার শেষের সাধ—সাধ মিটাইতে দাও।"

এই বলিয়া নিশি কতকগুলি বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে প্রফুল্লকে সাজাইতে লাগিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, নিশি যখন এক রাজমহিষীর কাছে থাকিত, রাজমহিষী তাহাকে অনেক অলঙ্কার দিয়াছিলেন। এ সেই গহনা। দেবী তাহাকে নূতন গহনা দিয়াছিলেন বলিয়া সেগুলি নিশি পরিত না। এক্ষণে দেবীকে নিরাভরণা দেখিয়া সেইগুলি পরাইল। তারপর আর কোন কাজ নাই, কাজেই তিনজনে কাঁদিতে বসিল। নিশি গহনা পরাইবার সময়েই সুর তুলিয়াছিল; দিবা তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরিলেন। তারপর পোঁ সানাই ছাপাইয়া উঠিল। প্রফুল্লও কাঁদিল—না কাঁদিবার কথা কি? তিনজনের আন্তরিক ভালবাসা ছিল; কিন্তু প্রফুল্লের মন সুখে ভরা; নিশিও সে সুখে সুখী হইল, কান্নায় সেও একটু নরম গেল। সে বিষয়ে যাহার যে ত্রুটি হইল, দিবা ঠাকুরাণী তাহা সারিয়া লইলেন।

যথাকালে বজরা ভূতনাথের ঘাটে পৌঁছিল। সেইখানে দিবা ও নিশির পায়ের ধূলা লইয়া, প্রফুল্ল তাহাদিগের কাছে বিদায় লইল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বজরায় ফিরিয়া যথাকালে দেবীগড়ে পৌঁছিল। দাঁড়ি মাঝি বরকন্দাজের বেতন হিসাব করিয়া দিয়া, তাহাদের জবাব দিল। বজরাখানি রাখা অকর্ত্তব্য—চেনা বজরা। প্রফুল্ল বলিয়া দিয়াছিল, "উহা রাখিও না।' নিশি বজরাখানাকে চেলা করিয়া তুই বৎসর ধরিয়া পোড়াইল।

এই চেলা কাঠের উপঢৌকন দিয়া পাঠকমহাশয় নিশি ঠাকুরাণীর কাছে বিদায় লউন। অনুপযুক্ত হইবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভূতনাথের ঘাটে প্রফুল্লের বজরা ভিড়িবামাত্র, কে জানে কোথা দিয়া, গ্রামময় রাষ্ট্র হইল যে, ব্রজেশ্বর আবার একটা বিয়ে করে এনেছে ; বড় না কি ধেড়ে বৌ। সুতরাং ছেলে বুড়ো, কাণা খোঁড়া যে যেখানে ছিল, সব বৌ দেখিতে ছুটিল। যে রাঁধিতেছিল, সে হাঁড়ি ফেলিয়া ছুটিল ; যে মাছ কুটিতেছিল, সে মাছে চুপড়ি চাপা দিয়া ছুটিল ; যে স্নান করিতেছিল, সে ভিজে কাপড়ে ছুটিল। যে খাইতে বসিয়াছিল, তার আধপেটা বৈ খাওয়া হইল না। যে কোন্দল করিতেছিল, শত্রুপক্ষের সঙ্গে হঠাৎ তার মিল হইয়া গেল। যে মাগী ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিল, তার ছেলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল, মার কোলে উঠিয়া ধেড়ে বৌ দেখিতে চলিল। কাহারও স্বামী আহারে বসিয়াছেন, পাতে ডাল তরকারী পড়িয়াছে, মাছের ঝোল পড়ে নাই, এমন সময়ে বৌয়ের খবর আসিল, আর তাঁর কপালে সেদিন মাছের ঝোল হইল না। এইমাত্র বুড়ী নাতিনীর সঙ্গে কাজিয়া করিতেছিল যে, "আমার হাত ধরিয়া না নিয়ে গেলে, আমি কেমন করে পুকুরঘাটে যাই ?" এমন সময় গোল হইল—বৌ এসেছে, অমনি নাতিনী আয়ি ফেলিয়া বৌ দেখিতে গেল, আয়িও কোন রকমে সেইখানে উপস্থিত। এক যুবতী মার কাছে তিরস্কার খাইয়া শপথ করিতেছিলেন যে, তিনি কখন বাহির হন না, এমন সময়ে বৌ আসার সংবাদ পৌঁছিল, শপথটা সম্পূর্ণ হইল না ; যুবতী বৌয়ের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। মা শিশু ফেলিয়া ছুটিল, শিশু মার পিছু পিছু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল। ভাশুর, স্বামী বসিয়া আছে, ভ্রাতৃবধূ মানিল না, ঘোমটা টানিয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ছুটিতে যুবতীদের কাপড় খসিয়া পড়ে, আঁটিয়া পরিবার অবকাশ নাই। চুল খুলিয়া পড়ে, জড়াইবার অবকাশ নাই। সামলাইতে কোথাকার কাপড় কোথায় টানেন, তারও বড় ঠিক নাই। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লজ্জায় লজ্জাদেবী পলায়ন করিলেন।

বর-কন্যা আসিয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াছে, গিন্নী বরণ করিতেছেন। বৌয়ের মুখ দেখিবার জন্য লোকে ঝুঁকিয়াছে, কিন্তু বৌ বৌগিরির চাল ছাড়ে না, দেড় হাত ঘোমটা টানিয়া রাখিয়াছে, কেহ মুখ দেখিতে পায় না। শাশুড়ী বরণ করিবার সময়ে একবার ঘোমটা খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন। একটু চমকিয়া উঠিলেন, আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "বেশ বউ।" তাঁর চোখে একটু জল আসিল!

বরণ হইয়া গেলে, বধূ ঘরে তুলিয়া শাশুড়ী সমবেত প্রতিবাসিনীদিগকে বলিলেন,

"মা! আমার বেটা বউ অনেক দূর থেকে আসিতেছে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। আমি এখন ওদের খাওয়াই দাওয়াই। ঘরের বউ ত ঘরেই রহিল, তোমরা নিত্য দেখ্‌বে; এখন ঘরে যাও, খাও দাও গিয়া।"

গিন্নীর এই বাক্যে অপ্রসন্ন হইয়া নিন্দা করিতে করিতে প্রতিবাসিনীরা ঘরে গেল। দোষ গিন্নীর, কিন্তু নিন্দাটা বধূরই অধিক হইল; কেন না, বড় কেহ মুখ দেখিতে পায় নাই। ধেড়ে মেয়ে বলিয়া সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিল। আবার সকলেই বলিল, "কুলীনের ঘরে অমন ঢের হয়।" তখন যে যেখানে কুলীনের ঘরে বুড়ো বৌ দেখিয়াছে, তার গল্প করিতে লাগিল। গোবিন্দ মুখুয্যা পঞ্চান্ন বৎসরের একটা মেয়ে বিয়ে করিয়াছিল, হরি চাটুয্যা সত্তর বৎসরের এক কুমারী ঘরে আনিয়াছিলেন, মন্থু বাঁড়ুয্যা একটি প্রাচীনার অন্তর্জলে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সকল আখ্যায়িকা সালঙ্কারে পথিমধ্যে ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। এইরূপ আন্দোলন করিয়া ক্রমে গ্রাম ঠাণ্ডা হইল।

গোলমাল মিটিয়া গেল; গিন্নী বিরলে ব্রজেশ্বরকে ডাকিলেন। ব্রজ আসিয়া বলিল, "কি মা?"

গিন্নী। বাবা, এ বৌ কোথা পেলে, বাবা?

ব্রজ। এ নূতন বিয়ে নয়, মা!

গিন্নী। বাবা, এ হারাধন আবার কোথায় পেলে, বাবা?

গিন্নীর চোখে জল পড়িতেছিল।

ব্রজ। মা, বিধাতা দয়া করিয়া আবার দিয়াছেন। এখন মা, তুমি বাবাকে কিছু বলিও না। নির্জ্জনে পাইলে আমি সকলই তাঁর সাক্ষাতে প্রকাশ করিব।

গিন্নী। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, বাপ, আমিই সব বলিব। বৌভাতটা হইয়া যাক্। তুমি কিছু ভাবিও না। এখন কাহারও কাছে কিছু বলিও না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। এ কঠিন কাজের ভার মা লইলেন। ব্রজ বাঁচিল। কাহাকে কিছু বলিল না।

পাকস্পর্শ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। বড় ঘটা পটা কিছু হইল না, কেবল জনকতক আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া হরবল্লভ কার্য্য সমাধা করিলেন।

পাকস্পর্শের পর গিন্নী আসল কথাটা হরবল্লভকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। বলিলেন যে, "এ নূতন বিয়ে নয়—সেই বড় বউ।"

হরবল্লভ চমকিয়া উঠিল—সুপ্ত ব্যাঘ্রকে কে যেন বাণে বিঁধিল। "অ্যাঁ, সেই বড় বউ—কে বল্লে?"

গিন্নী। আমি চিনেছি। আর ব্রজও আমাকে বলিয়াছে।

হর। সে যে দশ বৎসর হলো ম'রে গেছে।

গিন্নী। মরা মানুষেও কখন ফিরে থাকে ?

হর। এতদিন সে মেয়ে কোথায় কার কাছে ছিল ?

গিন্নী। তা আমি ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসাও করিব না। ব্রজ যখন ঘরে আনিয়াছে, তখন না বুঝিয়া সুঝিয়া আনে নাই।

হর। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গিন্নী। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। তুমি একবার কথা কহিয়াছিলে, তার ফলে আমার ছেলে আমি হারাইতে বসিয়াছিলাম। আমার একটি ছেলে। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। যদি তুমি কোন কথা কহিবে, তবে আমি গলায় দড়ি দিব।

হরবল্লভ এতটুকু হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। কেবল বলিলেন, "তবে লোকের কাছে নূতন বিয়ের কথাটাই প্রচার থাক্।"

গিন্নী বলিলেন, "তাই থাকিবে।"

সময়ান্তরে গিন্নী ব্রজেশ্বরকে সুসংবাদ জানাইলেন। বলিলেন, "আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম। তিনি কোন কথা কহিবেন না। সে সব কথার আর কোন উচ্চবাচ্যে কাজ নাই।"

ব্রজ হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্লকে খবর দিল।

আমরা স্বীকার করি, গিন্নী এবার বড় গিন্নীপনা করিয়াছেন। যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি ?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল সাগরকে দেখিতে চাহিল। ব্রজেশ্বরের ইঙ্গিত পাইয়া গিন্নী সাগরকে আনিতে পাঠাইলেন। গিন্নীরও সাধ, তিনটি বৌ একত্র করেন।

যে লোক সাগরকে আনিতে গিয়াছিল, তাহার মুখে সাগর শুনিল, স্বামী আর একটা বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন—বুড়ো মেয়ে। সাগরের বড় ঘৃণা হইল। ছি! বুড়ো মেয়ে!" বড় রাগ হইল, "আবার বিয়ে ?—আমরা কি স্ত্রী নই ?" দুঃখ হইল,

"হায়! বিধাতা কেন আমায় দুঃখীর মেয়ে করেন নাই—আমি কাছে থাকিতে পারিলে, তিনি হয় ত আর বিয়ে করিতেন না।"

এইরূপ রুষ্ট ও ক্ষুণ্ণভাবে সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিল। আসিয়াই প্রথমে নয়ান বৌয়ের কাছে গেল। নয়ান বৌ, সাগরের দুই চক্ষের বিষ; সাগর বৌ, নয়ানেরও তাই। কিন্তু আজ দুইজন এক, দুইজনের এক বিপদ্। তাই ভাবিয়া সাগর আগে নয়নতারার কাছে গেল।

সাপকে হাঁড়ির ভিতর পুরিলে, সে যেমন গর্জ্জিতে থাকে, প্রফুল্ল আসা অবধি নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল। একবার মাত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—গালির চোটে ব্রজেশ্বর পলাইল, আর আসিল না। প্রফুল্ল ভাব করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তারও সেই দশা ঘটিল। স্বামী সপত্নী দূরে থাক্, পাড়াপ্রতিবাসীও সে কয়দিন নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। নয়নতারার কতকগুলি ছেলে মেয়ে হইয়াছিল। তাদেরই বিপদ্ বেশী। এ কয়দিন মার খাইতে খাইতে তাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

সেই দেবীর শ্রীমন্দিরে প্রথম সাগর গিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া নয়নতারা বলিল, "এসো, এসো! তুমি বাকী থাক কেন? আর ভাগীদার কেউ আছে?"

সাগর। কি! আবার না কি বিয়ে করেছে?

নয়ন। কে জানে, বিয়ে কি নিকে, তার খবর আমি কি জানি?

সাগর। বামনের মেয়ের কি আবার নিকে হয়?

নয়ন। বামন, কি শূদ্র, কি মুসলমান, তা কি আমি দেখ্‌তে গেছি?

সাগর। অমন কথাগুলো মুখে এনো না। আপনার জাত বাঁচিয়ে সবাই কথা কয়।

নয়ন। যার ঘরে অত বড় কনে বৌ এলো, তার আবার জাত কি?

সাগর। কত বড় মেয়ে? আমাদের বয়স হবে?

নয়ন। তোর মার বয়সী।

সাগর। চুল পেকেছে?

নয়ন। চুল না পাক্‌লে আর রাত্রি দিন বুড়ো মাগী ঘোম্‌টা টেনে বেড়ায়?

সাগর। দাঁত পড়েছে?

নয়ন। চুল পাক্‌লো, দাঁত আর পড়ে নি?

সাগর। তবে স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় বল?

নয়ন। তবে শুন্‌চিস কি?

সাগর। তাও কি হয় ?

নয়ন। কুলিনের ঘরে এ সব হয়।

সাগর। দেখতে কেমন ?

নয়ন। রূপের ধ্বজা! যেন গালফুলো গোবিন্দের মা।

সাগর। যে বিয়ে ক'রেছে, তাকে কিছু বল নি ?

নয়ন। দেখ্‌তে পাই কি ? দেখ্‌তে পেলে হয়। মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি।

সাগর। আমি তবে সে সোনার প্রতিমাখানা দেখে আসি।

নয়ন। যা, জন্ম সার্থক কর্‌গে, যা।

নূতন সপত্নীকে খুঁজিয়া, সাগর তাহাকে পুকুরঘাটে ধরিল। প্রফুল্ল পিছন ফিরিয়া বাসন মাজিতেছিল? সাগর পিছনে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তুমি আমাদের নূতন বৌ ?"

"কে, সাগর এয়েছ ?" বলিয়া নূতন বৌ সমুখ ফিরিল।

সাগর দেখিল, কে ? বিস্ময়াপন্না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেবী রাণী ?"

প্রফুল্ল বলিল, "চুপ্‌! দেবী মরিয়া গিয়াছে !"

সা। প্রফুল্ল ?

প্র। প্রফুল্লও মরিয়াছে।

সা। কে তবে তুমি ?

প্র। আমি নূতন বৌ।

সা। কেমন ক'রে কি হলো, আমায় সব বল দেখি।

প্র। এখানে বলিবার জায়গা নয়। আমি একটি ঘর পাইয়াছি, সেইখানে চল, সব বলিব।

দুইজনে দ্বার বন্ধ করিয়া, বিরলে বসিয়া, কথোপকথন হইল। প্রফুল্ল সাগরকে সব বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে ? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রাণীগিরির পর কি বাসন-মাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা, পারির মার হুকুম-বর্দারি কি তার ভাল লাগিবে ?"

প্র। ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের

নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।

সা। তবে কিছুদিন আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার চেলা হইব।

যখন সাগরের সঙ্গে প্রফুল্লের এই কথা হইতেছিল, তখন ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে ব্রজেশ্বর ভোজনে বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেজ, এখন কেমন রাঁধি?"

ব্রজেশ্বরের সেই দশ বছরের কথা মনে পড়িল। কথাগুলি মূল্যবান্—তাই দুই জনেরই মনে ছিল।

ব্রজ বলিল, "বেশ।"

ব্রহ্ম। এখন গোরুর দুধ কেমন? বেগড়ায় কি?

ব্রজ। বেশ্ দুধ।

ব্রহ্ম। কই, দশ বৎসর হলো—আমায় ত গঙ্গায় দিলি না?

ব্রজ। ভুলে গিয়েছিলেম।

ব্রহ্ম। তুই আমায় গঙ্গায় দিস্ নে। তুই বাগ্দী হয়েছিস্।

ব্রজ। ঠান্‌দিদি! চুপ। ও কথা না।

ব্রহ্ম। তা দিস্, পারিস্ ত গঙ্গায় দিস্। আমি আর কথা কব না। কিন্তু ভাই, কেউ যেন আমার চর্‌কা টর্‌কা ভাঙ্গে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল সংসারের সকলকে সুখী করিল। শাশুড়ী প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষ প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সে কাজ তাঁর ভাল লাগিত না। শ্বশুর শাশুড়ী প্রফুল্লকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করিত না, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার উপর তাহাদের এতটাই শ্রদ্ধা হইল। ব্রহ্মঠাকুরাণীও রান্নাঘরের কর্ত্তৃত্ব প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিলেন। বুড়ী আর বড় রাঁধিতে পারে না, তিন বৌ রাঁধে; কিন্তু যেদিন প্রফুল্ল দুই একখানা না রাঁধিত, সেদিন কাহারও

অন্ন ব্যঞ্জন ভাল লাগিত না। যাহার ভোজনের কাছে প্রফুল্ল না দাঁড়াইত, সে মনে করিত, আধপেটা খাইলাম। শেষ নয়ান বৌও বশীভূত হইল। আর প্রফুল্লের সঙ্গে কোন্দল করিতে আসিত না। বরং প্রফুল্লের ভয়ে আর কাহারও সঙ্গে কোন্দল করিতে সাহস করিত না। প্রফুল্লের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ করিত না। দেখিল, নয়নতারার ছেলেগুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সাগর বাপের বাড়ী অধিক দিন থাকিতে পারিল না।—আবার আসিল। প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।

এ সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোনা হইত। প্রফুল্ল ভবানীঠাকুরের শাণিত অস্ত্র—সংসার-গ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। অথচ কেহই হরবল্লভের গৃহে জানিতে পারিল না যে, প্রফুল্ল এমন শাণিত অস্ত্র। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত—সে কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর-পরিচয়ও আছে। গৃহধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়। যেখানে বিদ্যা প্রকাশের স্থান নহে, সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সেই মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।

প্রফুল্লের যাহা কিছু বিবাদ, সে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে। প্রফুল্ল বলিত, "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ-দখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতি দেবতা; তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায় না কেন?" ব্রজেশ্বর তা শুনিত না। ব্রজেশ্বরের হৃদয় কেবল প্রফুল্লময়। প্রফুল্ল বলিত, "আমায় যেমন ভালবাস, উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি।" ব্রজেশ্বর তা বুঝিত না।

প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সদ্বিবেচনার গুণে, সংসারের বিষয়কর্ম্মও তাহার হাতে আসিল। তালুক মুলুকের কাজ বাহিরে হইত বটে, কিন্তু একটু কিছু বিবেচনার কথা উঠিলে, কর্ত্তা আসিয়া গিন্নীকে বলিতেন, "নূতন বৌমাকে

জিজ্ঞাসা কর দেখি, তিনি কি বলেন?" প্রফুল্লের পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া, দিন দিন লক্ষ্মী-শ্রী বাড়িতে লাগিল। শেষ যথাকালে ধন, জন ও সর্ব্বসুখে পরিবৃত হইয়া হরবল্লভ পরলোক গমন করিলেন।

বিষয় ব্রজেশ্বরের হইল। প্রফুল্লের গুণে ব্রজেশ্বরের নূতন তালুক মুলুক হইয়া হাতে অনেক নগদ টাকা জমিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমার সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ শোধ কর।"

ব্র। কেন, তুমি টাকা লইয়া কি করিবে?

প্র। আমি কিছু করিব না। কিন্তু টাকা আমার নয়—শ্রীকৃষ্ণের;—কাঙ্গাল গরিবের। কাঙ্গাল গরিবকে দিতে হইবে।

ব্র। কি প্রকারে।

প্র। পঞ্চাশ হাজার টাকায় এক অতিথিশালা কর।

ব্রজেশ্বর তাই করিল। অতিথিশালা মধ্যে এক অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, অতিথিশালার নাম দিল, "দেবীনিবাস।"

যথাকালে পুত্র-পৌত্রে সমাবৃত হইয়া, প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। দেশের লোক সকলেই বলিল, " আমরা মাতৃহীন হইলাম।"

রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি, দেবীগড়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদভোজনে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া, পরলোকে গমন করিলেন। ভবানীঠাকুরের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিল না।

ইংরেজ রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানীঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানীঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।

তখন ভবানীঠাকুর মনে করিল, "আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।" এই ভাবিয়া ভবানীঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।" ভবানীপাঠক প্রফুল্লচিত্তে দীপান্তরে গেল।

এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, "আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্যমাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

পরিশেষ

টীকা

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের প্রকাশ কাল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৮২ হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তিনখানি উপন্যাস রচনা করেন। এই তিনখানি উপন্যাস হইল—আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭)। শেষজীবনে যে 'অনুশীলনতত্ত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান ভাবনার বিষয় ছিল—তাহাকে সহজভাবে সর্বসাধারণের কাছে প্রচার করিবার জন্য উপন্যাসকেই প্রধান বাহন রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম-উপন্যাস-ত্রয়ী তাঁহার 'অনুশীলনতত্ত্ব' প্রচারের 'যন্ত্র' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে উপন্যাসগুলির মধ্যে অনুশীলনতত্ত্ব কতখানি সার্থক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—সে বিচার পরের কথা।

আমাদের আলোচ্য 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসকে উক্ত অনুশীলনতত্ত্ব প্রচারের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বলা যায়। প্রফুল্ল নামক একজন অসহায় দরিদ্র নিষ্পাপ কুলবঁধূর শ্বশুর-গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া কি ভাবে দেবী চৌধুরাণী নামে ডাকাতের দলের নেত্রী হইল এবং পরিশেষে আবার কেমন করিয়া সে 'দেবী চৌধুরাণী' হইতে প্রফুল্লতে পরিণত হইয়া শ্বশুরের গৃহে প্রবেশাধিকার পাইল—তাহাই 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে সার্থক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের অনিশ্চিত রাজনীতিক ও আর্থনীতিক পরিবেশকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ে মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ বণিকরাজের হাতে বাংলা-বিহার ও ওড়িষ্যার শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু তখন শাসনের নামে কুশাসনই চলিতেছে। আইন বলিয়া কিছুই নাই—সবই 'বে-আইন'।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসখানির কাহিনী তিন খণ্ডে বর্ণিত। প্রথম খণ্ডে ষোলটি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় খণ্ডে বারোটি পরিচ্ছেদ এবং তৃতীয় খণ্ডে চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ, মোট বিয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদে উপন্যাসের কাহিনী দ্রুত নাটকীয় গতিতে সার্থক পরিণতি লাভ করিয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর দেশের অরাজক অবস্থা, জমিদার-ইজারাদারদের অত্যাচার, নির্বাধ দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি তখন বাংলা দেশে যে বিশৃঙ্খল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসখানিতে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই সঙ্গে 'অনুশীলনতত্ত্ব' তো আছেই।

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের মূল বক্তব্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া—অনেকের মতে কাহিনীর "দুর্বলগ্রন্থিগুলি" বড়ই "পীড়াদায়ক" হইয়াছে। লেখকের অনেক বর্ণনা 'ওস্তাদি' দেখানোর প্রয়াস বলিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছে। কাহিনী গ্রহণ, চরিত্র চিত্রণ অত্যন্ত 'অবাস্তব' ও 'অবিশ্বাস্য' বলিয়া বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, এই সকল মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য বুঝিতে না পারারই ফল। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস আলোচনা করিতে গেলে উপন্যাসের রসরূপ, মানবজীবন রহস্য এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিম-প্রবর্তিত অনুশীলন তত্ত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রফুল্লের অনুশীলিত 'দেবী চৌধুরাণী' চরিত্র কেন শেষরক্ষা করিতে পারিল না—অনুশীলন ধর্মের জন্য ব্যক্তি বা ক্ষেত্র এবং কাল প্রস্তুত কিনা—তাহাও বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে কেবল গল্পই বলেন নাই। সেই সঙ্গে মানব-জীবন ও জগতের নানা সমস্যা, নানা ভাবনা পাঠক সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'র বিভিন্ন খণ্ডগুলি আলোচনা করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

প্রথম খণ্ড

প্রথম খণ্ডে ষোলটি পরিচ্ছেদ। ষোলটি পরিচ্ছেদে দশ বৎসরের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। প্রফুল্ল ও তাহার মাতার কঠোর দারিদ্র্য, হরবল্লভের গৃহ হইতে প্রফুল্লর চলিয়া আসা, তাহার মাতার মৃত্যু, প্রফুল্ল-হরণ, অরণ্যে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজির নিকট হইতে অর্থলাভ, ভবানী পাঠকের সঙ্গে প্রফুল্লর সাক্ষাৎ, তারপরে ভবানীর কাছে তাঁহার ধর্ম ও কর্ম শিক্ষা প্রভৃতি ঘটনাস্রোতে দশ বৎসর কাটিয়া গেল।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের কাহিনী যে যুগ পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে—যে বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তাহা বিধৃত, তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি কোনো স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ রচনা করেন নাই। কাহিনীর মধ্যেই তিনি যুগ চিত্রটি তুলিয়া ধরিয়াছেন।

প্রথম খণ্ডে পলাশীর যুদ্ধের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরের বাংলার এক প্রান্তের একটি ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তখন মুসলমান রাজত্ব শেষ হইয়াছে—ইংরাজ রাজত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা ও রাজত্বের কাল। দেশের সর্বত্র জমিদার ইজারাদারদের অত্যাচার চলিতেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের আর্থনীতিক ভিত্তি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। দরিদ্রের উপর ধনীর নির্মম

অত্যাচারে সমগ্র দেশ কলুষিত। দেশের নানা অঞ্চলে দস্যুদলের লুঠতরাজ চলিতেছে। এই রকম অরাজক পরিবেশে 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের প্রফুল্লর কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের ঘটনাবস্তু সংক্ষেপ এই—

উত্তরবঙ্গের রংপুরের কাছে ভূতনাথ নামে একটি গ্রামে হরবল্লভ রায় নামে এক জমিদার ছিলেন। তাঁহার পুত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে দুর্গাপুর গ্রামের দরিদ্রা বিধবার কন্যা প্রফুল্লর বিবাহ হয়। প্রফুল্ল পরমা সুন্দরী ছিল। বড়ো ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে গিয়া প্রফুল্লের মাতা—বরযাত্রীদের খুসি করিবার জন্য লুচি, মিঠাই, মণ্ডা খাওয়াইলেন। তাতেই যথাসর্বস্ব ব্যয় হওয়াতে গ্রামের লোকের আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি রহিয়া গেল। ইহাতে তাহারা অপমান বোধ করিয়া কেহই অনুষ্ঠানে আহারাদি করিল না। উপরন্তু হরবল্লভের কাছে প্রফুল্লর মায়ের চরিত্র সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিল। হরবল্লভ তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া পুত্রবধূকে ত্যাগ করিলেন। ব্রজেশ্বরের পুনরায় দুইবার বিবাহ দিয়া আরও দুইজন পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন। ইহাদের একজনের নাম 'নয়ান বউ', অন্যজনের নাম 'সাগর বউ'।

প্রফুল্ল ও তাহার মাতা দুর্গাপুরেই থাকে। তাহাদের প্রায়ই অর্ধাসনে অনশনে দিন কাটে। অভাব-দারিদ্র্য যখন তীব্র আকার ধারণ করিল, তখন প্রফুল্ল নিজেই আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প লইয়া শ্বশুরালয়ে গেল। প্রফুল্লকে দেখিয়া ব্রজেশ্বরের মাতার সহানুভূতি জাগিলেও হরবল্লভের মন নরম হইল না। তিনি 'বাগ্দী বেটিকে ঝাঁটা' মারিয়া বিদায় করিবার জন্য ব্রজেশ্বরকে আদেশ করিলেন। প্রফুল্ল সাগর বউ-এর চেষ্টায় স্বামিসঙ্গ লাভ করিল। পরদিন যাইবার পূর্বে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে সাময়িক অভাব মিটাইবার জন্য নিজের আংটিটি দিল এবং পরে অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া প্রফুল্লর ভরণপোষণ করিবার আশ্বাস দিল। প্রফুল্ল স্বামিপ্রদত্ত আংটি কখনও হাত ছাড়া করিবে না বলিয়া ব্রজেশ্বরের কাছ হইতে বিদায় লইল। প্রফুল্ল কি করিয়া দিন কাটাইবে তাহা শাশুড়ীর মারফৎ শ্বশুরের কাছে জানিতে চাহিয়াছিল। নয়ান-বউ তাহাকে জানাইল যে শ্বশুর মহাশয় তাহাকে চুরি-ডাকাতি করিয়া নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। প্রফুল্ল 'দেখা যাবে' বলিয়া সাগরের সঙ্গে তাহার বাপের বাড়ীতে দেখা করিবার কথা দিয়া দুর্গাপুরে ফিরিয়া আসিল।

দেশে ফিরিয়া প্রফুল্লর মা জ্বরে পড়িয়া কিছুদিন দুঃসহ রোগ ভোগ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। প্রফুল্লর দুঃসময়ে গ্রামের লোক পূর্ব বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া তাহার সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিল। তাহার মাতার শ্রাদ্ধের সময় গ্রামের লোক

হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিল। প্রফুল্লর মাতার যে কলঙ্ক রটনা করা হইয়াছিল তাহাও মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিল। কিন্তু হরবল্লভ তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি মনে করিলেন নিশ্চয়ই প্রফুল্লর নিকট টাকা খাইয়া এইরূপ বলিতেছে। তিনি তাহার প্রতি আরও বিরূপ হইলেন। ব্রজেশ্বর একদিন রাত্রে লুকাইয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিবে বলিয়া স্থির করিল।

মাতার শ্রাদ্ধাদির সময়ে গ্রামবাসীরা প্রফুল্লকে নানাভাবে সাহায্য করিল। এদিকে মাতার মৃত্যুর পর ঘরে একা বাস করিবার নানারূপ অসুবিধা দেখা দেওয়ায় প্রফুল্ল তাহার প্রতিবেশী যুবতী বিধবা ফুলমণি নাপিতানীকে তাহার ঘরে রাত্রে থাকিতে অনুরোধ করিল। ফুলমণি রাত্রে প্রফুল্লর ঘরে আসিয়া থাকিত। ফুলমণির স্বভাব-চরিত্র ভালো ছিলনা। সে দুর্লভ চক্রবর্তী নামক এক জমিদার কর্মচারীর অনুগৃহীতা ছিল। দুর্লভ ফুলমণির সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া প্রফুল্লকে গৃহ হইতে অপহরণ করে। কিন্তু বনপথে পলাইবার সময় দুইজন পথচারীকে ডাকাত ভাবিয়া ভয়ে পাল্কীসমেত প্রফুল্লকে ফেলিয়া পলায়ন করে। প্রফুল্ল বাঁধন খুলিয়া পাল্কী হইতে বাহির হইয়া পড়ে।

ঘোর বনে পথের রেখা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া প্রফুল্ল এক ভগ্ন গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই গৃহে এক বৃদ্ধের কাতরানি শুনিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া সে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধকে দেখিতে পাইল। বৃদ্ধের নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। প্রফুল্ল সাধ্যমত তাহার সেবা যত্ন করিল। কিন্তু সেইদিন অপরাহ্নেই বৃদ্ধের প্রাণ বিয়োগ হইল। মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধ প্রফুল্লকে তাহার গুপ্তধনের কথা জানাইয়া গেল। প্রফুল্ল বৃদ্ধের যথারীতি সৎকার করিল।

প্রফুল্ল গুপ্তধন পাইল বটে, কিন্তু তাহা লইয়া কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। পরদিন একটি মোহর লইয়া হাটে যাইবার সময় ভুলপথ ধরিয়া চলিতে চলিতে পথে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হইল। এই ব্রাহ্মণ বিখ্যাত দস্যুসর্দার ভবানী পাঠক। ভবানীপাঠকের নাম শুনিয়া প্রফুল্ল ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। শেষপর্যন্ত তাহার কাছে গুপ্তধনের কথা বলিল। কিন্তু ভবানীপাঠক তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি প্রফুল্লকে সুলক্ষণা দেখিয়া তাহাকে দলের অধিনেত্রী করিবার প্রয়াস পাইলেন। তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া গঠন করিয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। দিবা ও নিশি নামে দুইজন স্ত্রীলোক সহচরী রূপে প্রফুল্লর সঙ্গে থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল। ভবানীপাঠকের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর রঙ্গরাজও প্রফুল্লর সঙ্গে পরিচিত হইল।

প্রফুল্ল যে রাত্রিতে গৃহ হইতে অপহৃতা হয়, সেই রাত্রিতে ব্রজেশ্বর ঘোড়ায় চড়িয়া প্রফুল্লদের বাড়ি আসিয়াছিল। কিন্তু গৃহ শূন্য দেখিয়া সেই রাত্রেই আবার স্বগৃহে

ফিরিয়া গেল। প্রফুল্লর দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিয়া ব্রজেশ্বর দিন দিন অসুস্থ হইয়া পড়িল। ফুলমণি গৃহে ফিরিয়া প্রফুল্লর বাত-শ্লেষ্মা-বিকারে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিল। সেই সংবাদ হরবল্লভের গৃহে পৌঁছাইতে হরবল্লভ প্রফুল্লর জন্য কোনো শ্রাদ্ধশান্তি না করিয়া শুধু স্নান করিয়া শুদ্ধ হইলেন। ব্রজেশ্বর একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। তাহার পিতা মাতা উভয়েই তাহার জন্য শঙ্কিত হইলেন। অবশেষে 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ' প্রভৃতি পিতৃস্তব ব্রজেশ্বরকে কিছুটা সান্ত্বনা দিল।

এদিকে ভবানীপাঠকের তত্ত্বাবধানে প্রফুল্লর ধর্মশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা আরম্ভ হইল। ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি কয়েকবৎসরের মধ্যে শেষ করিল। বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন শুরু করিল। একে একে সকল পরীক্ষাতেই প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল। ভবানীপাঠক যে ইস্পাতের সন্ধান পাইয়াছিলেন—তাহার দ্বারা শাণিত অস্ত্র প্রস্তুত হইল। ইহার জন্য দশবৎসর অতিবাহিত হইল। প্রফুল্ল ভবানীপাঠকের একটি ছাড়া সকল নির্দেশই মানিয়া চলিয়াছিল। কেবল একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত। ইহার কারণ ভবানীপাঠক তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করেন নাই।

প্রথম খণ্ডে বঞ্চিতা প্রফুল্লর জীবনের নানা দুর্যোগময় পরিস্থিতির মধ্যে 'দেবী চৌধুরাণীতে' পরিণত হওয়া পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। যে বিশেষ রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবেশে ইহা সম্ভব তাহা বঙ্কিম কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়া সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। একদিকে ইতিহাস নিষ্ঠা ও অন্যদিকে সার্থক শিল্পবোধের সমন্বয় এই উপন্যাসে ঘটিয়াছে। রোমান্সের ভিত্তিতে কাহিনীটি ঘটনা পরম্পরা বজায় রাখিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। লেখকের চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতাও লক্ষনীয়। প্রধান চরিত্রগুলি হইতে ব্রহ্মঠাকুরাণী, গোবরার মা, ফুলমণি প্রভৃতি চরিত্র এক একটি তুলির টানে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বাংলার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবেশের সার্থক পরিচয় এই অংশে বিধৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লদের সংসারের অভাব দারিদ্র্যের দুঃখময় চিত্র দিয়া উপন্যাস আরম্ভ হইয়াছে। প্রফুল্ল এবং তাহার মাতার দুই বেলা অন্ন জোটেনা। পরের কাছে ধার করিয়া প্রাণ ধারণ প্রফুল্লর আর ভালো লাগেনা। তাহার শ্বশুর ধনীব্যক্তি। সে কেন দুঃখ পাইবে! প্রফুল্ল শ্বশুর বাড়ি যাইবার সংকল্প করিল। মাতার সঙ্গে এই ব্যাপারে বাদানুবাদের পর অবশেষে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া স্থির হইল। দুইজন অভুক্ত অবস্থাতেই ভূতনাথ গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

টীকা ঃ মেয়েমানুষের তাই ঢের—অভাব অভিযোগ কিছুতেই দুর্বল করিতে পারে না। সামান্য নূনভাতেই তাহারা অম্লান বদনে দিন কাটাইতে পারে। এখানে নারী জাতির কষ্ট সহ্য করার শক্তির পরিচয় পাই। **ভিক্ষাই বা কেন করিতে হইবে**—প্রফুল্ল অষ্টাদশবর্ষীয়া হইলেও দারিদ্র্যের কষাঘাতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। অভাব থাকিলেও ভিক্ষা করিতে সে প্রস্তুত নয়। কারণ কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিতে ভিক্ষা করিয়া খাইবে কেন!

আমার ত সব আছে—প্রফুল্লর শ্বশুর হরবল্লভ ধনী জমিদার। কাজেই প্রফুল্লর কোনো অভাব থাকিবার কথা নয়। সে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। তাহার পরের কাছে ধার করিয়া খাইবার কোনো প্রশ্ন উঠেনা।

আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না—প্রফুল্ল যে দেখিতে সুন্দর ছিল—প্রফুল্লর মাতার এই উক্তি হইতে বোঝা যায়। যে স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দর তাহার পক্ষে বাহ্য সাজসজ্জা বাহুল্য মাত্র। প্রফুল্লর সৌন্দর্য সম্বন্ধে বঙ্কিম বিস্তৃত বর্ণনা না দিয়া দুই একটি কথার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করিলেন। এখানে বঙ্কিমের শিল্পবোধের সার্থক পরিচয় মিলে।

সেজে গুজে কি ভুলাইতে যাইব—প্রফুল্ল নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শ্বশুরবাড়ীতে যাইতেছে। বাহ্য আড়ম্বরে সে স্বামীর মন ভুলাইতে চাহে না। এই স্বগতোক্তির মধ্যে প্রফুল্লর মর্যাদাবোধ ও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদে প্রফুল্লর সংকল্পের দৃঢ়তা, মর্যাদা বোধ ও ব্যক্তিত্বের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। শতগুণনাশী দারিদ্র্য তাহার আত্মসম্মানবোধকে ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। এই সকল গুণের সঙ্গে তাহার বুদ্ধির স্বচ্ছতা তাহাকে ব্যক্তিত্বশালিনী করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লর শ্বশুর বরেন্দ্র ভূমির (রঙ্গপুরের) ভূতনাথ গ্রামের জমিদার। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। প্রফুল্ল দরিদ্র ঘরের কন্যা জানিয়াও সুলক্ষণা বলিয়া তাহাকে পুত্রবধূ রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বিবাহের দিন প্রফুল্লর মা বরযাত্রীদের মতো স্বগ্রামবাসীদেরও লুচি মিঠাই খাওয়াইতে পারেন নাই বলিয়া—গ্রামবাসীরা অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য হরবল্লভের কাছে প্রফুল্লর মা কুলটা বলিয়া মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিল। হরবল্লভ তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া নিরপরাধা পুত্রবধূ প্রফুল্লকে ত্যাগ করিলেন। নিতান্ত অভাবের তাড়নায় প্রফুল্ল শ্বশুর বাড়ি নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাহার মাতাকে লইয়া আসিল। প্রফুল্লর শাশুড়ি প্রথমে বিরক্ত হইলেও

প্রফুল্লকে দেখিয়া তাঁর মন নরম হইল। তিনি কর্তার মন জানিতে গেলেন। ইতিমধ্যে ব্রজেশ্বরের ছোট বউ সাগর প্রফুল্লকে ইসারায় ডাকিয়া লইয়া গেল।

টীকা : সেই অবধি অন্নের কাঙাল—প্রফুল্লর বিবাহে ঘটা করিয়া খরচ করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া প্রফুল্লর মা দুরবস্থায় পড়িয়াছেন। নহিলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা এত মন্দ ছিল না।

প্রতিবাসীরা একটা বড় রকমের শোধ লইল—আমাদের সমাজে যে নির্মম অত্যাচার তখন চলিত (আজও যে চলেনা তা নয়) তার সম্বন্ধেই বঙ্কিম মন্তব্য করিয়াছেন।

আমি যাইব বলিয়া আসি নাই—প্রফুল্লর এই উক্তি নববধূর পক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও দারিদ্র্য-জর্জরিত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় এই উক্তি খুবই স্বাভাবিক।

এখানে প্রফুল্ল সামান্য দুই একটি কথা কহিয়াছে কিন্তু ঐ স্বল্পোক্তির মধ্যে তাহার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আভাস পাওয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহিণী হরবল্লভের মন বুঝিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার কোনো কৌশলই খাটিল না। হরবল্লভ প্রফুল্লর আগমন সংবাদে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়া দিতে বলিলেন।

অন্যদিকে সাগরের সঙ্গে নানাকথার মাধ্যমে প্রফুল্ল জানিতে পারিল যে নয়ানতারা নামে ব্রজেশ্বরের আরও একজন স্ত্রী আছে। নয়ান-বউ দেখিতে বিশেষ ভালো নয় বলিয়া সাগর তাহার রূপ লইয়া বিদ্রূপ করে। সাগর অভুক্ত প্রফুল্লকে নিজের বাপের বাড়ি হইতে দেওয়া সন্দেশ খাওয়াইল। প্রফুল্লর মা-র খাওয়া হয় নাই জানিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীকে দিয়া তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করাইল। প্রফুল্লর স্বামীর সঙ্গে দেখা করিবার একান্ত ইচ্ছা। সাগর তাহা বুঝিতে পারিয়া সেই রাত্রে স্বামীর সঙ্গে প্রফুল্লর দেখা করাইয়া দিবার কথা দিল।

প্রফুল্লর শ্বাশুড়ি আসিয়া সংবাদ দিলেন যে হরবল্লভকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না, তখন প্রফুল্ল তাহার শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, তাহার শ্বাশুড়িকে এই অনুরোধ করিল যে কি করিয়া তাহার ভরণ-পোষণ চলিবে। তাহার শ্বাশুড়ি তাহাকে সেই রাত্রে থাকিয়া পরদিন যাইতে বলিলেন।

টীকা : আঁধি—ধূলার ঝড়। এখানে 'আঁধি' অর্থে 'অনিষ্টের মূল' বা নষ্টের গোড়া। গৃহিণীর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে—এই কথাটি হরবল্লভ বুঝিতে পারিয়াছেন। **হার কাত নিয়ে খেলতে বসেছেন**—সাধারণত ঘরসংসারের ব্যাপারে

গৃহিণীর কথাই থাকে, কিন্তু প্রফুল্লর ব্যাপার নিয়া দরবার করিতে আসিয়া আজ তিনি জয়ের কোনো পথ দেখিতেছেন না। এখানে তাস খেলার ইঙ্গিতে বলা হইতেছে—যত ভালো তাসই আসুক না কেন—হারিতেই হইবে।

বদ রঙ্গ চালাইতে লাগিলেন—প্রতিপক্ষের রং-এর তাসে সেই তাস না থাকিলে যেমন বাজে রং-এর তাস খেলা হয় সেইরূপ গৃহিণীও হরবল্লভের মত পরিবর্তন করিবার জন্য নানা যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনো ফল হইল না।

আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মতো—সাগর বড়ো ঘরের মেয়ে বাপের বাড়ীতেই অধিকাংশ সময় থাকে। মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্য ক্রিয়াকর্মে শ্বশুর বাড়িতে আসে। তাহার জীবন অনেকটা কাঁচের আলমারিতে সযত্নে রক্ষিত মাটির আমের মতো। লোকে দেখিয়া খুসি হয় কিন্তু তাহা ব্যবহারে লাগে না। সাগরের কথাবার্তায় সারল্য প্রকাশ পাইলেও এই উক্তির মধ্যে যেন তাঁহার জীবনের দুঃখের চাপা দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

তোমারই বাড়ি ঘর বাছা—প্রফুল্লর জন্য গৃহিণীর পূর্ণ সহানুভূতি এই উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় সাগরের ঘরে সাগর ও প্রফুল্ল যখন কথা কহিতেছিল তখন নয়নতারা দরজায় ঘা দিল। সাগর দরজা না খুলিয়া 'নাপিত-বৌ' ইত্যাদি বলিয়া নানা প্রকার ঠাট্টা করিতেছিল। নয়ান-বউ প্রফুল্লর আগমন সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে সাগর-বউ দরজা খুলিলে নয়ান-বউ সেখানে প্রফুল্লকে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

টীকা ঃ কালপেঁচাটা এসেছে—এখানে সাগর 'কালপেঁচা' কথাটি নয়ান-বউএর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছে।

যেন নাপিত বৌয়ের গলা শুনিলাম না?—নয়ান-বউ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও সাগর না বুঝার ভাণ করিয়া তাহাকে 'নাপিত বৌ' বলিয়া ভুল করিতেছে। নয়ানবউকে ক্ষেপাইবার জন্য এভাবে বলিয়াছে। কারণ নয়ান-বউ তাহার সতীন।

রূপ-যৌবন নিয়ে বাপের বাড়ীতে বসে বসে ধুয়ে খাস—সাগর-বউ বাপের বাড়ীতে যাইবে বলিয়া নয়ান-বউ ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে।

মনে? —সাগর-বউ নূতন স্বামী নয়ান-বউকে দিবে বলাতে-নয়ান-বউ ঐরূপ কথা—মুখে না আনিতে বলিল। সাগর বিদ্রূপ করিয়া বলিল মুখে বলিতে নাই বটে—তবে

মনে মনে কল্পনা করিতে দোষ কি? এই ছোট উক্তির মধ্যে একটি নির্মম ইঙ্গিত আছে। সতীন সম্বন্ধে সতীনের মনোভাবও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রে হরবল্লভ আহারে বসিলে, গৃহিণী পাখা হাতে তাহার নিকট বসিলেন। প্রফুল্লর জন্য দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেও হরবল্লভ সে কথায় কান না দিয়া ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া বলিলেন—প্রফুল্লকে ঝাঁটা মারিয়া বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিতে। গৃহিণী ব্রজেশ্বরকে বলিলেন সে যেন মেয়ে মানুষের গায়ে হাত না তোলে। পরে তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বউ-এর ভরণ-পোষণ চলিবে কি করিয়া। হরবল্লভ বলিলেন, চুরি-ডাকাতি বা অন্য যে কোনো প্রকারে সে নিজের ব্যবস্থা করুক। গৃহিণী প্রফুল্লকে এই কথা বলিবার জন্য ব্রজেশ্বরকে বলিলেন। ব্রজেশ্বর ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে প্রফুল্লর সংবাদ লইতে গেলে তিনি তাহাকে সাগর-বউএর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

টীকা: তবু নারীধর্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে—মাছি না থাকিলেও হাতে পাখা লইয়া স্বামীর খাওয়ায় সময় প্রাচীন দিনে স্ত্রীরা সামনে বসিতেন। এই সংস্কার লোপ পাইতেছে বলিয়া বঙ্কিম আক্ষেপ করিতেছেন। এখানে বঙ্কিম সার্থক কৌতুকরসের অবতারণা ঘটাইয়াছেন।

হীরার ধার—প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন।

এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ্‌ ঝাড়ে—এই কথাটি শুধু বঙ্কিমের সময়েই নয় বর্তমানকালেও প্রযোজ্য। কড়া মন্তব্য হইলেও ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্বে পিতামাতা যাহাই বলুন-ছেলে সবকিছু গ্রহণ করিতে না পারিলেও প্রতিবাদ করিত না। এখন যে যত মূর্খ—তার ঔদ্ধত্য তত বেশি। শিক্ষিত ছেলেও এখন এই ব্যাপারে আর পিছাইয়া নাই। এই মন্তব্য বঙ্কিমের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সার্থক উদাহরণ।

এ তোমার কাজ। তোমারই অধিকার—স্ত্রীকে তাড়ানোর দায়িত্ব ব্রজেশ্বরের। কারণ সে স্বামী। হরবল্লভের এই অদ্ভুত যুক্তি তাঁহার সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক।

চুরি করুক, ডাকাতি করুক যা খুসি করুক—ভিক্ষা করুক—পুত্রবধূর কি করিয়া চলিবে—তাহা গৃহিণী জিজ্ঞাসা করাতে হরবল্লভ এই উক্তি করেন। উক্তিটি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ পরিণতির দিকে লইয়া যাইতে সাহায্য করিয়াছে। হরবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিলেন—Dramatic ironyর মতো তাহাই প্রফুল্লর জীবনে সত্য হইয়া দেখা দিল। প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণী হইয়া দস্যুদলের নেত্রী হইল।

বৌমাকে এই কথা বলিও—গৃহিণীর মুখে 'বৌমা' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রফুল্লকে তিনি ভালোবাসিয়া ফেলেন। এই উক্তির মধ্যে গৃহিণীর সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

বড় ডাকাতের ভয়—অরাজক বাংলায় প্রত্যেক মানুষেরই দস্যুভীতি ছিল।

চেঙ্গড়া—দুষ্ট ছেলে, ছেলেমানুষ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর ব্রহ্মঠাকুরাণীর নিকট হইতে সাগরের ঘরে গেল। সেখানে সাগরের পরিবর্তে প্রফুল্লর সঙ্গে দেখা হইল। সাগর কৌশল করিয়া প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বরকে তাঁহার ঘরে রাখিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে শুইতে গেল। প্রফুল্ল একটি রাতের জন্য স্বামীকে কাছে পাইল। পরদিন সকালে সাগর দরজা খুলিয়া দিলে প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে বলিল যে তাহাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার না করিলেও অন্তত দাসী বলিয়া মনে রাখিতে। ব্রজেশ্বর পিতাকে তাহার জন্য আর একবার অনুরোধ করার কথা বলাতে প্রফুল্ল বলিল যে তাহাকে লইয়া ব্রজেশ্বরের সঙ্গে তাহার পিতার মনোমালিন্য হয়—ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। এমনকি সে হরবল্লভের নিকট হইতে ভরণ-পোষণের জন্যও কিছু লইবে না। প্রফুল্লর ব্রজেশ্বরের নিকট হইতে কিছু লইতে আপত্তি। কিন্তু ব্রজেশ্বরের নিজের কিছু না থাকায় সে তাহার আংটিটি সাময়িক অভাব মিটাইবার জন্য দিল। পরে সে উপার্জন করিয়া প্রফুল্লর ভরণপোষণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। প্রফুল্ল শত অভাবেও আংটি বিক্রয় করিবে না বলিয়া স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইল। যাইবার সময় সাগর ও নয়ান-বৌএর সঙ্গে দেখা হইলে নয়ান-বৌ বলিল যে শ্বশুর মহাশয় তাহাকে চুরি-ডাকাতি করিয়া নিজের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছে। প্রফুল্ল দেখা যাবে বলিয়া এবং সাগরের সঙ্গে তাহার পিত্রালয়ে গিয়া দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মাতার সঙ্গে দুর্গাপুরে ফিরিয়া গেল।

টীকা : আ ছি! ছি! ছি!……পবিত্র পুণ্যময় কর্ম কখনও কেহ করে নাই—বঙ্কিম মুখচুম্বনের কথাটি বলিতে গিয়া 'ছি! ছি!' বলিয়া 'মার্জিত রুচি নবীন পাঠকদের' প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, যে পাঠক ইহাকে অন্যায় মনে করিবেন—তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। ব্রজেশ্বর যে 'অশ্লীলতা-দোষে নিজে দূষিত' হইতেছিল—তাহা ব্রজেশ্বর বা লেখকের মনের কথা নহে, যাহারা ইহাকে অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট মনে করিবেন তাহাদের মনের কথা। নির্বোধ প্রফুল্ল যে ইহাকে পবিত্র পুণ্যময় কর্ম, ভাবিয়াছে—তাহা যে লেখকের অন্তরের কথা নয়, ইহা মনে করিবার কোনো হেতু নাই। প্রফুল্লকে নির্বোধ বলিয়া তাহার সারল্যের প্রতিই

ইঙ্গিত করিয়াছেন। বঙ্কিম যে সময় বসিয়া কথাটি লিখিয়াছেন—তখনকার পাঠকদের অনেকেই হয়ত ঐরূপ মনে করিতে পারিত। 'গ্রন্থকার প্রাচীন' তাই তাঁহার 'লিখিতে লজ্জা নাই'। বর্তমান কালের সমালোচকদের অনেকেই এখানে বঙ্কিমের দুর্বলতা লক্ষ্য করেন, বঙ্কিমের উপন্যাস পাঠ করিতে গেলে বঙ্কিমের যুগ ও সেই যুগের পাঠক সম্বন্ধেও অবহিত থাকিতে হইবে। অন্যথায় সমালোচনায় অর্বাচীনতা প্রকাশ পাইবার আশঙ্কা আছে।

অকারণে তোমায় ত্যাগ…………অধর্মে পতিত হইবে ?—ব্রজেশ্বরের উদ্দেশ্য মহৎ—কিন্তু পিতার শক্তির কাছে সে অসহায়।

তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই…………আমি সুখী হইব না—প্রফুল্লর প্রেম দুঃখের দুঃসহ দাহনে উজ্জ্বল। বড়ো প্রেম কখনও ছোট কাজ করে না—ইহা প্রফুল্লর প্রেম সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অল্পেই তাহার সন্তুষ্টি। স্বামী তাহাকে অস্বীকার করে নাই—ইহা তাহার শুধুমাত্র সান্ত্বনা নহে—তাহার জীবনের মূলধন।

তোমার নিজের যদি কিছু থাকে—স্বামীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে প্রফুল্লর কোনো লজ্জা নাই—সেখানে তাহার চাহিবারও অধিকার আছে।

কেহ তীর্থ করিলে সে কথা আপনার মুখে বলে না—প্রফুল্লর প্রেম পূজারই নামান্তর। **মিন্সে আবার………দিয়াছে**—নয়নতারাকে ক্ষেপাইবার জন্যই সাগর আংটির উল্লেখ করিয়া 'মিন্সে' কথাটি বলিয়াছে। নয়নতারা আংটি দিবার ব্যাপারটি যে ভাবে গ্রহণ করিবে তাহারই আভাস এই উক্তিতে।

'দেখা যাবে'—হরবল্লভের অভিমত নয়নতারা মুখে শুনিয়া প্রফুল্ল এইরূপ বলিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কথাটি প্রফুল্লর পরবর্তী জীবনের ইঙ্গিতবাহী। বঙ্কিম এখানে সার্থক শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন।

এ বাড়ীতে আর………তোমার সঙ্গে দেখা হইবে—প্রফুল্লর মর্যাদাবোধ প্রকাশ পাইয়াছে। হরবল্লভের বাড়ীতে আসিব না বলিলেও পরে সে আসিয়াছে। তবে ভিখারিণীর মতো নয়। বড় বৌ-এর সম্পূর্ণ অধিকার লইয়া 'দেবী উপাধি' ছাড়িয়া প্রফুল্ল সগৌরবে শ্বশুরের গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। সাগরের সঙ্গে তাহার বাপের যাইয়া দেখা করার কথাটি উপন্যাসের কাহিনীর দিক হইতে খুবই মূল্যবান। সাগরের সঙ্গে দেবী চৌধুরাণীরূপিনী প্রফুল্লর দেখা হইবে। ইহারই আভাস প্রফুল্লর উক্তি মধ্যে পাওয়া যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লর মা বাড়ি ফিরিয়া শারীরিক ও মানসিক কষ্টে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন রোগ ভোগের পর চিকিৎসার অভাবে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। যাহারা এতদিন তাঁহার শত্রুতা করিতেছিল—সেই প্রতিবাসীরাই প্রফুল্লর বিপদের দিনে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসিল। তাহার মার শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারে গ্রামের সকলেই যথাসাধ্য করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ নগদ টাকা দিয়া, কেহ বা কিছু দ্রব্য সামগ্রী দিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্যোগ করিল, বিবাহিতা কন্যা বলিয়া প্রফুল্ল চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। গ্রামের মাতব্বররা পরামর্শ করিয়া হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ জানাইতে গেল। যাহারা একদিন প্রফুল্লর মার নামে কলঙ্ক রটাইয়াছিল—তাহাদের কথা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না। প্রতিবাসীদের সাহায্যে প্রফুল্ল মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। এদিকে ব্রজেশ্বর সব শুনিয়া প্রফুল্লকে একদিন দেখিতে যাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

টীকা ঃ বাঙালীরা এ সময়ে শত্রুতা রাখে না—যাহারা একদিন প্রফুল্লর মাতার কলঙ্ক রটাইয়াছিল—প্রফুল্লর বিপদের সময় তাহারা সকল বিদ্বেষ ভুলিয়া তাহার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিল। বঙ্কিম ইহাকে বাঙালীর গুণ বলিয়াছেন।

আমরা সে কথা সারিয়া লইব—একদিন প্রতিবাসীরাই কলঙ্ক রটাইয়াছিল আজ তাহারাই আবার নিজেদের মিথ্যা রটনা শুধরাইয়া লইবে বলিতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাতার মৃত্যুর পর প্রফুল্ল একা। অল্পবয়স্কা মেয়ের পক্ষে বাড়ীতে একা থাকা সমীচীন নয় মনে করিয়া প্রফুল্ল ফুলমণি নাম এক বিধবাকে তাহার বাড়ীতে আসিয়া শুইতে অনুরোধ করে। ফুলমণি প্রতিরাত্রেই প্রফুল্লর বাড়ীতে শুইত।

ফুলমণির স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল না। জমিদার পরাণ চৌধুরীর গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। দুর্লভ প্রফুল্লকে অপহরণ করিবার চক্রান্ত করিয়া একদিন রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া প্রফুল্লর মুখ বাঁধিয়া তাহাকে পালকীতে তুলিয়া পলাইল। পথে বিপদ হইতে পারে ভাবিয়া বাহকেরা নিঃশব্দে পাল্‌কী লইয়া চলিল। ফুলমণিও দুর্লভের সঙ্গে গেল। এদিকে ব্রজেশ্বর প্রফুল্ল-অপহরণের কিছুক্ষণ পর দুর্গাপুর আসিয়া প্রফুল্লকে দেখিতে না পাইয়া সেই রাত্রেই আবার ভূতনাথে ফিরিয়া আসিল। দুর্লভ ভয়ে ভয়ে প্রায় চার ক্রোশ পথ ছাড়াইবার পর হঠাৎ সামনে দুইজন লাঠিয়ালকে দেখিতে পাইয়া দুর্লভ ও পাল্‌কীর বাহকরা পাল্‌কী ফেলিয়া ডাকাতের হাত হইতে প্রাণে বাঁচিবার জন্য পলাইল। এই

লাঠিয়াল দুইজন ডাকাত নহে—তাহারা হিন্দুস্থানী, চাকরীর চেষ্টায় বনপথে রঙ্গপুর যাইতেছিল।

সকলে চলিয়া গেলে প্রফুল্ল বাঁধন খুলিয়া বনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক ভগ্ন গৃহে উপস্থিত হইল। সেখানে একজন মুমূর্ষু বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। প্রফুল্ল যথাসাধ্য সেবা করিয়াও বাঁচাইতে পারিল না। বৃদ্ধের কথা মতো তাহাকে উঠানে কবরস্থ করিল। বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে প্রফুল্লকে গুপ্তধনের সন্ধান দিয়া গেল।

টীকা ঃ কৃতাভিসারা—যে সাজ সজ্জা করিয়া নায়কের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য গোপনে গমন করে। **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর**—১১৭৬ সালে বাংলা দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহাই পরবর্তীকালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

দেবী সিংহের ইজারা—১৭৫৬খ্রীষ্টাব্দে দেবী সিংহ পানিপথ হইতে বাংলা দেশে আসিয়া ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জিলার ইজারাদার হন। কর আদায়ের ব্যাপারে প্রজাবর্গের উপর নির্মম পীড়নের জন্য তিনি কুখ্যাত ছিলেন।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টর হল—লণ্ডনের বিখ্যাত প্রাসাদ। এখানে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের বিচার হয়। এখানেই নানা অপরাধে অভিযুক্ত ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাত বৎসর ধরিয়া বিচার চলে। **এদ্‌মন্দ্‌ বর্ক**—বিখ্যাত আইরিশ বাগ্মী ও রাজনীতিক এবং ব্রিটীশ পার্লামেন্টের সদস্য। দুর্নীতি অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত তিনি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইয়া যে তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দেন তাহা Impeachment of Warren Hastings নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি দেবী সিংহের অত্যাচারেরও উল্লেখ করেন।

প্রফুল্ল দীন-দুঃখিনী—বৃদ্ধ বৈষ্ণব প্রফুল্লকে যে টাকার সন্ধান দিয়াছিল—তাহার অধিকার তাহাকে দেওয়ায় টাকা লইতে বিশেষ আপত্তি থাকিবার নয়। বিশেষত প্রফুল্লর অভাব-দারিদ্র্য আছে বলিয়াই তাহার পক্ষে গুপ্তধন সংগ্রহ করায় কোনো বাধা নাই।

নবম পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে সমাধিস্থ করিয়া প্রফুল্ল তাহার নির্দেশ মতো মাটির নীচে প্রোথিত বিশ ঘড়া মোহর উদ্ধার করিল। বৃদ্ধ বৈষ্ণবের নাম কৃষ্ণদাস বাবাজী। তিনি বৃদ্ধ বয়সে এক বৈষ্ণবী গ্রহণ করিয়া নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিশাল অরণ্যের ভগ্ন অট্টালিকায় বাস করিতে থাকেন। নীলধ্বজ বংশীয় শেষ রাজা নীলাম্বর এই অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া পাঠানদের ভয়ে মাটির নীচে ধনরত্ন লুকাইয়া

রাখিয়া সেইখানেই বাস করিতেন। নীলাম্বর পাঠানদের হাতে বন্দী হওয়ায় তাহার ধনরত্ন সেইখানে পোঁতা রহিল, কৃষ্ণদাস সেই ধনরত্নের সন্ধান পাইয়া তাঁহার বৈষ্ণবীকেও বলেন নাই। তিনি প্রফুল্লকে তাহার সন্ধান দিতেই প্রফুল্ল উক্ত ধনরাশির অধিকারিণী হইল।

টীকাঃ চকমকি—যে পাথরে লোহা ঘর্ষণকরিয়া আগুন জ্বালানো হইত। **উচাইয়া**—তুলিয়া। **বিচালি**—ধান ইত্যাদির খড়। **সরওয়াল্‌টার র‍্যালে**—ইংরাজ বীর যোদ্ধা ও লেখক। শোনা যায়, ইনিই প্রথম আমেরিকা হইতে তামাক লইয়া আসেন—এবং তাহার প্রচলন করেন।

রসকলি—বৈষ্ণবদের তিলক বিশেষ। **ভেক**—(ভিক্ষা) সন্ন্যাস সাজ বা বৃত্তি। **জয়দেব গীতি**—শ্রীগীত গোবিন্দম্ জয়দেব বিখ্যাত কাব্য এবং বৈষ্ণবদের অমূল্য ধর্মগ্রন্থ স্বরূপ। **শ্রীমদ্‌ভাগবত**—কথিত আছে যে, বেদব্যাস কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এই সুললিত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বৈষ্ণবদের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ। **হাবসী**—আবিসিনিয়া হইতে আগতদের হাবসী বলা হইত। **নীলধ্বজ বংশীয়**...... **নীলাম্বরদেব**—নীলাম্বরের কাহিনীটি কতখানি ঐতিহাসিক সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। তবে বঙ্কিম ইতিহাসের পটভূমিকায় কাহিনীটিকে সার্থক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ

এইখানে ফুলমণির প্রসঙ্গ আবার আনা হইয়াছে। ডাকাতের ভয়ে দুর্লভ যখন পলাইতেছিল, ফুলমণি ও তাহার পিছনে ছুটিতেছিল। ফুলমণি যখন অনুনয় বিনয় করিয়া দুলর্ভকে থামাইতে পারিল না তখন মেয়েমানুষকে ভুলাইয়া আনিয়া ডাকাতের হাতে সমর্পণ করিয়া ভীরুর মতো পলাইবার জন্য তিরস্কার করিতেছিল। ফুলমণিকে ডাকাতে ধরিয়াছে ভাবিয়া দুর্লভ তাহাকে ফেলিয়া আরও দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইল। অনেক দুর্ভোগ ভুগিয়া ফুলমণি বাড়ীতে আসিতেই তাহার ভগ্নীর প্রশ্নের উত্তরে সত্য ঘটনা চাপা দিয়া বলিল যে গতরাত্রে প্রফুল্লর স্বর্গতা মাতা আসিয়া প্রফুল্লকে লইয়া গিয়াছেন। এই কাহিনীই দ্রুত অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত হইয়া চারদিকে পরিবর্তিত আকারে ছড়াইয়া পড়িল।

এই পরিচ্ছেদটি বঙ্কিমের হাস্যরস সৃষ্টির সার্থক উদাহরণ। দুর্লভের পলায়ন, ফুলমণির পিছু ধাওয়া ও কটুবাক্য প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্রের দ্বারা পরিচ্ছেদটি সমৃদ্ধ।

টীকাঃ পগার—(সংস্কৃত প্রাকার) এখানে উচু আল। **আষাঢ়ে গল্প**—অবিশ্বাস্য গল্প। **রূপান্তরে**—পরিবর্তিত রূপে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল কৃষ্ণদাস বাবাজী প্রদত্ত ধনরত্ন লইয়া মহাসমস্যায় পড়িল। গভীর অরণ্যে তাহার একা থাকাও বিপদ। আবার অন্যত্র ধনরত্ন লইয়া যাওয়ারও সুযোগ নাই। অরণ্যে থাকিলেও ডাকাতের ভয়—বাহির হইলেও ডাকাতের ভয়। এখন তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ একই কথা। প্রফুল্ল অরণ্যে থাকিবে স্থির করিয়া ঘর দ্বার পরিষ্কার করিল। হাট হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি আনিবার জন্য সে একটি মোহর লইয়া বাহির হইল। পথে তাহার সঙ্গে বিখ্যাত দস্যু দলপতি ব্রাহ্মণ ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেখা হইল। ভবানীপাঠক প্রফুল্লর সঙ্গে কথা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ইহার নিকট প্রচুর ধনরত্ন আছে। মেয়েটিকে তাহার বুদ্ধিমতী ও সুলক্ষণযুক্তা বলিয়া মনে হইল। ভবানীপাঠক নিজের যথার্থ পরিচয় দিবার জন্য একটি নাগরা বাজাইতেই পঞ্চাশ ষাট জন সশস্ত্র ডাকাত আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের প্রফুল্লকে চিনিয়া রাখিতে ও তাহাকে মার মতো শ্রদ্ধা করিতে এবং কেহ যেন তাঁহার অনিষ্ট করিতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে আদেশ করিলেন। তিনি নিজেই তাহাকে 'মা' বলিয়াছেন। প্রফুল্ল ভবানীপাঠকের দেওয়া রন্ধনের সামগ্রী লইয়া তাঁহাকে ভাঙা বাড়িতে লইয়া আসিল।

টীকা ঃ আর কেহ নাই—প্রফুল্ল নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিল। ভবানী পাঠক তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। **এই বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা**—দলের নেতা বা নেত্রী করিবার জন্য ভবানী পাঠক উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজিতেছিলেন। প্রফুল্লর মধ্যে নেত্রী হইবার সুলক্ষণ লক্ষ্য করিলেন। **ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকমের আছে**—ভবানী পাঠক বাহিরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো বেশ ধারণ করিলেও তিনি যে দস্যুদলপতি এই কথাটি তাহারই ইঙ্গিতবাহী।

'সবই মোহর'......কানে ভাল লাগিলনা—ভবানী-পাঠকের 'সবই মোহর' কথাটা যেন তাহার কৌতূহল ও লোভের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রফুল্ল স্পন্দহীন—ভবানী-পাঠকের নাম শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে প্রফুল্ল স্পন্দহীন। **প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি**—প্রফুল্ল অস্থির মতি নহে—সে বুঝিতে পারিল যে ভবানী-পাঠকের শরণ লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল ভবানী-পাঠককে ভাঙা বাড়িতে আনিয়া তাঁহার মোহর পাইবার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। ঐশ্বর্য সম্পদ লইয়া প্রফুল্ল কি করিবে সেই ব্যাপারে ভবানী-পাঠক নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লর সঙ্গে কথা বলিয়া তিনি বুঝিলেন যে

তাহার ধনঐশ্বর্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো মোহ নাই। প্রফুল্লকে তিনি আদর্শ মানবী করিয়া গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিলেন। ভবানী-পাঠক তাহাকে সর্বতোভাবে গঠন করিয়া তুলিবার মানসে নিজেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন এবং দুইজন স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে সেই ভাঙা বাড়িতেই থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। রঙ্গরাজের সঙ্গে ভবানী পাঠকের কথাবার্তায় বোঝা গেল যে, তিনি প্রফুল্লর মধ্যে ভালো লোহার সন্ধান পাইয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা তাহাকে শাণিত অস্ত্র করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। তাই তাহার শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করিলেন।

টীকা ঃ ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে—ভাঁড়াইলে বা মিথ্যা বলিলে। **তোমার ত কেহই নাই বলিয়াছ**—ভবানী-পাঠক অনেক জেরা করিলেও প্রফুল্লর কেহ আছে কি নাই তাহা লইয়া কোনো প্রশ্নই করেন নাই। তাহার কথাই বিশ্বাস করিয়াছেন। ইহাতে ভবানী-পাঠক বা বঙ্কিমের ত্রুটি লইয়া অনেকেই বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। সত্য ও সম্ভাব্য সত্যের ভিত্তিতেই গল্প উপন্যাসের কাহিনী গড়িয়া উঠে। নিখুঁত সত্যের ভিত্তিতে সংবাদপত্রে রির্পোট রচনা (!) হইতে পারে উপন্যাস রচনা হয় না। রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের গোড়াতেই বলিয়াছেন—'সত্য বলিব, কিন্তু সেই সত্য বানাইয়া বলিব।' প্রতিদিন যাহা ঘটে—তাহার প্রয়োজন নাই বলা হইতেছেনা। কিন্তু যাহা ঘটার সম্ভাবনা আছে—তাহাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াতে সন্ধানী পাঠকের রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। **ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকমের আছে**—ভবানী-পাঠকের এই উক্তিতে বোঝা যায় তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও সর্বজ্ঞ নন। সত্য বটে তিনি বুদ্ধিমান দস্যুদলপতি—কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভুল করিবার উপায় নাই বলিয়া মনে হয় না। তাহাই যদি হইত তাহা হইলে ইতিহাসের ভবানী-পাঠক ইংরাজের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হইতেন না। বঙ্কিম কল্পিত ভবানী-পাঠকের অনেক গুণ আছে—কিন্তু তিনিও মানুষ। তাই 'পণ্ডিতী তর্কের মার প্যাঁচ' ও জেরার 'কসরৎ' দেখানো সত্ত্বেও—প্রফুল্লর কেহ আছে কিনা এবং একাদশীর দিন কেন সে মাছ খায় তাহা বিশেষ ভাবে তলাইয়া দেখিবার বুদ্ধিটা সন্ধানী পাঠকের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

যদি বলি, পাপই করিব—ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে ঐশ্বর্য ভোগ করার ব্যাপারে নানা জেরা করিতেছেন। প্রফুল্লও বুদ্ধিমতী এবং সাহসী। সেও ভবানী-পাঠকের প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া তাঁহাকেও যাচাই করিয়া দেখিতেছে।

শিখাইতে পাঁচ সাত বৎসর লাগিবে—প্রফুল্লকে সম্যক ভাবে গড়িয়া তুলিতে সময় লাগিবে। **সে সামগ্রী পাইবার নয়·········কাটারি গড়িয়া লয়**—ভবানী-পাঠক ভালো ভাবেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে প্রফুল্লর মধ্যে নানা গুণ বর্তমান।

শুধু তাহাকে গড়িয়া লওয়ারই অপেক্ষা। প্রফুল্লর মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে—তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে।

আমরা ইজারাদারের......লোককে দিয়া আসি—ভবানী পাঠক দস্যু হইলেও দরিদ্রের বন্ধু; তাহার দস্যুতা উৎপীড়িত জনসাধারণের কল্যাণের জন্য। তাই তিনি রঙ্গরাজকে বলেন যে, ইজারাদার প্রজাদের সর্বস্ব লুঠিয়াছে—কাজেই তাহার কাছারি লুঠিয়া আবার যাহাদের ধন তাহাদের দিবেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী পাঠক প্রফুল্লর কাছে থাকিবার জন্য গোবরার মা নামে এক বৃদ্ধা পরিচারিকা এবং নিশিকে পাঠাইয়া দিলেন। গোবরার মা কানে কম শোনে। সে বাহিরের কাজ করিবে এবং হাটে যাইবে বলিল। জল তোলা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি বাহিরের কাজও তাহার দ্বারা হইবে না। প্রফুল্ল বুঝিল যে নিজেকেই বেশির ভাগ কাজ করিতে হইবে। নিশির সঙ্গে পরিচয়ে প্রফুল্ল তাহার পুর্ব জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারিল। শৈশবে নিশিকে ছেলেধরায় চুরি করে, পরে তাহাকে এক রাজার কাছে বিক্রয় করে। রাজপুত্রের মোহের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজমহিষীর দেওয়া গহনাসমেত পলাইতে গিয়া ভবানী ঠাকুরের দলের হাতে ধরা পড়িয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করে। ভবানী ঠাকুরকেই সে পিতা বলিয়া জানে। তিনি তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সম্প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই তাহার সর্বস্ব—তাহার স্বামী। প্রফুল্ল বলিল যে, স্বামী কি তাহা জানিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না। স্বামী এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনার সময় প্রফুল্লর ব্যক্তি-জীবনের গভীর বেদনার অশ্রুসিক্ত প্রকাশে নিশি বুঝিল যে ঈশ্বর-ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।

টীকা: বেসাতির হিসাব—বাজার খরচের হিসাব। **আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তরস**—গোব্‌রার মা ভাবিয়াছিল নিশি তাহাকে গালি পাড়িতেছে। তাই সে ক্রুদ্ধ হইয়া গালি পাড়িতে লাগিল। যখন প্রফুল্লর মুখে শুনিল যে নিশি প্রফুল্লকে কথাগুলি বলিতেছে, তখন সে অমনই শান্ত হইয়া প্রফুল্লকে রাগ না করিতে বলিল। **স্বামী দেখিলে কখনও শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না**—প্রফুল্ল স্বামীকে যে ক্ষণিকের জন্য কাছে পাইয়াছিল—তাহাতেই সে বুঝিয়াছে যে নারীজীবনে স্বামীই সব। ইহা কোনো তর্কের দ্বারা প্রমাণিত নয়—ইহা তাহার অন্তরের গভীরতম সত্যানুভূতি। স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া এবং স্বামীকে ভালোবাসা ছাড়া নারীর আর কোনো কামনাই

থাকিতে পারে না। প্রফুল্ল মুহূর্তমধ্যে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছে—ব্রজেশ্বর তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে—নিশির মতে অনন্ত যৌবন ঐশ্বর্য-গুণ সম্পন্ন কৃষ্ণ সকলেরই দেবতা।

হিন্দুধর্ম্মপ্রণেতারা উত্তর জানিতেন—প্রফুল্ল নিশির কথার উত্তর দিতে পারিল না! কারণ সে নিশির মতো তেমন শিক্ষালাভ করে নাই। প্রফুল্লর সকল তত্ত্ব জানা থাকিলে হিন্দুধর্ম প্রণেতাদের মতো সেও বলিতে পারিত, ঈশ্বর অনন্ত—তাঁহাকে ধারণা করা সসীম মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অনন্ত জগদীশ্বরের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুর কাছে অনেকখানি সান্ত। কিন্তু নারীর কাছে পতি আরও সান্ত, আরও স্পষ্ট। তাঁহার রূপগুণ ধারণা করা যায়। তাই পতিই নারীর কাছে সকল দেবতার চেয়ে বড়ো। ভগবানকে পাইবার প্রথম সোপান পতিভক্তি।

দুটো দেবতা কেন,……কতটুকু থাকে—নিশির মতে ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তি সম্যকভাবে শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হাওয়াই বাঞ্ছনীয়। পতি নারীর দেবতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। অতএব যে ভক্তি পতির প্রাপ্য তাহাও সেই বিশ্বপতি কৃষ্ণে অর্পণ করাই শ্রেয়।

মেয়েমানুষের ভক্তির কি………ভালোবাসা আর—প্রফুল্ল যে ভক্তির কথা বলিতেছে—তাহা প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসা। তাহার কাছে ভালোবাসা ও ভক্তি সমার্থক। কিন্তু নিশি ভক্তি ও ভালোবাসাকে পৃথক করিয়া দেখাইতেছে। তাহার মতে নারীজীবনে পতির প্রতি ভালোবাসার শেষ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রফুল্ল তা আজও জানিতে পারে নাই বলিয়াও ভক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে—তাহা প্রেমভক্তিরই প্রশান্তিময় অনুভূতি। তাহার কাছে ভালোবাসা ও ভক্তিতে কোনো পার্থক্য নাই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিম আবার পূর্ব কথার অবতারণা করিয়াছেন। দুর্লভ চক্রবর্তী যে রাত্রে ফুলমণির সাহায্যে প্রফুল্লকে লইয়া পলাইতেছিল—সেই রাত্রেই ব্রজেশ্বর বাড়ীর কাহাকেও না জানাইয়া দুর্গাপুরে প্রফুল্লকে দেখিতে আসিয়াছিল। প্রফুল্লর সাক্ষাৎ না পাইয়া সেই রাত্রেই সে বাড়ি ফিরিয়া গেল। প্রফুল্ল সম্বন্ধে উৎকণ্ঠায় ব্রজেশ্বর দিনে দিনে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই ব্যতিক্রম দেখা দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে প্রফুল্লর তিরোধান-বৃত্তান্ত রূপান্তরিত

হইয়া হরবল্লভের গৃহে পৌঁছিল। সকলে জানিল প্রফুল্ল বাত-শ্লেষ্মা বিকারে মারা গিয়াছে। হরবল্লভ শৌচস্নান করিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি করিলেন না। এই মর্মান্তিক সংবাদে ব্রজেশ্বর একেবারে শয্যাগ্রহণ করিল। হরবল্লভ নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। শেষপর্যন্ত পিতৃভক্তিই ব্রজেশ্বরের জীবন রক্ষা করিল। সে পিতার প্রতি অচলা ভক্তি লইয়া প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিল।

টীকা : প্রফুল্লের বাহির অপেক্ষা……আরও মধুর—ক্ষণিকের পরিচয়ে ব্রজেশ্বর বুঝিয়াছিল প্রফুল্লর অতুলনীয় রূপ আছে বটে, সেই সঙ্গে তাহার আন্তর সৌন্দর্য ও মাধুর্যেরও তুলনা নাই।

উন্মাদকর মোহ—বঙ্কিমের এই কথাটি অনেকের তীব্র সমালোচনার কারণ হইয়াছে। ব্রজেশ্বরের 'উন্মাদকর মোহ' যে সুস্নিগ্ধ স্নেহে পরিণত হইত—তাহার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সংশয়ের কোনো অবকাশ নাই। ক্ষণিকের পরিচয় যে রূপ ও মোহকে বহন করিয়া আনে, নিত্যসাহচর্যে তাহার কল্যাণধর্মী বিকাশ ঘটা সম্ভব। ব্রজেশ্বর অল্পক্ষণের মধ্যে প্রফুল্লর অন্তর ও বাহিরের যতখানি জানিয়াছে—তাহার মধ্যে বাহিরের পরিমাণই বেশি। কিন্তু প্রফুল্ল কাছে থাকিলে ব্রজেশ্বরের রূপমোহ স্নিগ্ধ প্রেমে রূপায়িত হইতে পারিত। রূপমোহের সঙ্গে প্রফুল্লর অভাব দারিদ্র্যের জন্য করুণাবোধও প্রবল ছিল। প্রেম দেহসম্পর্ক হীন নয়—কিন্তু নিত্যসান্নিধ্যে তাহা বৈদেহী রূপ লাভ করিতে পারিত।

হরবল্লভ শৌচস্নান……নিষেধ করিলেন—হরবল্লভ প্রফুল্লর সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করেন না বলিয়াই শ্রাদ্ধাদি করিলেন না।

একটা পাপ গেল……নাইতে পারলেই শরীর জুড়ায়—এই কথাটিতে নয়নতারার তথা সেই যুগের নারীদের সতীন সম্বন্ধে মনোভাবই প্রকাশ পাইতেছে। **কথাটি ব্রজেশ্বর কণ্ঠস্থ করিলেন**—পিতাই যে শ্রেষ্ঠ এবং পুত্রের একান্ত আরাধ্য দেবতা, ব্রজেশ্বর তাহা আগে শুনিয়াছেন কি শোনেন নাই—সেই প্রশ্ন বড়ো নয়। নিজের যে বৈকল্য দেখা দিয়াছে—তাহা হইতে মুক্তির কোনো উপায়ই সে খুঁজিয়া পায় নাই। প্রফুল্লর জন্য যে দুঃখ তাহার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল—সেই বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার জন্যই পিতৃস্তোত্রকে অবলম্বন করিল। বঙ্কিম শোকার্ত ব্রজেশ্বরকে শোকপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতে দেন নাই। ব্রজেশ্বর চরিত্রের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও লেখক তাহাকে বলিষ্ঠ-চিত্ত পুরুষরূপে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সকল পরিস্থিতি ও পরিবেশেই ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করে নাই।

পঞ্চদশ পা. এচ্ছেদ

ভবানী পাঠকের তত্ত্বাবধানে প্রফুল্লর শিক্ষা আরম্ভ হইল। প্রথমে নিশির কাছে পাঠ শুরু করিয়া পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, সাংখ্য, বেদান্ত, যোগশাস্ত্র এবং পরিশেষে শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা প্রভৃতির পাঠগ্রহণ করিল। প্রফুল্লর একাগ্রতা ছিল বলিয়া এই সকল আয়ত্ত করিতে বিলম্ব হইল না। পাঁচ বৎসরে তাহার পাঠ সম্পূর্ণ হইল।

অন্যদিকে ভবানী ঠাকুরের নির্দেশে অশন-বসন-প্রসাধন ইত্যাদির ব্যাপারে প্রফুল্ল কঠোর নিয়ম মানিয়া চলিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুরের ইঙ্গিতেই গোব্‌রার মা বিশেষ কোনো কাজ করিত না। নিশির নিকটও কোনো সাহায্য না পাইয়া প্রফুল্লকেই সব করিতে হইতে। ইহাতে তাহার বিশেষ কোনো অসুবিধাই হয় নাই। শরীর চর্চায়, প্রসাধনে, শাস্ত্রালোচনায় প্রফুল্লর প্রভূত অধিকার জন্মিল। প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের সকল আদেশ মান্য করিয়াও দুইটি ব্যাপারে তাহার অবাধ্য হইল। সে একাদশীতে মাছ খাইত এবং নিজের পরিচয় কিছুতেই দেয় নাই।

টীকা ঃ শুভঙ্করী আঁক—পুরানো দিনে বাংলা দেশে শুভঙ্করীর আর্যার ভিত্তিতে অঙ্ক শিখানো হইত। **'সু ঔ জস, অম, ঔ, শস্**—ব্যাকরণ পাঠের কথা বলা হইতেছে। **দুই নূতনকে ভুলিবার জন্য**—ভক্তি ও ভালোবাসাকে ভুলিবার জন্য। **ভট্টিকাব্য**—ভর্তৃহরি রচিত কাব্য। **রঘু, কুমার, শকুন্তলা**—মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশম্, কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের কথা বলা হইতেছে। **নৈষধ**—শ্রীহর্ষ রচিত নিষধরাজ নল ও দময়ন্তীর আখ্যান। **সাংখ্য, বেদান্ত**—কথিত আছে কপিল সাংখ্যসূত্র এবং বেদব্যাস বেদান্তের রচয়িতৃ। **যোগশাস্ত্র**—পতঞ্জলি যোগদর্শনের রচয়িতা। **শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা**—হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে।

একাদশীর দিন......মাছ খাইত—বাঙালী সধবা নারীর সংস্কার। অন্যান্য দিন মাছ না জুটিলেও বাঙালী সধবারা একাদশীর দিন মাছ অবশ্যই খাইবেন। প্রফুল্লও স্বামীর মঙ্গলার্থে একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত। এই ব্যাপারে সে ভবানী ঠাকুরের নিষেধ মানে নাই। ইহা ব্যতীত ভবানী ঠাকুর জিজ্ঞাসাবাদ করা সত্ত্বেও সে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে নাই। বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন যে, একাদশীতে প্রফুল্লর মাছ খাওয়ার ব্যাপারটি ভবানী ঠাকুর তলাইয়া দেখেন নাই। এইখানেই তাঁহার ভুল হইয়াছিল। অন্যদিকে প্রফুল্লর পরিচয় জানিতে গিয়াও জানিতে না পারা এবং তাহার

জন্য পীড়াপীড়ি না করার ব্যাপারটি কোনো কোনো 'বিচক্ষণ সন্ধানী দৃষ্টিসম্পন্ন' অসহিষ্ণু সমালোচকের চোখে কানে বড়ই ঠেকিয়াছে। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা সেই কনে দেখা গল্পের মতো। বিবাহের জন্য কন্যা নির্বাচন করিতে গিয়া কেহ তাহার চোখ দেখিলেন, কেহ কান, কেহ চুল, কেহ আঙ্গুল—সমগ্রভাবে কন্যাটিকে বিচার করিয়া দেখা আর হইল না এবং সে কারণেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চোখে কন্যার নানা ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিল। খণ্ড খণ্ড করিয়া ত্রুটির বিচার করিতে গিয়া সমগ্রভাবে অর্থাৎ অখণ্ডভাবে রস বিচার আর হয় না। অনুশীলিতা প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত কেন সেই তত্ত্বানুগত্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে তাহা তলাইয়া দেখিতে গেলে বঙ্কিমের বক্তব্য—তাহার যুগমানস ও যুগপ্রস্তুতির ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অনেক সময় অগভীর হৃদয় পাঠকের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখিতে না পারিয়া বঙ্কিম নিজের বক্তব্য পাঠক সমাজকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নিজের মতের দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিম সমাজ নিরপেক্ষ আর্টিষ্ট নন। তিনি কেবল আর্টের জন্যই আর্ট সৃষ্টি করিতে বসেন নাই। যুগ প্রয়োজনে যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে আর যাই হোক মরীচিকা সৃষ্টি হয় নাই। ঝড়ঝঞ্ঝার যুগে ব্যক্তিচরিত্র তথা জাতীয় চরিত্র গঠনের পরিকল্পনা বঙ্কিমের মতেই স্থিতধীর পক্ষেই সম্ভব। বঙ্কিমের এই তত্ত্ব অবতারণা বাঙালীকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছিল—বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনাকে কি ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা এখনও অনেকে ভুলেন নাই। বঙ্কিম যে যুগের পট-ভূমিকায় কাহিনী রচনা করিয়াছেন, সেই যুগ এই অনুশীলনতত্ত্বের জন্য ততখানি প্রস্তুত ছিল না। সেই কারণেই আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম উপন্যাস ত্রয়ীতে বক্তব্যটি পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাহার সঙ্গে পরিচয় ঘটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা তাহার শিল্পসৃষ্টির অক্ষমতা নয়—জাতীয় জীবন গঠনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ইহার মূলে রহিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে প্রফুল্লর শিক্ষা সমাপ্ত হইল। প্রফুল্ল কর্মের পথ গ্রহণ করিবে বলাতে ভবানী ঠাকুর তাহাকে চিত্ত সংযত করিয়া, সর্বপ্রকার আসক্তি শূন্য হইয়া, সকল কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার উপদেশ দিলেন। প্রফুল্ল নিষ্কাম কর্মব্রত উদ্‌যাপনের সংকল্প গ্রহণ করিল। প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরকে ডাকাতি করা হইতে নিবৃত্ত হইবার অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিলেন যে তিনি ধনের লোভে ডাকাতি করেন না। দেশে ধনী ও শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা দরিদ্র-উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার

বর্ণনা দিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন যে, জমিদার-ইজারাদারদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে সংগৃহীত অর্থ কাড়িয়া আনিয়া দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করাই তাঁহার ডাকাতির একমাত্র উদ্দেশ্য। ভবানী ঠাকুরের কাছে দরিদ্র নির্যাতনের বিস্তারিত কাহিনী শুনিয়া প্রফুল্লর হৃদয় গলিয়া গেল। সে ভবানী ঠাকুরের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে চাহিল এবং তাহার ধনের কিছু অংশ দরিদ্রগণের দুঃখ নিবারণের জন্য ব্যয় করিবে স্থির করিল। স্বামী-সৌভাগ্য বঞ্চিতা প্রফুল্ল এই ভাবে দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হইল।

টীকা: তোমার হস্তগত ধন তোমার ইচ্ছামত ব্যয় করিও—প্রফুল্লর শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। এখন সে প্রয়োজনানুসারে অর্থ ব্যয় করিবে। যে নিষ্কাম ধর্মে সে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাতে অর্থের মোহ আর তাহার নাই।

কর্ম করিব—প্রফুল্ল জানে জ্ঞানের পথ কঠিন—কাজেই সে কর্মের পথ বাছিয় লইল। ভবানী ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, ইন্দ্রিয় সংযম, নিরহঙ্কার ও সর্বকর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ ব্যতীত তপোসক্ত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। প্রফুল্ল নিষ্কাম কর্মব্রত গ্রহণ করিবে বলিয়া জানাইল।

তস্মাদসক্তঃসততং……পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥—শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের উনিশ সংখ্যক শ্লোক। ইহার অর্থ এই—পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠান করিলেই চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান কর।

নিরহঙ্কার—আমিই সব করিলাম, আমিই কর্তা এইরূপ অহংবোধের নাম অহংকার; এই বোধ ত্যাগ করিতে না পারিলে কর্মানুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি……কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥—শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশ সংখ্যক শ্লোক। ইহার অর্থ এই—সকল প্রকার কর্ম (লৌকিক ও বৈদিক) প্রকৃতির গুণ সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা) নিষ্পন্ন হইতেছে, কিন্তু অহংকার বিমূঢ় ব্যক্তি নিজেকে ঐ সকল কার্যের কর্তা বলিয়া মনে করে। [কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও নিজেই কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করেন না, তিনি জানেন, কর্ম—ভগবানের কর্ম—এবং তিনিই কর্ম করাইতেছেন।]

যৎ করোষি……তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥—শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার নবম অধ্যায়ের সাতাশ সংখ্যক শ্লোক। ইহার অর্থ এই—হে কৌন্তেয় (অর্জুন), যাহা কর, যাহা খাও, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, তাহার সকলই আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) সমর্পণ কর। [এইরূপ করিতে পারিলে কর্মে আসক্তিজনিত শুভাশুভ ফলরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।]

তিনি সর্ব্বভূতস্থিত—ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান। জীবের সেবাতেই তাঁহার সেবা হয়।

যো মাং পশ্যতি······স যোগী পরমো মতঃ॥—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রিশ, একত্রিশ ও বত্রিশ সংখ্যক শ্লোকত্রয়। ইহাদের অর্থ এই—যে আমাকে সর্বত্র দর্শন করে এবং আমাতে জীবমাত্রকে দেখিতে পান, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না॥ যে সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে নিজের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া ভজনা করে, সেই যোগী যে কোনো রূপে বর্তমান থাকিয়াও, আমাতে অবস্থান করে॥ হে অর্জুন, যে সর্বজীবে সুখ বা দুঃখকে আত্ম-তুলনায় সমান করিয়া দেখে, সেই যোগী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়॥

কিছু দোকানদারি চাই—ভবানী ঠাকুরের মতে, কিছু বাহ্যাড়ম্বর বা জাঁক-জমকের প্রয়োজন। প্রফুল্লকে রাণী সাজিতে হইবে। লোকের চোখে বিস্ময় জাগাইতে হইবে। **আমি ধনের জন্য ডাকাইতি করি না**—দরিদ্রের সাহায্যের জন্যই ভবানী ঠাকুর ডাকাতি করেন। তিনি নিপীড়িতকে রক্ষা করিবার জন্য নিপীড়ককে শাসন করেন। **তাঁর কর্মের জন্য যাহা করিতে হয় করিব**—প্রফুল্ল সর্বকর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবার জ্ঞান অর্জন করিয়াছে। কাজেই কর্মব্রতে সুখদুঃখ কিছুতেই সে উতলা হয় না। **ভবানী ঠাকুরের একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল**—যে অস্ত্রের দ্বারা তিনি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করিবেন। এই অস্ত্র পুরুষ হইলে আরও ভালো হইত। কিন্তু প্রফুল্লর মধ্যে যেগুণ ছিল, সেই গুণ ও লক্ষণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই। প্রফুল্লর উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস, এবং ধনসম্পদ ছিল। ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্রের এ সকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। **ভবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল**—ভবানী ঠাকুর একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন কেন প্রফুল্ল একাদশীতে মাছ খাইত। তাহা হইলে প্রফুল্ল যে সধবা তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু অতি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও ভুল হয়।

ডাকাতে কাড়িয়া লয়। এই কারণে দেবী সিংহের খাজনা বাকি পড়ায় সে তাঁহার দশ হাজার টাকা মুল্যের তালুক আড়াই শত টাকায় কিনিয়া লইল। তাহাতেও ঋণ শোধ না হওয়ায় হরবল্লভ একটা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এদিকে সম্পত্তি কমিয়া আসায় তাঁহার জমিদারীর আয় কমিয়া আসিল বটে, কিন্তু ব্যয় কমিল না। ক্রমশ ঋণের অঙ্ক বাড়িয়া পঞ্চাশ হাজার টাকায় দাঁড়াইল। দেবী সিংহ টাকা না পাইয়া হরবল্লভের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির করিল।

ব্রজেশ্বর পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য অর্থের সন্ধানে বাহির হইল। ব্রজেশ্বরের শ্বশুর সাগরের পিতা বর্ধিষ্ণু লোক। কাজেই ব্রজেশ্বর তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কিন্তু তিনি টাকা দিতে সম্মত না হওয়ায় শ্বশুরজামাতায় মনোমালিন্য হইল। ব্রজেশ্বর শাশুড়ী বা সাগরের কোনো অনুরোধ রক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিবার সময় নূতন বিপদ সৃষ্টি হইল। সাগর যখন ব্রজেশ্বরের পায়ে ধরিয়া অনুনয় জানাইতেছিল, তখন ব্রজেশ্বর জোরে পা টানিয়া লইবার সময় সাগরের গায়ে আঘাত লাগায় সে মনে করিল স্বামী তাহাকে পদাঘাত করিল। সাগর ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজেশ্বরকে যা বলিতে যাইতেছিল—ঠিক সেই সময় ঘরের বাহিরে দেবী চৌধুরাণীর আকস্মিক আবির্ভাব ঘটায় এবং দেবী নিজেও সাগরের মুখের কথা সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াইল যে, সাগর যদি ব্রাহ্মণ কন্যা হয় তবে ব্রজেশ্বর ভৃত্যের ন্যায় তাহার পা টিপিয়া দিবে। ব্রজেশ্বরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল যে যতদিন পা টিপিতে বাধ্য না হয় ততদিন সে সাগরের মুখদর্শন করিবে না। ব্রজেশ্বর চলিয়া যাইতে দেবীরাণী ও সাগরের দেখা হইল।

দেবী চৌধুরাণীর কৌশলে রঙ্গরাজের সহায়তায় ব্রজেশ্বরের বজরা ধরা পড়িল। রঙ্গরাজ ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া দেবীর বজরায় লইয়া আসিল। দেবীর বজরায় আগেই সাগর উপস্থিত ছিল। সেখানে দেবী ও নিশির কৌশলে ব্রজেশ্বরকে সাগরের পা টিপিতে হইল। ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাগরের মান-অভিমান শেষ হইবার পর আহারাদি শেষে দেবীরাণীর সঙ্গে ব্রজেশ্বরের দেখা হইল। ব্রজেশ্বর দেবীরাণীকে প্রফুল্ল বলিয়া চিনিতে পারিল না। তবে তাহার মুখখানি দেখিয়া দশ বৎসর আগের প্রফুল্লর মুখ মনে পড়িল। কিন্তু মিথ্যা প্রচারে প্রফুল্ল এখন ব্রজেশ্বরের কাছে মৃতা। দেবীকে দেখিয়া পূর্বস্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠায় ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণের জন্য যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। দেবীরাণী সাগরের নিকট হরবল্লভের বিপদের কথা শুনিয়াছিল। সে ব্রজেশ্বরকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মোহর ধারস্বরূপ দিল। একটি বিশেষ দিনে ধার শোধ করার শর্ত হইল। দেবীরাণী কুটম্বের মর্যদাস্বরূপ ব্রজেশ্বরের হাতে আংটি পরাইয়া দিতেছিল, তখন প্রফুল্ল-স্মৃতি ভারাক্রান্ত ব্রজেশ্বর বিবশ হইয়া দেবীর অশ্রুসিক্ত মুখচুম্বন করিল।

পরক্ষণেই নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া ছিপে গিয়া উঠিল। সাগরকে লইয়া ফিরিবার পথে আংটিতে নিজের নাম খোদাই দেখিয়া এবং সাগরের নিকট সব শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে দেবীরাণীই প্রফুল্ল। তাহার মৃত্যুর কথা মিথ্যা রটনা মাত্র। কিন্তু প্রফুল্ল ডাকাতি করে ভাবিয়া ব্রজেশ্বরের মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

এদিকে আবার ব্রজেশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া দেবীরাণীর জীবনেও বিপর্যয় দেখা দিল। সে বজরায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নিশি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে নিষ্কাম ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন করার প্রয়াস পাইল। কিন্তু দেবীর মন যেন রাণীত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি চায়। তাই সে রাণীগিরিতে ইস্তফা দিবার জন্য ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। দেবীর কথা শুনিয়া ভবানী ঠাকুর বিচলিত হইয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, নিজেকে খ্যাতি-অখ্যাতির উর্ধ্বে রাখিবার পরামর্শ দিলেন। প্রসঙ্গত হরবল্লভকে সাহায্য করার কথা উঠিলে ভবানী ঠাকুর বলিলেন যে হরবল্লভের ন্যায় নীচ ব্যক্তিকে সাহায্য করা ভালো হয় নাই। কারণ সে তাহার পুত্রবধূকে অন্যায় ভাবে ত্যাগ করিয়াছে। দেবী বুঝিল যে, ভবানী ঠাকুর তাহাকে না চিনিলেও তাহার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। সম্প্রতি কিছু লোক ইজারাদারদের অত্যাচারে অনশন করিতে বসিয়াছে শুনিয়া দেবীরাণী তাহাদের অর্থসাহায্য দিবার জন্য দরবার ডাকিতে বলিল। এক সোমবারে জঙ্গলে দেবীর দরবার বসিল। দেবী দশ হাজার লোককে সাহায্য দান করিল। এদিকে রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাণ্ড সাহেবের কাছে যে খবর গেল তাহাতেও তিনি বুঝিলেন যে দেবী চৌধুরাণীর দল অনেক ডাকাতি করিয়া বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে জমায়েত হইয়াছে এবং দলের লোকে অনেক টাকা লইয়া ফিরিতেছে।

ব্রজেশ্বর হরবল্লভকে দেবীরাণীর নিকট টাকা পাওয়ার কথা এবং বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে তা ফেরত দিবার শর্তের কথা বলিল। হরবল্লভ প্রথমে একটু অস্বস্তি বোধ করিলেও পরে টাকা দিবার পরিবর্তে তাহাকে ইংরাজের হাতে ধরাইয়া দিবার বুদ্ধি করিলেন। এই অভিসন্ধির কথা তিনি কাহাকেও জানাইলেন না। বাড়িতে ব্রজেশ্বরের আবার বিবাহ দিবার কথা উঠিল। ব্রজেশ্বর বলিল যে, মা বাবা যা বলিবেন সে তাই করিবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল শ্বশুর বাড়ি হইতে প্রত্যাখ্যাত হইবার পর দশ বৎসর হইয়াছে। এর মধ্যে হরবল্লভের সময় ভালো কাটে নাই। ইজারাদার দেবী সিংহের খাজানা জোগাইতে গিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হইলেন। তবুও প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবী সিংহের পাওনা

হিসাবে বাকি পড়িল। হরবল্লভ ধীরে ধীরে দরিদ্র হইয়া গেলেন। অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও জমিদারী ঠাট ছাড়িতে পারিলেন না, কাজেই তাঁহার উল্লিখিত টাকা বাকি পড়িল। দেনার দায়ে হরবল্লভের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইল।

টীকাঃ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। দেবী সিংহ গঙ্গাগোবিন্দের প্রিয়পাত্র ছিল।

তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না—দেনার দায়ে সব যাইতে বসিয়াছে, তবুও হরবল্লভ জমিদারী চাল ছাড়িতে পারেন না। ফলে তিনি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন।

সব তখন বে-আইন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বিধিবদ্ধ কোনো আইন প্রচলিত ছিল না, কোম্পানী কর্তাদের এবং তাহাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের খেয়াল-খুশিতেই আইন তৈয়ারি হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর পিতাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার মানসে অর্থের জন্য তাহার শ্বশুর সাগরের পিতার নিকট আসিল। সাগরের পিতা বর্ধিষ্ণু লোক। তিনি জামাইকে পাইয়া আদর আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। ব্রজেশ্বরের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা শুনিয়া তিনি হরবল্লভের জন্য টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন। এই ব্যাপারে শ্বশুর-জামাতায় মন কষাকষি হইল। ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ি হইতে চলিয়া যাইবে ঠিক করিল। তাহার শ্বাশুড়ী ও স্ত্রী সাগর অনেক অনুরোধ করিল। তবু ব্রজেশ্বর অটল। ইতিমধ্যে অনিচ্ছাকৃত এবং অপ্রত্যাশিত পরিবেশে একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। সাগর যখন ব্রজেশ্বরের পা ধরিয়া অনুনয় করিতেছিল তখন সজোরে পা টানিয়া লইবার সময় সাগরের গায়ে আঘাত লাগে। স্বামী পদাঘাত করিয়াছে ভাবিয়া সাগর প্রতিজ্ঞা করিল যে যদি সে সত্যই ব্রাহ্মণ কন্যা হয় তাহা হইলে ব্রজেশ্বর একদিন তাহার পা টিপিয়া দিবে। সাগরের প্রতিজ্ঞার শেষ অংশটি কিন্তু তাহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের জানালার বাহিরে দেবী চৌধুরাণী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে-ই সাগরের প্রতিজ্ঞার শেষ অংশটুকু পূরণ করিয়াছিল। ব্রজেশ্বর চলিয়া যাইবার পর সাগরের সঙ্গে দেবীর দেখা হইল। দেবীর নাম শুনিয়া সাগর প্রথমে ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেও পরে তাহাকে চিনিতে পারায় উভয়ে হাসিল।

টীকাঃ দুই চারিটা প্রাচীন তামাশা—জামাই লইয়া রসিকতা করা শুধু প্রাচীন যুগে নয় এখনও বাংলা দেশে প্রচলিত আছে।

সে নাম অতি ভয়ানক—দেবী চৌধুরাণী নিজের নাম বলায় সাগর ও তাহার পরিচারিকা ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। কারণ এই নাম তাহাদের জানা ছিল। দেবী চৌধুরাণী নামটাই সকলের ভয়ের কারণ ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকালের এক জ্যোৎস্নাপ্লুত রজনীতে দেবীরাণীর বজরা ত্রিস্রোতা নদীর কূলের কাছে বাঁধা। কাছেই একখানি ছিপে রঙ্গরাজ তাহার দল লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। বজরার ছাদে গালিচার উপর দেবীরাণী বসিয়া নিপুণ হস্তে বীণা বাজাইতেছে। নদী, দেবীরাণী, বীণার ধ্বনি, জ্যোৎস্নাপ্লুত রাত্রির সৌন্দর্য এবং দেবীরাণী বসনভূষণ সব মিলিয়া এক অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। হঠাৎ বীণায় নূতন সুর বাজিতেই রঙ্গরাজ নিঃশব্দে দেবীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবী দূরবীণ দিয়া দূরে একখানি বজরা দেখাইয়া দিয়া ছিপ খুলিয়া নিঃশব্দে আগাইয়া যাইতে আদেশ করিল। এই বজরায় ব্রজেশ্বর বাড়ি ফিরিতেছিল।

টীকা ঃ বর্ষাকাল, রাত্রি জ্যোৎস্না ইত্যাদি—জ্যোৎস্নাপ্লুত রজনী, নদী ও নারী এবং সেই সঙ্গে বীণাবাদনের এমন অপূর্ব বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের আগে পরে আর কোনো সাহিত্যিকের রচনায় বিশেষ করিয়া নদী ও নারীর যুগল বর্ণনা পাওয়া যায় না। নদীর রূপ ও প্রকৃতি এবং নারীর রূপ ও প্রকৃতির এইরূপ সাদৃশ্য চিত্রন দুর্লভ। একদিকে জ্যোৎস্নাপ্লুত বর্ষাকালের রাত্রির স্নিগ্ধতা, ভরা নদীর উচ্ছল তরঙ্গ বেশ অন্য দিকে নারীরূপের স্নিগ্ধতা ও যৌবনাবেগ তাহার বসনভূষণ ও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীর রূপ, বীণার সুর-তরঙ্গ ও নদীর তরঙ্গ বেশ, নদীতে ভাসমানা কুসুমমানা ও নদীর কল্লোল স্রোতে ভাসমানা বীণার সুরমানা—এই অসাধারণ বর্ণনা বঙ্কিমের অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় জ্ঞাপন করে। ত্রিস্রোতার রূপ ও দেবীর রূপ যেন এই বর্ণনার কৌশলে এক হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতরসিক বঙ্কিম নিপুণভাবে নানা রাগ-রাগিণীর ভাবরূপও এইখানে পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

মুরদ—মূর্তি ; **টেকের মাথায়**—নদীর বাঁকের কাছে। **উজাইয়া যাও**—আগাইয়া যাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবীরাণীর বজরার কাছেই একখানি যাট হাত লম্বা ছিপ পঞ্চাশজন লোক লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রঙ্গরাজের আদেশ পাওয়া মাত্রই তাহারা ছিপ আনিয়া

দেবীরাণীর বজরায় লাগাইল। পঞ্চাশ জন লোক রঙ্গরাজের অনুচর। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত ছিল। রঙ্গরাজ অস্ত্র লইয়া ছিপে উঠিয়া বসিল। ছিপ নিঃশব্দে ব্রজেশ্বরের বজরার দিকে আগাইয়া চলিল। কোনোরূপ হতাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য দেবীরাণী রঙ্গরাজকে স্মরণ করাইয়া দিয়া ছিল। রঙ্গরাজ কৌশলে ব্রজেশ্বরের বজরা দখল করিল। তাহার আটজন হিন্দুস্থানী রক্ষকই বন্দী হইল। ব্রজেশ্বর বজরার যে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল রঙ্গরাজ সেখানে উপস্থিত হইয়া দরজা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া কিছুক্ষণ হাতাহাতির পর ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিল। দেবীরাণীর বজরায় তাহাকে বন্দী হইয়া যাইতে হইবে বলায় ব্রজেশ্বর নিজের বজরার সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দেবীরাণীকে দেখার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য রঙ্গরাজের সঙ্গে গেল।

টীকা ঃ ছিপ—এক ধরনের লম্বা নৌকা—ইহা খুব তাড়াতাড়ি চলিতে পারে। **বোটে**—বইঠা। **আগে যাহা……মনে থাকে যেন**—সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই ব্রজেশ্বরকে ধরিয়া আনা প্রয়োজন। সেই কারণে কোনো প্রকার মারামারি রক্তারক্তির প্রয়োজন নাই। এই কথাই রঙ্গরাজকে স্মরণ করাইয়া দিল। বোধ হয় দেবীরাণীরও ব্রজেশ্বরকে দেখিবার সাধ ছিল। **ছিপ তফাৎ**—ছিপ দূরে লইয়া যাও।

বেগোছ—বেসামাল, অবস্থা সুবিধার নয়। **হাতিয়ার**—অস্ত্র। **ভেড়ীওয়ালা**—যাহারা ভেড়া চড়ায়। **কারপরদাজ**—আজ্ঞাবহ ভৃত্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রঙ্গরাজ ব্রজেশ্বরকে লইয়া দেবী চৌধুরাণীর বজরার পাশে ছিপ ভিড়াইল। দেবী বজরার ছাদে বসিয়া বীণা বাজাইতেছিল। ছিপ ফিরিতে দেখিয়া সে বজরার ভিতরে গেল। রঙ্গরাজ দেবীর প্রকোষ্ঠের নিকট আসিতেই দেবী উভয়পক্ষে কেহ হতাহত হইয়াছে কিনা জানিতে চাহিল। কোনো পক্ষে খুন জখম হয় নাই শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রজেশ্বরকে হাজির করিবার আদেশ দিল। ব্রজেশ্বর দেবীর প্রকোষ্ঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেবীর নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। ব্রজেশ্বরের উপস্থিতি দেবীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সে আর প্রশ্ন করিতে পারিল না। তখন তাহার পরিবর্তে নিশি আসিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। পর্দার আড়ালে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে ব্রজেশ্বরের গোল বাধিল। বন্দী ব্রজেশ্বর এক কাণা কড়িতে ঐ বজরায় বাসকারিণী এক নারীর কাছে বিক্রীত হইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হইল।

টীকাঃ দেবী অন্যমনা হইতেছিল—ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনিতে বলার পরে দেবী বজরার ছাদে বসিয়া বীণা বাজাইতেছিল। কিন্তু বীণায় সুর তেমন ভালো বাজে না। ব্রজেশ্বরের চিন্তায় দেবী বিভোর—বারবার অন্যমনা হইয়া পড়িতেছিল। **গলার আওয়াজটা বড় সাফ নয়**—ব্রজেশ্বরের সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া দেবীর অব্যক্ত বেদনায় গলা ধরিতেছিল। তাই কথাগুলিও যেন দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠের বলিয়া মনে হইতেছিল।

আমি আর রঙ্গ করিতে পারি না—দেবীর আর অভিনয় বা ছলনা করিতে ইচ্ছা হয় না। সবকিছু জানিয়াও তাহার একান্ত প্রিয়জনকে প্রশ্ন করিতে বুকে ব্যথা বাজে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া—তাহার বিচিত্র কারুকার্য, চিত্রকলা ও ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্মিত হইল। সেই কক্ষে মসনদের উপর একজন স্ত্রীলোক মুখ আবৃত করিয়া শুইয়া আছে। ব্রজেশ্বর তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখিতে পাইল না। সে ভাবিয়াছিল এই স্ত্রীলোকই বোধ হয় দেবী চৌধুরাণী, কিন্তু কথা কহিয়া বুঝিল যে, এ সেই স্ত্রীলোক যে তাহাকে এক কাণা কড়ি দিয়া কিনিয়াছে। স্ত্রীলোকটি বিকৃত কণ্ঠে কথা কহিতেছিল। ব্রজেশ্বর রান্না করা, জল তোলা, কাঠ কাটা প্রভৃতি কোনো কাজ জানে না বলায় তাহাকে স্ত্রীলোকটি পা টিপিতে আদেশ করিল। অসহায় ব্রজেশ্বর উপায় না দেখিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করিলে স্ত্রীলোকটি দেবীকে ডাকিয়া তাহা দেখাইতে গেল। সেই সময় তাহার স্বাভাবিক কণ্ঠ শুনিয়া ব্রজেশ্বর চমকিয়া উঠিতেই স্ত্রীলোকটি মুখের আবরণ সরাইতে দেখিল যে স্ত্রীলোকটি আর কেহ নয়—তাহারই কনিষ্ঠা স্ত্রী সাগর। সাগরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। সে নিজেকে যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে বলিয়া প্রমাণ করিল।

ব্রজেশ্বর সাগরকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দেবীর বজরায় তাহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—সাগর বলিল যে তাহার প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য সে দেবীরাণীর সাহায্য লইয়াছে। ইতিমধ্যে নিশি আসিয়া বলিয়া গেল যে, ব্রজেশ্বরের সব কিছু ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সাগরকে তাহার সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। নিশির কথায় স্বীকৃত হইতেই নিশি চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর সাগরকে অনুযোগ করিয়া বলিল যে, সে কেন ডাকাতের সঙ্গে আসিয়াছে। সাগর বলিল, দেবীরাণী সম্পর্কে তাহার ভগিনী হয়। নিশি ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপে যোগ দিল। সাগর তাহাকে

পরিপাটি করিয়া জলযোগ করাইল। ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা স্বয়ং দেবীরাণীই দিবেন বলিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে অন্য একটি কক্ষে লইয়া গেল।

টীকা ঃ বিচিত্র চারু চিত্রিত—নানা সুন্দর চিত্রে পরিপূর্ণ।

শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ—দেবী চণ্ডীর সঙ্গে স্বর্গ বিজয়ী শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দৈত্যদ্বয়ের যুদ্ধ। **মহিষাসুরের যুদ্ধ**—দেবী দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধ। **দশ অবতার**—মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি এই দশ অবতারের চিত্র। **অষ্ট নায়িকা**—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, নন্দিনী, নারসিংহী, অপরাজিতা ও কুমারী। **সপ্ত মাতৃকা**—ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, ইন্দ্রা, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা। **দশমহাবিদ্যা**—সতীর দশরূপ—যথা, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা। **কৈলাস**—হরপার্ব্বতীর লীলাস্থানরূপ হিমালয় পর্বত শৃঙ্গ। **বৃন্দাবন**—রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। **লঙ্কা**—রাবণের ঐশ্বর্যময়ী লঙ্কা। **ইন্দ্রালয়**—স্বর্গপুরী। **নবনারী-কুঞ্জর**—কৃষ্ণ প্রীত্যার্থে নয়জন গোপনারীর কুঞ্জর বা হস্তীর আকৃতি গঠন। **বস্ত্রহরণ**—কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীদের বস্ত্র হরণ। **মসনদ**—সিংহাসন। **কামদার বিছানা**—বিচিত্র কারুকার্যখচিত বিছানা। **হরবোলা**—যে নানা কার্য অনুকরণ করিতে পারে। **নাচার**—নিরুপায়।

গঙ্গা নই—যমুনা নই—বিল নই—খাল নই—সাক্ষাৎ সাগর—সাগরের এই ছোট কথাটির মধ্যে অনেকে অসাধরাণ অনেক কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন। মনে হয়, সাগর যাহা বলিয়াছে তাহা কোনো তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বলে নাই। ব্রজেশ্বর তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়াছিল 'তুমি সাগর?' তাহারই উত্তরে সে বলে—আমি নদী নই, খাল-বিল নই আমি সাগর অর্থাৎ আমি সাগর ছাড়া আর কেহ নই। এই কথার একটি নিহিতার্থও বাহির করা যায়। সাগরের কথার এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে—সাগর গঙ্গা যমুনার মতো পবিত্রতায় প্রতীকও নয় আবার খাল-বিলের মতো সঙ্কীর্ণতার প্রতীকও নয়। সে এই দুইয়েরই উর্দ্ধে। সে প্রফুল্লও নয়, নয়ান বৌও নয়, সে নামে ও রূপকার্থে সাগরই বটে। তবে বিস্মিত ব্রজেশ্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া সাগর এত ভাবিয়া বলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এই একটা কপর্দক—এই পোড়ার মুখা সাগর—নিশির এই উক্তিতে সাগরের প্রতি তাহার আন্তরিক ভালোবাসা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহারা ব্রজেশ্বরের এক কপর্দকও গ্রহণ করিবে না। তবে তাহার একটি কপর্দক হিসাবে যে সাগর আছে

তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিতেছে। এই কথায় ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইল। পরে আরও শুনিল যে তাহারা ডাকাতি করিবার জন্য ব্রজেশ্বরের বজরা আক্রমণ করে নাই ; সাগরের প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্যই ডাকাতি করিয়াছিল। তাহাতে ব্রজেশ্বরকে ধরিয়া আনিয়া সাগরের কাছে উপস্থিত করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশি ব্রজেশ্বরকে দেবীরাণীর শয্যাগৃহে লইয়া গেল। সেখানে সে অর্ধঅবগুণ্ঠনবতী লজ্জাবনতমুখী একজন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইল। বলা বাহুল্য, দেবীরাণী সকল ঐশ্বর্য-আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া সামান্য বেশভূষায় ব্রজেশ্বরের সম্মুখে আসিল। নিশি চলিয়া যাইবার পর দেবী ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলে ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এখানে তাহাকে আর কেহ ত প্রণাম করে নাই। দেবীর মুখ দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। ঐ মুখ দেখিয়া ব্রজেশ্বরের প্রফুল্লর মুখ মনে পড়িল। কিন্তু প্রফুল্ল ত বাঁচিয়া নাই। তবুও চেহারার সাদৃশ্য ব্রজেশ্বরের মন ব্যাকুল হইল। তাহার চোখে জল দেখা দিল। ভাবিল—যদি এই মুখ আর সেই মুখ এক হইত। দেবীরাণীরও একই অবস্থা। কিন্তু সে ব্রজেশ্বরকে চিনিত। দেবী ব্রজেশ্বরকে এক কলসী মোহর ঋণ হিসাবে দিতে চাহিল। ব্রজেশ্বরের কুণ্ঠা দেখিয়া সে বলিল যে, এই অর্থ চুরি-ডাকাতির নহে। ইহা তাহার নিজস্ব। ব্রজেশ্বর অর্থগ্রহণে সম্মত হইয়া ঋণ পরিশোধের কথা বলিলে—দেবী বলিল যে, দেব-সেবায় ব্যয় করিলেই তাহার ঋণ শোধ করা হইবে। তবুও অর্থ পরিশোধ করার জন্য ব্রজেশ্বর পীড়াপীড়ি করায় দেবী বলিল যে বৈশাখ মাসের শুক্লাসপ্তমীর রাত্রে চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত এই ঘাটেই থাকিবে। ঐ রাত্রে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে। তবে ব্রজেশ্বর ছাড়া আর কেহ আসিলে তাহার দেখা পাইবে না। ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইলে মোহরের কলসীটি ছিপে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিল। ব্রজেশ্বর আশীর্বাদ করিয়া ছিপে উঠিতে যাইবার পূর্বে দেবীরাণী তাহার যোগ্য মর্যাদা স্বরূপ যখন একটি আংটি খুলিয়া তাহার আঙুলে পরাইতেছিল তখন দুই ফোঁটা চোখের জল ব্রজেশ্বরের হাতে পড়িল। ব্রজেশ্বর সংযমের পরিচয় দিলেও—প্রফুল্লর সঙ্গে দেবীর মুখের সাদৃশ্য এবং দেবীর অশ্রু তাহাকে আত্মবিস্মৃত করিল। সে দেবীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া স্মৃতি-বিস্মৃতির আঘাতে জর্জরিত হইয়া—স্থানকাল ভুলিয়া গিয়া দেবীরাণীকে চুম্বন করিল। পরে হঠাৎ সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া তাহার মনে হইল, কি করিলাম! ব্রজেশ্বর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ছিপে উঠিল। সাগরও তাহার সঙ্গে গেল। ব্রজেশ্বর যাইবার পর বিবশা দেবীরাণী বজরার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নিশি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া

নিষ্কামধর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে দেবীর মন তাতে সায় দিল না। নিশি তখন দেবীকে সংসারে ফিরিয়া যাইতে বলিলে, দেবী বলিল যে সংসারের পথ খোলা থাকিলে এপথে কখনও আসিত না।

টীকাঃ নিশির বুদ্ধিতে·····ঐশ্বর্যের ফাঁদ পাতিয়াছি!—দেবীরাণী প্রথমে কিন্তু মনে মনে ভাবিয়াছিল যে তাহার স্বামীকে সে ঐশ্বর্য সম্পদ দেখাইয়া ভুলাইবে। নিশির বুদ্ধিতে প্রথমে ভুল করিয়া পরে বুঝিতে পারিল স্বামীকে ভুলাইবার জন্য আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেও অশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে প্রফুল্লর মনের এই আভিজাত্য প্রকাশ পাইয়াছিল।

দুইখানা মেঘেই বৈদ্যুতি ভরা—মেঘ দুইখানি বলিতে ব্রজেশ্বর ও দেবীকে বুঝাইতেছে। দুইজনের মধ্যে অশ্রুপূর্ণ মেঘ জমাট হইয়া আছে। দেবীর মুখের সঙ্গে প্রফুল্লর মুখের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া ব্রজেশ্বর নিজেকেই হারাইয়া ফেলিল। দেবী নিজের সম্মুখে স্বামীকে পাইয়াও দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। দুইজনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড়ের আভাস বর্তমান। যদি দুইজনই পরস্পরের অন্তরের কথা জানিতে পারিত—তাহা হইলে বিরাট বিপর্যয় দেখা দিতে পারিত।

দেবী সেই মানসিক গোলযোগে·····পরাইতে লাগিল—দেবী ব্রজেশ্বরের যোগ্য মর্যাদা স্বরূপ তাহার আঙুলে আংটি পরাইয়া দিতে গেল। ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয় হইলেও একদিকে প্রফুল্লব স্মৃতি অন্যদিকে দেবীর মুখে প্রফুল্লের মুখের সাদৃশ্য তাহাকে ক্ষণিকের জন্য সংকল্পচ্যুত করিল। ব্রজেশ্বরের এই দুর্বলতা—ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ মানুষেরই দুর্বলতা। ইহা অস্বাভাবিক নহে। মুহূর্তের জন্য স্থানকাল পাত্র ভোলা মানুষেরই ধর্ম। বঙ্কিম নিজেই এই মনের অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'বিধাতা এক এক সময়ে এমনই বাধ সাধেন যে, সময়ে আপন কাজ ভুলিয়া যাইতে হয়।' এইরূপ আকস্মিকতার জন্য মানুষ প্রস্তুত থাকে না। ব্রজেশ্বর যে হঠাৎ দেবীর অশ্রুসিক্ত মুখচুম্বন করিয়াছিল তখন তাহার মনপ্রাণ প্রফুল্ল স্মৃতিতে আবিষ্ট। সেই আবেশই তাহাকে দুর্বল মুহূর্তের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। যখন সে দেবীর মুখখানা তুলিয়া ধরিল 'তখন বুঝি মুখখানা প্রফুল্লর মত দেখিল।' অনেকে বঙ্কিমের এই স্বল্প বিশ্লেষণ বুঝিতে না পারিয়া—বঙ্কিম এই মানসিক অবস্থা বর্ণনায় 'বেসামাল' হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। বস্তুত, মনের যে অবস্থা বিপর্যয়ে এইরূপ ঘটা স্বাভাবিক—বঙ্কিম তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। এখানে নীতি শৈথিল্য বা ইন্দ্রিয় পরবশতার প্রশ্ন শুধু অবান্তর নয়—অজ্ঞতার পরিচায়ক। এখানে পাঠকের মনকে পীড়িত করিবার মতো কোনো অসঙ্গতি প্রকাশ পায় নাই।

'ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয় হইলেও তাহার মনের ভিতরে কি একটা গোলমাল হইয়া গেল'—সে 'হাতটা সরাইয়া লইতে ভুলিয়া গেল।' বঙ্কিম নিজেই বুঝাইয়া দিলেন যে অদৃষ্টের পরিহাসে অনেক সময়ে আপন কাজ ভুলিয়া যাইতে হয়। ইহা বিকারের রোগীর মুখের আবৃত্তির মতো নহে—বরং মানসিক বিকারগ্রস্ত সমালোচকদের কাছেই ইহা সহজবোধ্য হয় নাই।

এই কি তোমার নিষ্কাম ধর্ম?—দেবীরাণীর অশ্রুপ্লাবিত মুখ দেখিয়া নিশি তাহাকে নিষ্কাম ধর্ম ও সন্ন্যাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এতদিন যাহার অনুশীলন করিল তাহার ইহাই কি পরিণতি? দেবীরাণী ইহার কোনো উত্তর দেয় নাই।

সকল ব্রত……ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই:—নিশির এই বক্তব্যে মনে হয়, দেবীরাণী ও ব্রজেশ্বরের সম্পর্ক সম্বন্ধে সে হয় ত জানে নয় ত আঁচ করিয়াছে। না হইলে 'আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই'—কথাটি অর্থহীন হইয়া পড়ে। ব্রজেশ্বরের জন্য দেবীরাণী দুর্বলতা সম্বন্ধে কোনো প্রকার যুক্তিতর্কে না গিয়াই নিশি এই কথাটি বলিয়াছে। এইখানে দেবীরাণী অনেকখানি ধরা পড়িয়াছে। নিশির মতে, নিষ্কামধর্ম পালন সাধারণ স্ত্রীলোকের কাজ নয়—এমন কি প্রায় সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ। একমাত্র নিশির মতো ভোগ-বাসনা রহিত সর্বব্যাপিনী হইতে পারিলে তবেই এই ধর্ম পালন সম্ভব। যাহার স্বামী আছে—সংসার আছে, তাহার দেহ-মন-প্রাণ একেবারে আকাজ্ক্ষা শূন্য হইতে পারে না। দেবী সব ত্যাগ করিয়াও ব্রজেশ্বরের জন্য চোখের জল ফেলিল। কিন্তু নিশির ব্রজেশ্বর একমাত্র সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর—যাহার কাছে সে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছে।

তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া……এখানে আসিতাম না—নিশি দেবী-রাণীকে সন্ন্যাস ধর্ম ছাড়িয়া সংসার ধর্ম পালন করার উপদেশ দিতে দেবীরাণী বলিল যে, উপায় থাকিলে এ পথে আসিত না। দুই জনের উক্তি আলোচনা করা আবশ্যক। নিশি বুঝিতে পারিল, দেবীরাণী দশবৎসর ধরিয়া কঠোর ভাবে নিয়ম পালন যোগাভ্যাস ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া যে মহৎত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে তাহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করিতে পারে নাই। তাই সংসারের বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন দেবীরাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। নিশির মতে সংসার-জীবনই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। দেবীরাণী নিশির অভিমতকে অস্বীকার না করিয়া বলিল যে, সংসার জীবনে ফিরিয়া যাইতে পারিলে সে এই পথ (দস্যুবৃত্তি) অবলম্বন করিত না। দেবীর এই সংক্ষিপ্ত উক্তিতে তাহার জীবনের মূল উপলব্ধির বাঙ্ময়রূপ বিধৃত।

দেবী নিষ্কামধর্মকে গ্রহণ করিলেও তাহার নারীসত্তা তাহাকে সন্ন্যাসজীবনের একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করে নাই। কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন—তাহা হইলে বঙ্কিম এই চরিত্রটি লইয়া তাহার উপর অনুশীলন তত্ত্বের গুরু দায়িত্ব চাপাইলেন কেন? শেষ পর্যন্ত দেবীচৌধুরাণী ত তাহার উপরে আরোপিত তত্ত্বকে ভবানীপাঠক-নির্দিষ্ট জীবনে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই! মনে হয়, ইহার উত্তর নিশিই দিয়াছে। সে বলিয়াছে 'ও সকল ব্রত মেয়ে মানুষের নহে' এবং 'যদি মেয়েকে ওপথে যেতে হয় তবে আমার মত হইতে হইবে।' দেবীরাণীর বৈকুণ্ঠেশ্বর ব্রজেশ্বর—আর নিশির ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর। বঙ্কিমের মতে, এই ব্রতের জন্য পুরুষ হইলেই ভালো হইত। বিশেষত দেবীরাণীর মতো বিবাহিতা নারীর জীবনে এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইলেও তাহার দ্বারা সে হয়ত গার্হস্থ্য জীবনকে আরও সুন্দর, সংযত সংহত করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু সন্ন্যাসিনী-জীবন যাপন তাহার পক্ষে সহজ নয়। দেবীরাণী দস্যুদল নেত্রী হইলেও তাহার চিরন্তন নারী-প্রকৃতি সজীব ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর নিজের নৌকায় আসিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। সাগরের সঙ্গে প্রথমে কথা বলিল না। দেবীচৌধুরাণীর বজরা দ্রুতগতিতে যাইতে দেখিয়া ব্রজেশ্বর সাগরকে জিজ্ঞাসা করিল, বজরা কোথায় যাইতেছে। সাগর বলিল—একমাত্র দেবীই জানে কোথায় যাইবে। ইহার পর দেবীচৌধুরাণী সম্বন্ধে আরও কিছু কথা হইল। ব্রজেশ্বর দেবীর সঙ্গে সাগরের কি সম্পর্ক, দেবী কি ডাকাতি করে, ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে সাগর বলিল যে, দেবী সম্পর্কে তাহার জ্ঞাতি ভগিনী হয়। দেবী ডাকাতি করে না। লোকে বলে সে দেবদত্ত ধন লাভ করিয়াছে। তাহার যা কিছু আছে সবই পরের জন্য। আছে বলিয়াই সে বিলাস ব্যসনে মত্ত নয়। তাহার খাওয়া-পরা-থাকা সাধারণ মানুষের মতো। কথা প্রসঙ্গে সাগর ব্রজেশ্বরকে দেবীরাণীর দেওয়া আংটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে দেবী তাহাকে ব্রাহ্মণ ভোজনের মর্যাদা স্বরূপ দিয়াছে। সাগর আংটিটি পরখ করিয়া বলিল যে তাহাতে ফারসীতে দেবীচৌধুরাণীর নাম লেখা আছে। সাগর আংটির ব্যাপার সবই জানিত। ব্রজেশ্বর আংটির খোদাই করা লেখা পড়িতে গিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহাতে তাহার নিজের নাম লেখা আছে। সে ব্যাকুল হইয়া দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সাগর বলিল যে দেবী চৌধুরাণী আর কেহই নহে—প্রফুল্ল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লর নাম শুনিয়া প্রথমে খুবই আহ্লাদিত হইল। পরে অবসন্ন ব্রজেশ্বর সাগরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইল। সাগরের কোনো কথার উত্তর দিল না। শুধু একবার বলিল, 'প্রফুল্ল ডাকাত! ছিঃ'।

এই পরিচ্ছেদে সাগরের চরিত্রের মাধুর্য ও মহিমা অবশ্য স্বীকার্য। প্রথমদিন হইতেই সাগর প্রফুল্লকে ভালোবাসিয়াছিল। সতীন হইলেও কোনো প্রকার ঈর্ষ্যা তাহার কথায় বা ব্যবহারে প্রকাশ পায় নাই। এই পরিচ্ছেদে সেই ভালোবাসা শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছে। দেবীচৌধুরাণী সম্বন্ধে তাহার সশ্রদ্ধ মনোভাব আমাদের অভিভূত করে।

টীকাঃ ডাকাতির সমান…তবু বিশ্বাস হয় না সে ডাকাতি করে—দেবী তাহার উপর ডাকাতি করিয়া কিছু লইল না—অথচ ডাকাতের প্রধান লক্ষণগুলিও বর্তমান এই ধারণা ব্রজেশ্বরের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করিয়াছে।

এ যে আমার নাম—আমার আংটী ঃ—এতক্ষণ উত্তেজনার বশে ব্রজেশ্বর আংটিটি যাচাই করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। আংটিতে যখন নিজের নাম খোদাই দেখিল তখন তাহার পুরাতন কথা মনে পড়িল। এই আংটি সে প্রফুল্লকে দিয়াছিল, তাই সে সংশয়ব্যাকুল কণ্ঠে সাগরের কাছে দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

অনির্বচনীয় আহ্লাদের চিহ্ন ঃ—প্রফুল্ল জীবিত আছে এবং ব্রজেশ্বর তাহারই সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিল ভাবিয়া আহ্লাদিত হইল। সেই আনন্দের ভাব তাহার চোখে মুখে প্রকাশ পাইল।

সব যেন নিবিয়া গেল ঃ—প্রফুল্লকে কাছে পাইয়া এবং প্রফুল্ল জীবিত আছে জানিয়া সে আনন্দিত হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রফুল্ল ডাকাত এই কথা মনে হইতেই তাহার মন পরক্ষণেই অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও সঙ্কুচিত হইল। প্রফুল্লর দস্যুবৃত্তির জন্য তাহার পিতাই যে অনেকখানি দায়ী এবং একদিন তিনিই তাহাকে চুরি ডাকাতি করিয়া জীবন ধারণ করিতে বলিয়াছিলেন—এই কথা তখন ব্রজেশ্বরের মনে পড়িল না। প্রফুল্ল ডাকাত এই ভাবনায় তাহার মন বিষাদগ্রস্ত হইল—সেই সঙ্গে তাহার দেহও অবসন্ন হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর ও সাগরকে বিদায় দিবার পর যখন দেবীরাণীর বজরা পাল তুলিয়া ছুটিয়া চলিল—তখন দেবী মহামূল্য আবরণ আভরণ ত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র একখানি মোটা-শাড়ী এবং হাতে গালার বালা পরিল। পরদিন প্রভাতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া নদীর জলে স্নান করিয়া কপাল ও বুক যখন গঙ্গামৃত্তিকায় চর্চিত করিল—তখন দেবী-চৌধুরাণীকে যথার্থ দেবীর মতো দেখাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে দিবাকে সঙ্গে লইয়া গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া ভূগর্ভস্থ মন্দিরে শিবপূজারত ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেখা করিল। দেবী দস্যুবৃত্তিকে পাপ মনে করিয়া আর দস্যুদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেনা

বলায় ভবানী পাঠক তাহাকে এই বলিয়া বুঝাইলেন যে, অপরের ধন হরণ করা পাপ বটে, কিন্তু তাঁহাদের দল—একটি বিশেষ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দুর্বল ও দরিদ্রকে অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা করিয়া নিয়ত অনশন হইতে মুক্ত করাই তাঁহাদের দস্যুবৃত্তির প্রথম লক্ষ্য। কাজেই ইহার মধ্যে কোনো পাপ নাই। দেবীকে রাণী করিয়াই দস্যুদল দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করে। কিন্তু দেবীরাণীর এই বৃত্তি আর ভালো লাগিতেছে না। সে আপনার ঐশ্বর্য-সম্পদ ভবানী-পাঠককে দিয়া কাশীতে গিয়া বাস করিতে চায়। কথায় কথায় ব্রজেশ্বরের কথা উঠিল। ভবানী পাঠক জানিলেন যে, ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ বিপদে পড়ায় দেবী তাহাকে কিছু দিবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছিল। ভবানী পাঠক সব শুনিয়া বলিলেন যে হরবল্লভ অতি পাষণ্ড সে তাহার পুত্রবধূকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। বউটি দুঃখ পাইয়া মরিয়া গিয়াছে। কাজেই তাহার উপকার করা সঙ্গত কাজ নয় দেবী বলিল যে তাহারা যে পরহিত ব্রত গ্রহণ করিয়াছে তাহা অপরের দুঃখ দূর করিবার জন্য। তখন ভবানী পাঠক ইজারাদারের অত্যাচারে অনেক লোক দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়াছে বলায় দেবী বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবারের দিন স্থির করিয়া সেদিন সকলকে কিছু দান করিবার জন্য রঙ্গরাজকে দেবীগড়ের দিকে বজরা লইয়া যাইতে বলিল। বজরা যাত্রা করিতেই দেবী নিজে শাকান্ন পাক করিতে রন্ধনশালায় গেল।

টীকা ঃ গড়া—মোটা শাড়ী ; **কড়**—গালার বালা।

যে সুন্দর সে মাটি ছাড়িয়া হীরা পরে কেন ঃ—দেবীরাণী আগে রাজ রাজেশ্বরী বেশে সজ্জিত হইয়াছিল। তখন তাহার রূপে বাহিরের ঐশ্বর্য সম্পদের ঘটা বেশি ছিল। কিন্তু পরদিন প্রভাতে যখন সাধারণ মোটাশাড়ী ও গালার বালা পরিয়া নদীতে স্নানান্তে গঙ্গামৃত্তিকা নিজের ললাট ও বক্ষিত চর্চিত করিল তখন তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশ পাইল। সে সৌন্দর্য ঐশ্বর্যের নয়—সে সৌন্দর্যের মধ্যে দেব-মহিমা প্রকাশিত। যে যথার্থ সুন্দর, তাহার মহামূল্য আবরণ আভরণ নিষ্প্রয়োজন। বাহিরের ঐশ্বর্যাভরণ ক্ষণিকের—কিন্তু যেখানে রূপ স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত সেখানে বাহিরের সাজ সজ্জার কোনো প্রয়োজন নাই। বঙ্কিম প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই প্রফুল্লর স্বাভাবিক সৌন্দর্যে একটি ছোট ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইখানেও প্রফুল্লর মা বলিয়াছিলেন, 'আমার মেয়েকে সাজাতে হয় না।'

মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ ঃ—ইনি বিরাট সমরায়োজন করিয়া পিণ্ডারী নামক দস্যুদলকে দমন করেন। **পঞ্জাবের লড়াই**—এখানে সম্ভবত লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড ডালহৌসীর সময়ের প্রথম (১৮৪৫) ও দ্বিতীয় (১৮৪৯) শিখযুদ্ধের কথা বলা

হইয়াছে। এই দুইটি যুদ্ধের জন্য যে আয়োজন করিতে হইয়াছিল পিণ্ডারী নামক দস্যুদলকে দমন করিতে তাহা অপেক্ষা কম আয়োজন করিতে হয় নাই।

যাহারা দুর্বল……ভালো মানুষ হইত ঃ—সেকালে ডাকাতি লজ্জার বিষয় ছিলনা, অনেক ক্ষমতাশালী লোক ডাকাতিতে লিপ্ত ছিল। নিতান্ত বোকা ভালোমানুষ ছাড়া প্রায় সকলেই ডাকাতিকে অর্থ উপার্জনের অন্যতম ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল।

তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না—পরোপকার করিতে গেলে নিজের খ্যাতি-অখ্যাতি বিচার করা চলেনা। তাহা করিলে নিষ্কাম ধর্ম পালন করা হয় না। নিজের ভালো মন্দের কথা ভুলিয়া গিয়া পরের কল্যাণার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। **আমার এ আর ভালো লাগে না**—দেবী নিষ্কাম ধর্ম জীবনে গ্রহণ করিলেও দস্যুবৃত্তিকে সহজে মানিয়া লইতে পারিতেছে না।

এবার চলিলাম……সন্দেহ—দেবী দরিদ্রদের দুঃখ মোচনের জন্য বৈকুণ্ঠপুরে শেষবারের মতো যাইতেছে। হয়ত পরে আর এই কাজ করিবে না। দেবী-চৌধুরাণীর আড়ালে প্রফুল্ল নামক যে নারীসত্তা রহিয়াছে—এখানে তাহারই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৈকুণ্ঠপুরের নিবিড় জঙ্গলে এক সোমবারে দেবীর দরবার বসিল। একটি সামিয়ানার নীচে চন্দন কাঠের বেদীর উপর পুরু গালিচা পাতা—তাহার উপর দেবীর সিংহাসন, আজ দেবীর রাজরাণীর বেশ। হীরামুক্তামাণিক্যের আভরণ—মাথায় রত্নময় স্বর্ণমুকুট, দেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা—রাজদণ্ড হাতে রাজদণ্ডধারী পাশে দণ্ডায়মান। দুইপাশে দেবীর পাঁচশত বরকন্দাজ সৈন্য সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্মুখে প্রায় দশ হাজার লোক উপস্থিত। যথারীতি দেবীরাণীর জয়ধ্বনি করিয়া তাহার স্তুতিগান করা হইল। পরে রঙ্গরাজ দশ সহস্র দরিদ্রের প্রত্যেককে ডাকিয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। দেবী সুমধুর বচনে তাহাদের সম্ভাষণ করিয়া যথাযোগ্য দান করিতে লাগিল। এইভাবে এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত জলগ্রহণ না করিয়া সকলকে অর্থদান করিল। এদিকে রংপুরে গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেবের কাছে খবর গেল যে দেবী চৌধুরাণীর দল বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে জমায়েৎ হইয়াছে। ডাকাতরা রাশি রাশি টাকা লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কেহ টাকার কথা স্বীকার করে না। সকলে ভাবিল দেবীর দল ভারী রকমের ডাকাতি করিতেছে।

টীকা : রাজকার্যের মধ্যে........অকাতরে দান—দেবীরাণীর দরবারে কোনো বিচার হইত না—শুধু দরিদ্রের মধ্যে ধন বিতরণই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

দেবীর রাণীগিরি—জনসাধারণের বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দেবীকে বাহিরের জাঁকজমক করিতে হইত। মহামূল্য আবরণ-আভরণে তাহার কোনো আসক্তি ছিল না।

চোপদার—আসা সোটাবাহী (ফারসী শব্দ): আশাবরদার—রাজদণ্ডবাহী, **আশা**—রাজদণ্ড, **আঙরাখা**—জামা।

দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই—দেবীরাণী দস্যুদলের নেতৃত্ব করা কেবল দরিদ্রদের মধ্যে অকাতরে ধন বিতরণের জন্য। অন্যায়ভাবে অর্থ অপহরণ করিয়া নিজের স্বার্থে সে কখনও অপব্যয় করে না। পরোপকার করাকে যদি ডাকাতি বলা হয় তাহা হইলে ইহাকে ডাকাতি বলিতে হয়। উপন্যাসের মধ্যে ডাকাতের দলের কথা বলা হইলেও—ব্রজেশ্বরকে ধরিয়া আনা ছাড়া বঙ্কিম ডাকাতির চিত্র দেন নাই। দেবীরাণী নিজেই বলিয়াছে যে সে কখনও ডাকাতি করে নাই অথচ সকলে তাহাকে ডাকাত বলিয়া জানে। তাহাকে দলের রাণী করা হইয়াছে বটে—কিন্তু নিজে সে কখনও ডাকাতিতে যোগ দেয় নাই। বরং দরিদ্রকে ধনদানই করিয়াছে—নিজে কাহারও ধন হরণ করে নাই। ভবানী পাঠক—দরিদ্রের মঙ্গলার্থে হইলেও—অন্যের অর্থ জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়াছেন। তিনি প্রফুল্লকে যে নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষা দিয়াছেন—তাহা তিনি নিজেও পালন করেন, প্রফুল্লও দেবী চৌধুরাণী হিসাবে তাহা পালন করে। ইহার জন্য যে সর্ব কামনা বাসনা ত্যাগ করিতে হয়—সে তাহা প্রথম হইতেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নাই। প্রফুল্ল সবকিছু মানিয়া লইয়াও একাদশীতে মাছ খাওয়া ছাড়ে নাই। তাই সে সর্বত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করিলেও স্বামীর অনুধ্যান ত্যাগ করে নাই। ইতিহাসের দেবীচৌধুরাণী কি করিত বা ভবানী পাঠক কি করিতেন—তাহা বঙ্কিমের মুখ্য বক্তব্য নহে। নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিত দেবীচৌধুরাণী ও ভবানী পাঠক তাঁহার বক্তব্যের মনুষ্যরূপ। দেবীরাণী নিষ্কাম ধর্মকে জীবন দিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং এই ধর্মবোধ তাহাকে যেমন সংসার সীমায় আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—তেমনই সমগ্র পারিবারিক জীবনেও আনন্দময় প্রশান্তির ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে।

মুনকির—যে সব অস্বীকার করে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর গৃহে ফিরিয়া পিতার হস্তে প্রয়োজনীয় অর্থ তুলিয়া দিল। দেবী চৌধুরাণী

এই অর্থ ঋণ হিসাবে দিয়াছে শুনিয়া হরবল্লভ প্রথম একটু চিন্তিত হইলেও—পরে যখন শুনিলেন যে, বৈশাখ মাসের শুক্লাসপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত সে সন্ধানপুরের কালসাজির ঘাটে টাকার জন্য অপেক্ষা করিবে—তখন হরবল্লভ মুখে স্বীকার করিলেও মনে মনে ঠিক করিলেন ঐদিন কাপ্তেন সাহেবের পল্টন দিয়া দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিলে আর টাকা ফেরত দিতে হইবে না। এই অভিসন্ধি ব্রজেশ্বরকেও বিশ্বাস করিয়া বলিলেন না।

এদিকে সাগর রটাইয়া দিল যে ব্রজেশ্বর এক কৈবর্ত রাজরাণীর বজরায় গিয়া—তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। সকলেই এবিষয়ে জল্পনাকল্পনা করিতে লাগিল। নয়নতারা ত শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিল। ব্রজেশ্বরের মাতা পুত্র আবার সংসার করিলে যে সুখী হন তাহা পুত্র ও স্বামীকে জানাইয়া দিলেন। ব্রজেশ্বরের মতের কথা উঠিলে সে জানাইয়া দিল যে, পিতা যাহা বলিবেন সে তাই করিবে।

টীকা ঃ আসল সংবাদ কি ?—হরবল্লভ কাজের মানুষ কাজেই বাজে কথায় না গিয়া সোজা টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রজেশ্বরের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে……দোষ নাই।—এখানে বঙ্কিম যেন একটু শ্লেষ করিয়া বলিতেছেন ব্রজেশ্বরের নিজস্ব প্রাচীন নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ ব্রজেশ্বরের নিজের অভিমত—পিতার নিকট সত্য কথা বলা কর্তব্য—কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলার চেয়ে —কিছু গোপন রাখা তেমন দোষের হইবে না। দেবীরাণীই যে প্রফুল্ল একথা সে প্রকাশ করিল না। ব্রজেশ্বর অসত্য না বলিয়া অপ্রিয় সত্যকে গোপন রাখিয়াছে।

পুণ্যময় অভিসন্ধি—হরবল্লভ দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিবার যে মতলব আঁটিয়াছেন তাহা মোটেই পুণ্যময় নয়। বঙ্কিম হরবল্লভের অকৃতজ্ঞতাকে ব্যঙ্গ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন। এই অভিসন্ধি ধূর্ত হরবল্লভ পুত্রকেও বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারিলেন না।

সাগর আসিয়া……বিবাহ করিয়া আসিয়াছে—সাগর যেমন বুদ্ধিমতী—তেমনই উদারও বটে। ব্রজেশ্বরের বিবাহের রটনার দ্বারা ভবিষ্যতে প্রফুল্লর শ্বশুরের গৃহে ফিরিবার পথ অনেক সুগম হইয়াছে। নয়নতারাকে খেপাইবার জন্য কথাটি বলিলেও ইহার মধ্যে প্রফুল্লর ইঙ্গিত রহিয়াছে।

সাগরের ইজারা মহল হইয়া রহিলেন—আবার বিবাহ করার খবরে নয়নতারা ক্রুদ্ধা হওয়াতে ব্রজেশ্বর সাগরের কাছেই রহিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ডে দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল-জীবন যাপনের বাসনা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তৃতীয় খণ্ডে দেবী চৌধুরাণী নিষ্কামব্রত গ্রহণ করিয়াও আবার তাহার সংসার পরিবেশে ফিরিয়া যাওয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই খণ্ডে ঐতিহাসিকতার সঙ্গে রোমান্স ও সামাজিক পরিবেশের অদ্ভূত মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই মিশ্রণ যে একেবারে নিখুঁত তাহা বলা যায় না। হয়ত অনেকে ইহাতে রোমান্স-কল্পনার আতিশয্য, অবান্তর বিষয় বা কথার অবতারণা, লেখকের 'খেয়ালী কল্পনার ম্যাজিকের খেলা' লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে রোমান্সের যে পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় তাহা যে অনেক সময় কাহিনীর প্রয়োজনেও আসিয়া পড়ে—তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিবেন। বাংলা উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে রোমান্সের অবতারণা এবং তাহার আতিশয্য অস্বাভাবিক নয়। বর্তমান যুগে বসিয়া আমরা হয়ত তাহার রস সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সর্বকালের মানুষের জীবনে রোমান্সের চমকপ্রদ রূপের একটি আবেদন রহিয়াছে। আকাশের কোণে মেঘ দেখিয়া ঝড়ের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া দেবী চৌধুরাণী যদি সকলের প্রাণরক্ষার সম্ভাব্য উপায় অনুভব করে—তাহাকে একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবার মতো কারণ দেখানো যায় না। জীবনে এমন অনেক আকস্মিক ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয় যাহা আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব বলিয়া মনে না হইলেও তাহাকে অসম্ভব বলিয়াও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দেবীরাণীর সংসার পরিবেশে ফিরিয়া আসাও অসম্ভব নয়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বঙ্কিম 'দেবী চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষপ্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।' তিনি অনুশীলন তত্ত্বের সাহায্যে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন, বঙ্কিম কি এই মানুষ গড়ায় ব্যর্থ হইয়াছেন? মনে হয়, তিনি প্রফুল্ল ও প্রফুল্লর দেবীচৌধুরাণী রূপকে যথাসম্ভব সার্থক করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। বলা যাইতে পারে যে, আরও ভালো হইতে পারিত। পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্যশিল্প সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায়। প্রফুল্লর জীবনে যে নিষ্কাম ধর্ম ও কর্মের অনুশীলন ঘটে—তাহাকে সে পারিবারিক জীবনেও সহজে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে। দস্যুদল নেত্রী হইতে হরবল্লভের পুত্রবধূরূপে বাসনমাজা পর্যন্ত কোনোটিতেই সে অকৃতকার্য হয় নাই। দস্যুদল নেত্রী হিসাবে অনুশীলিত ধর্মকে যে প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিয়াছে—তাহার প্রধান

কারণ নারীজীবনের প্রশান্ত স্বর্গ স্বামীগৃহকে সে উপেক্ষা করিতে চাহে নাই। তবে কামনায় বশীভূত হইয়া সে স্বামীগৃহে ফিরিয়া আসে নাই। সংসার ধর্মপালন করিতে গিয়াও তাহার নিষ্কাম ধর্ম ম্লান হয় না। ব্রজেশ্বরের সংসারে সে গৃহিণীও বটে—আবার সন্ন্যাসিনীও বটে।

তৃতীয়খণ্ডের ঘটনাবস্তু সংক্ষেপে এই—

দেবী চৌধুরাণীর ঋণ পরিশোধ করার দিন আগাইয়া আসিলেও হরবল্লভ টাকা সংগ্রহের কোন চেষ্টা করিতেছেন না দেখিয়া, ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার ব্যবস্থা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। হরবল্লভ টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইবার কথা বলিয়া রঙ্পুরের কালেক্টরের কাছে দেবী চৌধুরাণীর সংবাদ দিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দানপূর্বক পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন। কালেক্টর সাহেব এই সংবাদে খুশী হইয়া—দেবীকে ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। হরবল্লভের কথা মতো লেফ্‌ট্যাণ্ট ব্রেনানের সঙ্গে পাঁচশত সিপাহী দেবীকে ধরিবার জন্য পাঠাইলেন। দেবী চৌধুরাণী কোনদিকে যাহাতে পলাইতে না পারে সেইজন্য জলপথে ও স্থলপথে কালসাজির ঘাটের দিকে ফৌজ পাঠানো হইল। দেবীকে ধরিবার জন্য যে এত বিপুল আয়োজন তাহার প্রধান কারণ দেবীর দলের লাঠিয়াল সৈন্যের সংখ্যা কম নয়।

কিন্তু সেদিন দেবীরাণীর কোনো বরকন্দাজই সঙ্গে ছিল না। বজরায় দেবী, নিশি ও দিবা ছাড়া আর কেহ ছিল না। দেবী চন্দনে চর্চিত হইয়া সাধারণবেশে বসিয়া আছে। সে নিশি ও দিবার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনায় ব্যাপৃত। দিবা মাঝে মাঝে সেই গুরু আলোচনায় লঘু রসের যোগান দিতেছে। দেবীর মনে কোনো ভয় নাই। আধ্যাত্মিক আলোচনার ফাঁকে সে নিশি ও দিবাকে ইংরাজের সিপাহী আসার খবর দিল। তাহারা যে তাহাকে ধরিবার জন্য জলে স্থলে ফাঁদ পাতিয়াছে তাহাও সে বুঝিতে পারিয়াছে। তবুও যে নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে নাই। সে জানে আজ তাহার স্বামী আসিবে। তাহার সঙ্গে শেষ দেখা করিয়া, জন্মান্তরে তাহাকে কামনা করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রজেশ্বর একটি পান্‌সীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল টাকা এখনও যোগাড় হয় নাই বটে—তবে দুই চারিদিনের মধ্যেই যোগাড় হইবে। তখন কোন স্থানে দেখা করিয়া টাকা দিবে জিজ্ঞাসা করায় দেবী বলিল যে, তাহার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। ব্রজেশ্বর যেন দরিদ্রের মধ্যে টাকা বিলাইয়া দেন। তাহা হইলেই দেবী পাইবে। ব্রজেশ্বর অনেকদিন পর 'প্রফুল্ল' বলিয়া সম্বোধন করিতেই প্রফুল্লর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিল। সে নিজেকে আর সামলাইতে

পারিল না। তাহার চোখের আর বাধা মানিল না। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ডাকাতের বৃত্তি অবলম্বন করার জন্য তিরস্কার করিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু প্রফুল্লর চোখের জলে তাহার চোখেও জল আসিল। ব্রজেশ্বর মৃদু কণ্ঠে প্রফুল্লর দস্যুবৃত্তির কথা তুলিতেই প্রফুল্ল বলিল যে সে একদিনও ডাকাতি করে নাই। জীবনে অন্য দেবতার পূজা করিতে গিয়াও সে পারে নাই—ব্রজেশ্বরই তাহার সকল দেবতার স্থান অধিকার করিয়া আছে। তখন প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে একে একে দশ বৎসরের সকল কাহিনী বলিয়া নিশি ও দিবাকে তাহার সঙ্গে নিতে অনুরোধ করিল। তাহার আর দুইটি অনুরোধ—ব্রজেশ্বর যেন তাহাকে মনে রাখে এবং সাগর যেন তাহাকে না ভুলে।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লর নিকট যখন জানিতে পারিল যে ইংরাজের সিপাহীরা তাহাকে ধরিতে আসিতেছে—তখন সে প্রফুল্লকে ত্যাগ করিয়া যাইবে না বলিয়া পান্‌সীখানিকে বিদায় দিল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে কিছুতেই মরিতে দিবে না। পিতার সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাইবার কথা বলিতেই প্রফুল্ল বলিল যে একদিন আগে এ কথা শুনিলে আজ তাহাকে ইংরাজ ধরিতে পারিত না। ব্রজেশ্বরের কথায় প্রফুল্ল নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া কি যেন ভরসা পাইল। কথা প্রসঙ্গে ব্রজেশ্বর জানিল যে, ইংরাজদের সঙ্গে তাহার পিতাই গোয়েন্দারূপে আসিতেছেন। প্রফুল্ল শ্বশুরের প্রাণ রক্ষাই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া ব্রজেশ্বরকে আশ্বাস দিল।

অন্যদিকে দেবীকে রক্ষা করার জন্য ভবানী পাঠক রঙ্গরাজকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। বনে ভেরী বাজিতেই দেবী বুঝিতে পারিয়া রঙ্গরাজকে ডাকিয়া পাঠাইল। নিশির বাঁশীর ইঙ্গিত শুনিয়া রঙ্গরাজ আসিতেই দেবী লোকক্ষয়কর যুদ্ধ প্রচেষ্টা হইতে তাহাদের নিবৃত্ত হইতে বলিল। দেবীর নির্দেশ জানিয়াও ভবানী পাঠক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন নাই। ইংরাজের সিপাহীরা বরকন্দাজদের হাতে নিগৃহীত হইতে লাগিল। তখন দেবী নিজেই একখানি সাদা নিশান তুলিয়া ধরিতেই যুদ্ধ থামিয়া গেল। দেবী ব্রজেশ্বরের হাতে সাদা নিশানটি দিয়া নিশি ও দিবার সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেল, রঙ্গরাজ সাদা নিশান দেখাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দেবী বলিল যে, সে ধরা দিবে। রঙ্গরাজ আপত্তি জানাইতে দেবী তাহার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করিল। রঙ্গরাজকেই ইংরাজের বজরায় দূতরূপে পাঠাইয়া বলিয়া দিল যে, তাহারা শুধুমাত্র দেবীকে ধরিতে পারে কিন্তু তাহার বজরা স্পর্শ করিতে পারিবে না। ব্রেনান সাহেব সে কথা না শুনিয়া জোর করিয়া বজরায় উঠিল।

এদিকে নিশি ও দিবা দুইজন মহামূল্য আভরণে সজ্জিতা হইয়া রাণীর মত

বসিয়াছে পাশে সাধারণ সজ্জায় ঘরের এক পাশে দাড়াইয়া আছে। সাহেব রঙ্গরাজের সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইল। রঙ্গরাজ সবই বুঝিতে পারিল। সাহেব দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে কথা বলিতে চায় জানিয়া—নিশি বলে, আমি দেবী, দিবা বলে, আমি দেবী। সাহেব রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিতে সে নিশিকে দেখাইয়া দিল। যখন দেবী, নিশি, দিবা সকলেই নিজেদের দেবী বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল—তখন সংশয় ঘুচাইবার জন্য সাহেব হরবল্লভকে ডাকিতে বলিল। হরবল্লভ দেবীকে চিনে না—সেও বিপদে পড়িল। সাহেব হরবল্লভকে গালাগালি করিতে দিবা জানাইল যে, হরবল্লভের পুত্র বজরার ছাদে, সে দেবীকে চিনিতে পারে। ব্রজেশ্বরকে আনাইয়া সাহেব দেবীকে দেখাইয়া দিতে বলিলে—ব্রজেশ্বর চিনিলেও চিনাইয়া দিবে না বলায় সাহেব গালাগালি করিতেই ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেবকে চপেটাঘাত করিল। হরবল্লভ ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ঝড় উঠিতেই পালতোলা বজরা কাত্ হইয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। ব্রেনান ও হরবল্লভ বন্দী হইলেন।

ব্রজেশ্বরের চপেটাঘাত খাইয়া সাহেব ব্রজেশ্বরকে ঘুষি মারিতে উদ্যত হইলে বজরা হঠাৎ কাত্ হওয়ায় সে টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। দ্বিতীয়বার ঘুষি বাগাইলে ব্রজেশ্বর ধরিয়া ফেলিল। হরবল্লভ পুত্রকে সাহেবের কাছে ক্ষমা চাহিতে বলায় ব্রজেশ্বর পিতৃআজ্ঞা পালনার্থে ক্ষমা চাহিল। এদিকে হরবল্লভ ধরা পড়িয়া মৃত্যু-ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিশি তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিল যে যদি সে একটি কুলীনের মেয়েকে বিবাহ করে—তবে হয় ত তার মৃত্যুদণ্ড নাও হইতে পারে। হরবল্লভ নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু নিজের পরিবর্তে পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন।

দেবীরাণীর রাণীগিরির অবসান ঘটিল এখন—দেবী প্রফুল্লরূপে শ্বশুরবাড়ী যাইবে। সাহেবকে ফাঁসী দিবার জন্য জঙ্গলে লইয়া গিয়া রঙ্গরাজ তাহাকে মুক্তি দিয়া দেবীর নির্দেশ মতো একশত মোহর দিতে—সাহেব তাহা হইতে শুধু পাঁচটি মোহর লইয়া চলিয়া গেল। হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের সঙ্গে নিশি-প্রস্তাবিত কুলীন মেয়ের বিবাহের অনুমতি দিয়া বৌভাতের আয়োজন করিতে দেশে ফিরিলেন। ব্রজেশ্বর জানিল যে প্রফুল্লর জন্যই নিশি এই বিবাহের ছলনা করিয়াছে। ব্রজেশ্বর পিতার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিবে ঠিক করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিল।

স্বামীগৃহে যাইবার সময় শোকার্ত রঙ্গরাজকে সান্ত্বনা দিয়া দেবী নিজের ঘরবাড়ি, সম্পত্তি তাহাকে দিয়া দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া শান্ত জীবন যাপন করিতে বলিল। নিশি ও দিবাকে নিজের বাকি সম্পদ দিল। নিশি প্রফুল্লকে নিরাভরণা হইয়া শ্বশুর বাড়ি যাইতে দিলনা। সে নিজের অলঙ্কারে তাহাকে সাজাইয়া দিল। তাহারা প্রফুল্লকে

ভূতনাথ গ্রামের ঘাট পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া রঙ্গরাজের সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল। রঙ্গরাজ, নিশি দিবা প্রফুল্লর কথামতো জীবন যাপন করিতে লাগিল। বজরা খানিকে চেলা-কাঠ করিয়া তুইবৎসর ধরিয়া পোড়াইল।

প্রফুল্ল ভূতনাথে আসিতেই সকলে ব্রজেশ্বরের নূতন বৌ দেখিতে আসিল। ব্রজেশ্বরের মাতা নূতন বৌ-এর মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। গ্রামের লোকে নিন্দা করিয়া বলিল—ধেড়ে বৌ। ব্রজেশ্বরের মাতা ছেলেকে নিভৃতে ডাকিয়া প্রফুল্লর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৌভাত নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার পর গিন্নী হরবল্লভকে বলিলেন—এ নূতন বৌ নয়—পুরাতন বড় বৌ প্রফুল্ল। হরবল্লভ শুনিয়া আঘাত পাইলেন; গিন্নী এইবার শক্ত হইয়া বলিলেন যে হরবল্লভ যদি এই ব্যাপারে কিছু বলিতে যান তাহা হইলে তিনি গলায় দড়ি দিবেন। তখন ঠিক হইল—প্রফুল্লর 'নূতন বৌ' পরিচয় প্রচলিত থাকিবে।

প্রফুল্ল সাগরকে আনাইল। সাগর প্রথমে নয়নতারার সঙ্গে স্বামীর নূতন বিবাহের ব্যাপারে আলোচনা করিল। কিন্তু পুকুর ঘাটে প্রফুল্লকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। অগাধ ঐশ্বর্য সম্পদ ছাড়িয়া এই পরিবেশ প্রফুল্লর ভালো লাগিবে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে প্রফুল্ল বলিল—কঠিন সংসার ধর্ম পালনের জন্যই সে ইচ্ছা করিয়াই এইখানে আসিয়াছে। নিঃস্বার্থপরতার গুণে প্রফুল্ল ধীরে ধীরে সকলের প্রিয় হইল। ব্রজেশ্বরের জীবন আনন্দময় হইল। শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রফুল্লর পরামর্শ লইয়া কাজ করেন। সতীনরা তাহার বশীভূত। প্রফুল্ল সংসারকে সুখের আগার করিয়া তুলিল। প্রফুল্ল পরের জন্য কাজ করিতে ভালোবাসিত। সংসারে প্রবেশ করিয়া নিজের সুখ কখনও সে চাহে নাই। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্মপরায়ণা। ব্রজেশ্বর যাহাতে নয়নতারা, সাগরকে সমভাবে ভালোবাসে প্রফুল্ল তাহাই চাহিত। প্রফুল্লর বুদ্ধি বিবেচনায়-হরবল্লভের লক্ষ্মী-শ্রী বাড়িতে লাগিল। হরবল্লভের স্বর্গারোহণের পর ব্রজেশ্বর বিষয় সম্পত্তির মালিক হইলে প্রফুল্ল পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সেই অর্থে 'দেবীনিবাস' নামে একটি অতিথি শালা নির্মাণ করাইল। যথাকালে প্রফুল্লও স্বর্গারোহণ করিলে দেশের লোক বলিল, আমরা মাতৃহীন হইলাম। রঙ্গরাজ, নিশি, দিবাও দেব-সেবায় জীবন নির্বাহ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। কেবল ভবানীঠাকুর স্বেচ্ছায় ইংরাজের হাতে ধরা দিয়া দ্বীপান্তরে চলিয়া গেলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবীচৌধুরাণীর টাকা ফেরত দিবার দিন আসিয়া পড়িল—অথচ হরবল্লভ তাহার কোনো চেষ্টা করিতেছেন না দেখিয়া ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে

লাগিলেন। হরবল্লভ টাকা সংগ্রহের অছিলায় রংপুরের কালেক্টরের কাছে দেবী-চৌধুরাণীর সংবাদ দিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, কালেক্টর তাঁহার কথায় খুসী হইয়া, তাঁহার কথামত লিফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনানেল অধীনে পাঁচশত সিপাহী সঙ্গে দিলেন। দেবীচৌধুরাণীকে ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কৃত করিবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। তাহাকে ধরিবার জন্য জলপথে ও স্থলে সিপাহীরা চলিল। দেবী যেন কোনো দিকে পলাইতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিয়া হরবল্লভ কালসাজির ঘাটের দিকে যাত্রা করিলেন। দেবীকে ধরিবার জন্য বিপুল আয়োজনের কারণ ছিল। দেবীর অধীনে হাজার লাঠিয়াল ছিল। তাহাদের সঙ্গে অল্পসংখ্যক সিপাহীর লড়াই করা সম্ভব নয়।

টীকা ঃ ভাঁটি দিয়া—নদীর স্রোতের দিকে।

হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! বঙ্কিমের এই লাঠির মাহাত্ম্য এককালে বাংলার তরুণ সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। লেখক লাঠির অতীত গৌরব ও বর্তমান হীন অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—একদিন বাঙ্গালী এই লাঠির দ্বারা শত্রুকে তাড়াইয়া দিয়াছে। এই লাঠির দ্বারাই সে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছে। উপযুক্ত হস্তে পড়িলে লাঠি বন্দুক তরবারিকেও স্তব্ধ করিতে পারিত। স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা, ডাকাত বা অত্যাচারী নীলকরদের শাসনে—লাঠিই বাঙালীর একমাত্র হাতিয়ার ছিল। এখন লাঠির আর সেই গুণ নাই। বর্তমানে খুঁটি, খোঁটা, বাবুদের হাতে ছড়ি রূপে সে শোভা পায়। এখন যাহা সামান্য বংশখণ্ড মাত্র এককালে তাহার দ্বারাই দেশের শান্তি রক্ষা হইত। বঙ্কিম একদিকে লাঠির মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—তেমনই তাহার গৌরবময় ঐতিহ্যের বিলুপ্তির জন্য আক্ষেপও করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে দেবীচৌধুরাণীকে ধরিবার জন্য এত সিপাহীর সমাগম—তার কাছে কোনো লাঠি বা লাঠিয়াল ছিল না। দেবী কালসাজির ঘাটে বজরা বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছে। দেবী, নিশি ও দিবা বজরার ছাদের উপর বসিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেছিল। কথা উঠিয়াছিল, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় কিনা। প্রত্যক্ষ কয় প্রকার—আলোচনার সময় দেবী ইংরাজ সিপাহীদের আগমনের কথা জানাইল। দিবার হাতে দূরবীন দিতে সেও দেখিল—পাঁচখানা ছিপ ভর্তি সিপাহী তাহাদের দিকে আসিতেছে। নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নিশি ও দিবা দেবীকে অনুরোধ করিল। কিন্তু দেবী নির্বিকার—কোনো উদ্বেগই তাহার নাই। সে ধরা দিবে বলিয়া মনস্থির করিয়াছে। মরিতে হয় সে একাই মারিবে। দেবী নিশি ও দিবাকে ব্রজেশ্বর আসিলে তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। আবার 'প্রত্যক্ষ' সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করিতেই

ব্রজেশ্বর একখানা পানসীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া জানাইল যে টাকা এখনও যোগাড় হয় নাই। দুইচারিদিনের মধ্যে যোগাড় হইবে তখন কোথায় ফেরত দেওয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করাতে দেবী বলিলে যে, আর তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না। ব্রজেশ্বর যদি সেই টাকা দরিদ্রদের মধ্যে বিলাইয়া দেয়—তবেই তাহাকে দেওয়া হইবে। ব্রজেশ্বর দেবীকে প্রফুল্ল বলিয়া সম্বোধন করিতে তাহার কান্না আর বাধা মানিল না। ব্রজেশ্বরও সেই সঙ্গে চোখের জল ফেলিল। সে ভাবিয়াছিল প্রফুল্লকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করার জন্য তিরস্কার করিবে—কিন্তু তাহা আর হইলনা। শুধু তার উল্লেখ মাত্র করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। প্রফুল্ল শপথ করিয়া বলিল যে, সে নিজে কখনও ডাকাতি করে নাই। তারপর সে হরবল্লভ কর্তৃক বিতাড়িত হইবার পর হইতে দীর্ঘ দশবৎসরের কাহিনী বিবৃত করিল। সব শুনিয়া ব্রজেশ্বর বিস্মিত, লজ্জিত, আনন্দিত এবং কিছুটা ভীতও হইল। প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে যাইতে বলিলে—ব্রজেশ্বর যখন যাইবে কি যাইবে না ভাবিতেছিল, তখন হঠাৎ বন্দুকের শব্দ হইল।

বন্দুকের শব্দে চমকিয়া দুইজনে দেখিল যে দূরে পাঁচখানা ছিপ আসিতেছে। প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে যাইতে অনুরোধ করিল। সিপাহীরা যে তাহাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে তাহা পূর্ব হইতে জানিয়াও কেন সে আসিয়াছে ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করায়—প্রফুল্ল বলিল, ব্রজেশ্বরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্যই সে আসিয়াছে। ব্রজেশ্বর বলিল যে, আজ যদি প্রফুল্ল নিজের প্রাণ রক্ষা করে তাহা হইলে সে তাহাকে গৃহিনীরূপে ঘরে লইয়া যাইবে। প্রফুল্ল দুঃখ কারিয়া বলিল যে একদিন আগেও এইকথা শুনিলে তাহাকে কেহ ধরিতে পারিতনা। প্রসঙ্গত ব্রজেশ্বর ইহাও জানিতে পারিল যে, ইংরাজের নৌকায় তাহার পিতা গোয়েন্দা রূপে আছেন। ব্রজেশ্বর পিতাকে রক্ষা করার কথা বলায় প্রফুল্ল তাঁহাকে রক্ষা করার আশ্বাস দিল এবং ইহাও বলিল যে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজে মরিতে হয় মরিবে। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ফেলিয়া যাইবেনা স্থির করিয়া পান্‌সীওয়ালাকে পানসী লইয়া চলিয়া যাইতে বলিল।

টীকা ঃ প্রত্যক্ষ ছয় রকম—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্‌ ও মন—এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ। ইহাদের দ্বারা দেখা বা অনুভব করা যায়।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—প্রমাণাভাবাৎ—সাংখ্য দর্শন বলে, প্রমাণ নাই বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। নিশির এই কথার উত্তরে প্রফুল্ল বলিল, "সূত্রকার-স্যোভয়েন্দ্রিয় শূন্যত্বাৎ—ন তু প্রমাণাভাবাৎ"—অর্থাৎ প্রমাণের অভাবের জন্য যে ঈশ্বর নাই তাহা নহে; যিনি সূত্র রচয়িতা—তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং উভয়ের কর্তা 'মন' নাই—তাই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন না।

যোগ অভ্যাস মাত্র—কিন্তু অভ্যাস মাত্রই যোগ নয়। যোগ বলিতে জ্ঞান যোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ—প্রধাণত এই তিনটিকেই বুঝায়।

প্রফুল্ল নিশি ও দিবার সঙ্গে নির্বিকার চিত্তে তত্ত্ব আলোচনা করিতেছে। অনেকের মনে হইতে পারে যে আসন্ন বিপদের কথা জানিয়াও সে কি করিয়া নিরুদ্বেগে তত্ত্ব আলোচনা করিতে পারে। প্রফুল্ল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার ভয় নাই—সেই দিক হইতে প্রফুল্ল নিরুদ্বেগ। এখন শুধু স্বামীর জন্য তাহার প্রতীক্ষা। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ব্রজেশ্বর আসিবে। তাহার সহিত দেখা করার জন্য তাহার একটা উৎকণ্ঠা আছে। স্বামীকে সব কথা বলিয়া তবে সে বিদায় লইবে। মনের ও বাইরের প্রতিকূল অবস্থায় আধ্যাত্মিক আলোচনা সম্ভব না হইলেও—মনের উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যও প্রসঙ্গান্তরের আলোচনা অস্বাভাবিক নয়। আলোচ্য বিষয়টির মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব থাকিলেও—প্রফুল্ল, নিশি, দিবা প্রভৃতি তাহার বিশ্লেষণ ও উদাহরণ প্রয়োগে কিঞ্চিৎ লঘুতাও প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এই লঘুতার জন্য উল্লিখিত তিনজনকে দায়ী করার চেয়ে—প্রফুল্লর নিরুত্তাপ মনোভাব এবং উদ্বেগহীনতা অর্থাৎ আসন্ন দুর্যোগের ভয়াবহতাকে বড়ো করিয়া না দেখার মনোভাব—এই ধরনের আলোচনার জন্য কিছুটা দায়ী করা যায়। আর কাহারও পক্ষে সম্ভব না হইলেও প্রফুল্লর পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছে।

যেমন ব্রজেশ্বর প্রফুল্ল……জলের স্রোত ছুটিল—ব্রজেশ্বর দশ বৎসর পরে প্রথমবার প্রফুল্লকে নাম ধরিয়া ডাকিল। 'প্রফুল্ল' বলিয়া সম্বোধনে—প্রফুল্লর মন আর কোনো বাধা মানিল না। তুচ্ছ টাকার কথা প্রফুল্লর চোখের জলের ধারায় ভাসিয়া গেল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লর হাত ধরিয়া 'প্রফুল্ল' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। এইটুকুই প্রফুল্লর একান্ত কামনার ধন।

এ উত্তর সংবরণ করাই যথার্থ পুণ্য—ব্রজেশ্বরের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ প্রফুল্ল দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। প্রফুল্ল ইহার উত্তরে বলিতে পারিত যে, ব্রজেশ্বরের পিতাই তাহাকে চুরি ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিয়াছিল। সে তাঁহার আদেশই পালন করিতেছে। কিন্তু প্রফুল্ল তাহা বলিল না। সে জানে, ইহা বলিলে তাহার শ্বশুরের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো হইবে এবং তাহার স্বামীও ব্যথা পাইবে। সে নিজের দুঃখ নিজের মনে চাপা রাখিল। ব্রজেশ্বরের প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর দেওয়া স্থিরবুদ্ধি প্রফুল্ল অনুচিত মনে করিল। রূঢ় প্রত্যুত্তর দিবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া যথার্থ পুণ্য অর্জন করিল।

শুনিয়া ব্রজেশ্বর……কিছু ভীত হইলেন—প্রফুল্লর কাছে তাহার দীর্ঘ

দশ বৎসরের জীবন কাহিনী শুনিয়া—বিচিত্র ঘটনা সংঘটনের জন্য বিস্মিত। তাহার দুঃখদুর্গতির জন্য লজ্জিত, তাহার প্রতি অটুট প্রেমের জন্য আহ্লাদিত, সর্বগুণান্বিতা স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের কাছে কিছুটা সঙ্কুচিত বোধ করিল। নিজের অযোগ্যতা প্রমাণিত হইবার ভয়ে ব্রজেশ্বর কিছুটা ভীতও হইল।

তোমায় আর একবার দেখিব বলিয়া—বিপদ আছে জানিয়াও নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ব্রজেশ্বরকে দেখিবার জন্য প্রফুল্ল আসিয়াছে। ভালোবাসার কাছে জীবন, ঐশ্বর্য সম্পদ সবই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

তুমি আমার স্ত্রী—ব্রজেশ্বর কোনো বাধানিষেধের কথা না ভাবিয়াই প্রফুল্লকে স্ত্রী বলিয়া সগৌরবে গ্রহণ করিয়াছে।

প্রফুল্ল আকাশপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিল—আকাশের কোণে বৈশাখী ঝড়ের আভাস দেখিতে পাইল। নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া প্রফুল্লকেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতির সঙ্কেত ভালোভাবেই জানিতে হইয়াছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে ঝড় আসার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আধিদৈবিক বা অধিভৌতিক কোনো সম্পর্ক নহে। ইহা তাহার অভিজ্ঞতা প্রসূত। এই ঝড় হয়ত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

প্রফুল্ল নিষ্কাম—যে হরবল্লভ প্রফুল্লকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল পরে আবার তাহাকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছিল—তাহার প্রতি প্রফুল্লর কোনো বিদ্বেষ নাই। সে হরবল্লভের অনিষ্ট হয় এমন কিছু করিতে চাহে না। পিতার সম্বন্ধে ব্রজেশ্বরের আকুলতা দেখিয়া প্রফুল্ল তাই বলিয়াছে—হরবল্লভকে রক্ষার প্রয়োজনে—সে নিজে জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। এই মনোভাব নিষ্কাম ধর্মেরই শুভফল। এই ধর্মজ্ঞান শত্রু-মিত্র ভেদ রাখে না।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বনে ভেরী বাজিতেই দেবী নিশিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, রঙ্গরাজই এই ভেরী বাজাইয়াছে। দেবী রঙ্গরাজকে ডাকিয়া পাঠাইতে বলিল। নিশি বাঁশীর সঙ্কেতে রঙ্গরাজকে বজরায় আনিল। অন্যদিকে বনপ্রান্তে অসংখ্য বরকন্দাজ জমায়েৎ হইতেছে। রঙ্গরাজ দেবীকে জানাইল যে, সে দেবীর আদেশ অনুসারে দেবীগড়ে যায় নাই—ভবানী ঠাকুরের নির্দেশে পথ হইতে ফিরিয়া বরকন্দাজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জঙ্গলের সিপাহীদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। দেবী দুঃখিত হইয়া বলিল যে, শুধুমাত্র তাহার জন্য এত লোকক্ষয় করিয়া লাভ নাই। ভবানী ঠাকুর যদি বরকন্দাজদের ফিরাইয়া লইয়া না যান, তাহা হইলে সে জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দিবে। রঙ্গরাজ

ভবানী ঠাকুরকে সংবাদ দিতে গেল। নিশি ব্রজেশ্বরকে বাঁচাইবার কথা বলাতে দেবী বলিল, স্বামী তাহার আদরের বটে কিন্তু তার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট হইতে দিবে না। অন্যদিকে পাঁচখানা ইংরাজের ছিপ বজরার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। দেবী তখন ছিপের দিকে দৃষ্টি না দিয়া আকাশ প্রান্তে একখানি কালো মেঘ দেখিতেছিল। এই মেঘ দেখিয়া স্বামী ও শ্বশুরকে রক্ষা করিবার উপায় যেন খুঁজিয়া পাইল। সে তখন শাঁখে ফুঁ দিয়া সংকেত করিল।

বন্দুক, ঢাল সড়কি, লাঠি হাতে বরকন্দাজগণ ইংরাজের সিপাইদের আগে আসিয়া দেবীর বজরা ঘিরিল। অন্যদিকে ছিপগুলি আসিয়া তাহাদের ঘিরিল। বরকন্দাজদের মধ্যে যারা মাঝিমাল্লা ছিল—তাহারা বজরায় যার যার জায়গায় বসিল। সিপাহীদের সঙ্গে বরকন্দাজদের যুদ্ধ বাধিতেই দেবী বুঝিল যে, হয় তাহার নির্দেশ ভবানী ঠাকুরের কাছে পৌঁছে নাই, নয়ত তিনি নিজেই যুদ্ধ করিতেছেন। দেবী তখন বজরা হইতে সাদা নিশান দেখাইতে যুদ্ধ থামিয়া গেল। দেবী ব্রজেশ্বরের হাতে সাদা নিশানটি দিয়া চলিয়া যাইতেই রঙ্গরাজ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কার হুকুমে সে সাদা নিশান দেখাইয়াছে। পরে বুঝিতে পারিল দেবীর আদেশেই ইহা হইয়াছে। দেবীর কাছে যাইতেই দেবী রঙ্গরাজকে বলিল যে, সে ধরা দিবে। রঙ্গরাজ আপত্তি জানাইতে দেবী নিজের দৃঢ় সংকল্প জানাইয়া তাহাকে ব্রেনান সাহেবের কাছে সাদা নিশান লইয়া যাইতে নির্দেশ দিয়া বলিল, সে যেন সাহেবকে বলে যে—দেবী একাই ধরা দিবে, তাহারা বজরা বা আর কাহাকেও পাইবে না। ভবানী ঠাকুর যুদ্ধ করিতেছেন জানিয়া তাঁহার কাছে রঙ্গরাজকে পাঠাইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিবার অনুরোধ জানাইল। যদি তিনি আপত্তি করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আকাশের দিকে তাকাইতে বলিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন। ভবানী ঠাকুরকে দেবীর কথা জানাইতে ভবানী ঠাকুর আকাশের কোণে মেঘ জমাট হইয়াছে দেখিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। দেবীর নির্দেশ মতো নিশি ও দিবা মাঝিমাল্লাদের চুপি চুপি প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ দিয়া গেল।

টীকা : আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদেরকে !—প্রফুল্ল স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্যও লোকক্ষয় করিতে রাজী নয়।

সার্থক নিষ্কাম ধর্ম শিখিয়াছিল—প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম শুধু তত্ত্ব হিসাবেই গ্রহণ করে নাই তাহাকে কর্মক্ষেত্রেও অনায়াসে প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছিল।

'জয় জগদীশ্বর' বলিয়া ছাদ হইতে নামিল—মেঘ ক্রমশঃ বাড়িতে দেখিয়া ঝড়ের সুযোগ গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা স্থিরবুদ্ধিতে সে গ্রহণ করিল। বৈশাখী ঝড় আসিলে লড়াই না করিয়া সে শ্বশুর ও স্বামীকে বাঁচাইতে পারিবে।

ঝড় আসার লক্ষণ দেখিয়াই ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিল। ইহা কোনো 'উদ্ভট কল্পনার অত্যাচার' নয়। যাহাদের নদীপথে যাতায়াত করিতে হয়, তাহারা ঝড়ের এই লক্ষণ বুঝিতে পারে।

লাঠি ছাড়িয়াই বাঙালী নির্জীব হইয়াছে—লাঠিই বাঙালীর শক্তির পরিচয় বহন করিত। সেই লাঠি পরিত্যাগ করায় বাঙালী শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

কোম্পানীর লোক সকল অর্থের বশ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের অর্থলোভের কথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

ইংরেজ আপনার বুদ্ধিতে সব খোয়াইবে—দেবীর শর্ত ছিল সে ধরা দিবে কিন্তু বজরা বা বজরার কোনো আরোহীকেই স্পর্শ করিতে দিবে না। দেবী যেন ইহাও বুঝিয়াছিল যে, ব্রেনান এই শর্ত মানিবে না এবং শেষ পর্যন্ত তাহারই বুদ্ধির দোষে বুদ্ধির খেলায় তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।

দেবী যেন দর্পণের ভিতর সকল দেখিতে পাইতেছিলেন—আসন্ন বৈশাখী ঝড় দেবীর সহায়। তাই পর পর কি ঘটিতে পারে দেবী যেন বুঝিতে পারিয়াছিল। শত্রু মিত্র কাহারও বিশেষ ক্ষতি হইবে না ইহা সে বুঝিয়াছিল।

পরিচ্ছেদ

রঙ্গরাজ সাদা নিশান লইয়া ব্রেনান সাহেবের ছিপে উঠিয়া দেবীর শর্ত জানাইল। সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল যে, সে দলের সকলকেই ধরিবে। বরকন্দাজরা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সাহেব গর্জন করিয়া বলিল যে, তাহারা সাদা নিশানের ভাণ করিয়া পালাইতেছে। রঙ্গরাজ তখন বলিল যে তাহারা ধরিতেই পারে নাই, কাজেই পালাইবার প্রশ্ন উঠে না। সে সাদা নিশান ফেলিয়া দিয়া বলিল, যদি সাহেবের শক্তি থাকে তো তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করুক। ঝড় আসন্ন দেখিয়া সাহেব আর অগ্রসর হইল না। তবে বজরা দখল করিবে স্থির করিল। রঙ্গরাজের সতর্ক বাণী শুনিল না। সাহেব বজরার বরকন্দাজদের অস্ত্র কাড়িয়া লইতে বলায় দেবীর আদেশে সকলে অস্ত্র জলে ফেলিয়া দিল। তখন সাহেব খুশী হইয়া একজনমাত্র সিপাহী লইয়া দেবীর বজরায় উঠিল এবং রঙ্গরাজের সঙ্গে নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিল। সেই কামরায় তখন নিশি ও দিবা সুসজ্জিতা হইয়া বসিয়া আছে আবার দেবী এক পাশে সাধারণ পোশাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাহেব নিশি ও দিবার মধ্যে কে দেবীচৌধুরাণী জানিতে চাহিলে নিশি ও দিবা উভয়েই নিজেদের দেবীচৌধুরাণী বলিয়া পরিচয় দিল। সাহেব বিরক্ত হইয়া রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে—সে ইহার মধ্যে কোনো

রহস্য আছে বুঝিতে পারিয়া নিশিকে দেখাইয়া দিল। তখন দেবী বলিল যে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই দেবী। ইহার পর দেবী, নিশি ও দিবা প্রত্যেকেই নিজেকে দেবী বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিল। সাহেব যখন দুজনকেই ধরিয়া লইয়া যাইবে বলিল, তখন নিশি ও দিবা সাহেবকে বলিল যে, তাহার সঙ্গে যদি কোনো গোয়েন্দা থাকে তাহা হইলে সেই বলিতে পারিবে কে দেবী। তখন হরবল্লভের ডাক পড়িল।

টীকাঃ দেবীর স্থির বুদ্ধিই শাণিত মহাস্ত্র—বজরায় কাহারও অস্ত্র না না থাকিলেও দেবী নিজের বুদ্ধিতে যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা যে কোনো অস্ত্র হইতে তীক্ষ্ণ। দেবীর কৌশলে ব্রেনান ফাঁদে পা দিয়াছে। পরে হরবল্লভ যে আসিলেন তাহাও দেবীর কৌশলে। তাঁহাকে রক্ষা করিবার পরিকল্পনা আগেই নিশি ও দিবার সঙ্গে স্থির হইয়াছিল। দেবী নিজেকেও সেই সঙ্গে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। ব্রজেশ্বরের কাছে সে কথা দিয়াছে। এই কারণেই নিশি ও দিবাকে দেবী চৌধুরাণীর অভিনয় করিতে হইতেছে। এই সব কিছুই দেবীর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয়বাহী। এই সঙ্গে আসন্ন ঝড়ের আভাসও রহিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হরবল্লভ অনেকটা বিপাকে পড়িয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেবী চৌধুরাণীর বজরা দেখাইয়া দিয়া ভয়ে দূরে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ থামিয়া গেল দেখিয়া তিনি ভাবিলেন ইংরাজ সিপাহীদের জয় হইয়াছে। সেই সঙ্গে গোয়েন্দার ডাক পড়িতেই হরভল্লভ যথাস্থানে হাজির হইলেন। হরভল্লভ আসিবার আগেই দেবী চলিয়া গিয়াছিল। নিশি ও দিবা তাহাকে খাঁসাহেব বলিয়া অভ্যর্থনা জানাইল। হরবল্লভও দেবীকে চিনেন না। তখন দিবা হরবল্লভের পুত্র ব্রজেশ্বরকে আনিবার পরামর্শ দিল। ব্রজেশ্বরের উপস্থিতির কথা শুনিয়া হরবল্লভ চমকিয়া উঠিলেন—ব্রজেশ্বর বজরার ছাদ হইতে আসিতেই সাহেব প্রকৃত দেবী কে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রজেশ্বর দিবা ও নিশিকে দেখাইয়া বলিল যে ইহারা কেহই দেবী নহে। দেবীকে সে চিনে বটে, কিন্তু দেখাইয়া দিবে না। সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া গালিগালাজ করিতেই ব্রজেশ্বর সাহেবকে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। সেই মুহূর্তেই ঝড় উঠিল এবং কামরার ভিতর হইতে দুইবার শাঁখে ফুঁ দিতেই বজরা একবার দুলিয়া টলিয়া ঝোড়ো-হাওয়ায় বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়া চলিল। দেবীর বুদ্ধিব কাছে ইংরাজ সেনা পরাস্ত হইল। ব্রেনান সাহেব ও হরবল্লত বন্দী হইলেন। দেবী যে ঝড়ের প্রত্যাশা করিতেছিল সেই ঝড়ই তাহাকে বিনা অস্ত্রে যুদ্ধে জয়ী করিল।

টীকাঃ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং—চাণক্যশ্লোকের অংশ—শৃঙ্গী, নদী, নটী,

শস্ত্রপাণি, স্ত্রীলোক এবং রাজকুল ইহাদের কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। **ফেরেব**—প্রবঞ্চনা। **'করিলে কি! করিলে কি! সর্বনাশ করিলে?'**—হরবল্লভ ইংরাজের পদলেহী। কাজেই পুত্র সাহেবকে চপেটাঘাত করাতে তিনি ভয়ে কাতরাইয়া উঠিলেন। **আমার রক্ষার উপায় ভগবান করিতেছেন**—বাইরে যে ঝড়ের আভাস দেখা দিয়াছে, তাহা দেবীর কাছে যেন ভগবানের আশীর্বাদ। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই দেবীর জীবনতরী সুখে দুঃখে, প্রশান্তি ও দুর্যোগে প্রবাহিত হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বজরা প্রচণ্ড গতিতে ঝড়ের ঠেলায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সাহেব ও ব্রজেশ্বরের আবার একটা হাতাহাতি শুরু হইবার আগেই হরবল্লভ ব্রজেশ্বরকে সাহেবের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিলেন। ব্রজেশ্বর পিতৃ আজ্ঞায় সাহেবের কাছে ক্ষমা চাহিল। নিশি হরবল্লভ ও ব্রেনানের সম্মুখে বসিয়া আছে, ব্রজেশ্বর ও রঙ্গরাজ বাহিরে গিয়াছে। নিশি তখন হরবল্লভকে বলিল যে তাহারা ডাকিনীর শ্মশানের দিকে যাইতেছে। সেখানে সাহেবের ফাঁসি হইবে এবং হরবল্লভকে বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্য শূলে দেওয়া হইবে। হরবল্লভ ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। নিশি বলিল, প্রবঞ্চকের কথায় বিশ্বাস নাই। হরবল্লভের কাকুতি-মিনতি যখন চরমে পৌঁছাইল, তখন নিশি বলিল যে যদি তিনি নিশির ভগিনীকে বিবাহ করিতে রাজী থাকেন তাহা হইলে একটি কুলীন কন্যারও সদ্‌গতি হয়, তাঁহার মুক্তি পাইবারও উপায় হয়। এই কথা শুনিয়া হরবল্লভের মাথার উপর হইতে যেন পাহাড় নামিয়া গেল। তবে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার পরিবর্তে তাঁহার ছেলের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। নিশি তাহাকে গৃহে ফিরিয়া বৌভাতের ব্যবস্থা করিতে বলিল। ব্রজেশ্বরকে বিবাহের পরে বৌ সঙ্গে পাঠাইয়া দিবে। দেবীকে এই সংবাদ দিতে নিশি ভিতরে গেল।

টীকাঃ সাহেব আমরা হিন্দু……আমাকে মাপ করুন—বঙ্কিমচন্দ্র ব্রজেশ্বরকে সকল রকম পরিস্থিতিতেই পিতৃভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। অথচ এই পরিচ্ছেদে এবং ইহার আগেও হরবল্লভের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা খুব শ্রদ্ধার্হ নয়।

আমায় কি কেউ রক্ষা করিতে পারে না গা!—শূলদণ্ডের ভয়ে হরবল্লভ একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। হরবল্লভ শুধু নীচ প্রকৃতিরই নয়, সে ভীরুও বটে।

তোমাদের যা ইচ্ছা……আমি তা পারিব না—ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতে বলিলে, পাছে ছেলের অকল্যাণ হয়—এইভয়ে হরবল্লভ সেইরূপ দিব্য করিতে রাজী হইল না। হরবল্লভের আর কিছু না থাক—পুত্র স্নেহটুকু ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ঝড় থামিতে পরদিন প্রভাতে বজরাও থামিল। আজ দেবীর পক্ষে সুপ্রভাত—সে শ্বশুর বাড়ী যাইবে। এতদিনে বুঝি 'দেবীচৌধুরাণীর' অবসান ঘটিল—প্রফুল্লই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। দেবী রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, যেখানে বজরা আসিয়াছে সেখান হইতে রংপুর অনেক দূর, তবে ভূতনাথে ডাঙা পথে একদিনে যাওয়া যায়। নিশি হরবল্লভের সাক্ষাতে বলিল যে, সাহেবটাকে ফাঁসি দিতে হইবে—ব্রাহ্মণটাকে এখনই শূলে না দিয়া পাহারাবন্দী করিয়া স্নানাহ্নিকে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। রঙ্গরাজ অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া সাহেবকে লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বলিল যে, তাহাকে ফাঁসি না দিয়া মুক্তি দেওয়া হইতেছে। দেবীর নির্দেশ মতো সে সাহেবকে পাথেয় স্বরূপ এক শত মোহর দিতে গেল—সাহেব পাঁচটি মাত্র মোহর ঋণ স্বরূপ লইয়া চলিয়া গেল। রঙ্গরাজ পরে পাল্কী বেহারার সন্ধানে গেল।

টীকা : সুপ্রভাত—দেবী সকল দিকে মঙ্গল অর্থে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। দিবা নিজের নামের সঙ্গে জড়িত করিয়া নিশির অবসানে যে প্রভাত দেখা দেয় তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছে।

যেদিন আমার অবসান হইবে……দেবীচৌধুরাণীর অবসান—নিশির এই উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। নিশি যেন বলিতে চায়, যদি তাহার অবসান ঘটে—তাহা হইলে তাহাকে মঙ্গলের কারণ বলিতে হইবে। 'এ অন্ধকারের অবসান নাই'—কথাটি যেন নিশির জীবনের কোনো এক গভীর দুঃখের ইঙ্গিত বহন করে। নিশি হয়ত জীবনের আলো কোথাও দেখিতে পাইতেছে না। তবে দেবীর সুপ্রভাত হইয়াছে—ইহা নিশি বুঝিতে পারিয়াছে। দেবী শেষ পর্যন্ত জীবনের লক্ষ্যে যেন পৌঁছাইতে পারিয়াছে। অথচ নিশির সম্মুখের পথ যেন অন্ধকার। দেবীচৌধুরাণীর দেবীত্বের অবসান ঘটায় আবার চিরায়মানা প্রফুল্ল দেখা দিল।

দেবী মরিয়াছে, প্রফুল্ল শ্বশুর বাড়ী চলিল—দস্যুদলনেত্রী দেবী চৌধুরাণীর কর্মের অবসান ঘটিয়াছে—এখন যে আছে সে দেবীচৌধুরাণী নয়—সে প্রফুল্ল—ব্রজেশ্বরের স্ত্রী প্রফুল্ল।

ওয়ারেশ—উত্তরাধিকারী।

দশম পরিচ্ছেদ

পিতা উপস্থিত থাকায় ব্রজেশ্বর দেবীর নিকট আসিতে পারিতেছিল না। ব্রজেশ্বর সুযোগ পাইয়া আসিতেই দেবী তাহাকে বলিল সে তাহার কথা মতো নিজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে গৃহিণী করিয়া গৃহে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিল। কথা হইল, আগে হরবল্লভ প্রত্যাবর্তন করিবেন, পরে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে লইয়া ফিরিবে। হরবল্লভের জন্য পাল্কী প্রস্তুত। নিশি হরবল্লভকে জলযোগ করাইবার জন্য বসাইল। হরবল্লভ ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন! ব্রজেশ্বর আসিলে তিনি তাহাকে নিশির ভগ্নীকে বিবাহ করিবার জন্য বলিলেন। প্রসঙ্গত তিনি ব্রজেশ্বরকে কুল-শীল-জাতি-মর্যাদা ও পাওনা বুঝিয়া বিবাহ করিবার পরামর্শ দিলেন। ব্রজেশ্বর পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিল। জলযোগ সমাপনান্তে হরবল্লভ পাল্কীতে চড়িয়া যাত্রা করিলেন। নিশির কাছে সব শুনিয়া ব্রজেশ্বর স্থির করিল যে সে কখনও তাহার পিতাকে প্রবঞ্চনা করিবে না। প্রফুল্লকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিবে। ব্রজেশ্বরের এই কথায় ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি ও দায়িত্ববোধের পরিচয় পাইয়া দেবী ও নিশি খুশী হইল।

টীকা ঃ দেবী মরিয়াছে.........দেবীর সঙ্গে যাইবে ?—যে দেবীচৌধুরাণী দস্যুবৃত্তি করিত সে আর নাই, এখন আছে সেই পুরাতন প্রফুল্ল। প্রফুল্লর প্রশ্ন—এই প্রফুল্ল কি দেবীর মতো সংসারক্ষেত্র হইতেও সরিয়া যাইবে? যদি ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে গ্রহণ না করে তাহা হইলে প্রফুল্লরও এই সংসারে থাকিয়া লাভ নাই। ব্রজেশ্বরের জন্যই প্রফুল্ল এখনও জীবনধারণ করিয়া আছে।

বিশেষ বড় বউমাটির.........এ বিষয়ে কাতর আছি—এখানে প্রফুল্লর কথাই বলা হইতেছে। হরবল্লভ প্রফুল্লর মৃত্যু সংবাদে কতখানি কাতর হইয়াছেন তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয়।

তা তোমায় আর বলিব কি.........ন্যায্য পাওনা গণ্ডা, তাও ত জান ?—হরবল্লভ নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বিবাহের কথা দিয়াছেন। কিন্তু অর্থলোভ যে তাঁহার মজ্জাগত—তাহা কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছেন না। তা ছাড়া কৌলীন্যের গর্বও রহিয়াছে। তাই কুলশীল হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যায্য পাওনার কথাও ভোলেন নাই—ছেলেকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই। যে মুহূর্তে তিনি নিজের প্রাণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তার পরক্ষণেই তাঁহার ভিতরে সংকীর্ণচিত্ত মানুষটি জাগিয়া উঠিয়াছে। কুলীন কন্যা বিবাহ করিলে যে ন্যায্য মর্যাদা গ্রহণ করিতে হয় সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন—ব্রজেশ্বরও যেন ইহাদের কথায় ভুলিয়া না যায়—তাহাই তাহাকে গলা খাটো করিয়া বলিয়া সচেতন করিয়া দিতেছেন।

যদি বাপকে ঠকাইলাম.........আমার আটকাইবে ?—ব্রজেশ্বর গোড়া হইতেই পিতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল। হরবল্লভের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি যে তাহার নজরে পড়ে নাই তা নয়, কিন্তু সকল প্রকার পরিস্থিতিতেই তাহার পিতৃভক্তি এতটুকু কমে নাই। সম্ভবত যুগানুযায়ী পিতার কৃতকর্মের কোনোরূপ বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়াই পিতৃ মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমের ব্রজেশ্বর অসংশয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর-প্রফুল্লর ভূতনাথ যাইবার প্রস্তুতি চলিল। রঙ্গরাজকে পাছে ব্রজেশ্বরের দ্বারবানেরা চিনিয়া ফেলে এইজন্য রঙ্গরাজকে আগেই বিদায় দিবার কথা উঠিতে রঙ্গরাজ কাঁদিয়া ফেলিল। তখন প্রফুল্ল, নিশি, দিবা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইল। প্রফুল্ল দেবীগড়ের ঘরবাড়ী, দেবত্র সম্পত্তি প্রভৃতি রঙ্গরাজকে দিলেন। তাহাকে সেখানে দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কালাতিপাত করিতে উপদেশ দেওয়া হইল। প্রফুল্ল তাহাকে লাঠিবাজি না করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। পরোপকারের নামে পরপীড়ণ করিয়া লাভ নাই। দুষ্টের দমন ভগবানই করিবেন। ভবানী ঠাকুরকেও তাহার প্রণাম জানাইয়া এই কথাগুলি বলিতে বলিল। রঙ্গরাজ বিদায় হইল। দিবা ও নিশি ভূতনাথের ঘাট পর্যন্ত প্রফুল্লর সঙ্গে গেল। তাহারাও ফিরিয়া গিয়া দেবীগড়ে বাস করিবে এবং দেবসেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। বজরায় প্রফুল্লর যা ছিল সবই দিবা ও নিশিকে দিল। নিশি প্রফুল্লকে শ্বশুর বাড়ীতে নিরাভরণা হইয়া যাইতে দিল না। সে তাহার নিজস্ব রত্নালঙ্কারে প্রফুল্লকে সাজাইয়া দিল। প্রফুল্ল দিবা ও নিশির পায়ের ধূলা লইয়া বিদায় হইল। দিবা ও নিশি অশ্রুসজল নয়নে দেবীগড়ে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা দাঁড়ি-মাঝি-বরকন্দাজদের বেতন চুকাইয়া দিয়া বজরাখানিকে আর রাখা অকর্তব্য ভাবিয়া তাহা দুই বৎসর ধরিয়া চেলা কাঠ করিয়া পোড়াইল।

টীকা : স্ত্রীলোকের এই আভরণ সকলের চাঁল ?—প্রফুল্ল নিরাভরণা হইয়া শ্বশুর বাড়ি যাইতেছে দেখিয়া নিশি আপত্তি করিলে প্রফুল্ল বলিল, স্বামীই নারীর আভরণ, আর কোনো আভরণের প্রয়োজন নাই।

দিবা তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরিলেন ?—নিশি কাঁদিতেই দিবাও সেই সঙ্গে কাঁদিতে শুরু করিল।

এই পরিচ্ছেদে প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে লাঠি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে লাঠির মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিতে বলায় অনেক সমালোচক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। লাঠির দ্বারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন না কাটাইতেই প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে উপদেশ দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে লাঠির মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়াছেন তাহা যে

প্রফুল্লরও বক্তব্য হইবে—তাহা অবধারিত ভাবে ধরিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। শান্ত জীবন যাপনের উপায় যেখানে আছে সেখানে লাঠির প্রয়োজন না থাকিলে লাঠির লাঠিত্ব না থাকিয়া তাহা ঠ্যাঙা হইয়া পড়ে। প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে ঠ্যাঙাড়ে না হইবার উপদেশই দিয়াছিল। এক কথায় এভাবে ডাকাতি না করিবার অনুরোধ সে রঙ্গরাজকে ও রঙ্গরাজের মারফৎ ভবানী ঠাকুরকে জানাইয়াছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভূতনাথের ঘাটে প্রফুল্লর বজরা ভিড়িতেই গ্রামে ব্রজেশ্বরের নূতন বউ বিবাহ করিয়া আনার সংবাদ রটিয়া গেল। নূতন বউ বয়স্কা শুনিয়া গ্রামের ছেলে বুড়া সকলেই বউ দেখিতে ছুটিয়া আসিল। ব্রজেশ্বরের মাতা বধূবরণের সময় মাথার ঘোমটা দেখিয়া ঘোমটা তুলিয়া চমকিয়া উঠিলেন—তাঁর চোখে জল আসিল। তিনি তখন সকলকে বলিলেন যে এখন ছেলে-বউ অনেক দূর হইতে আসিয়াছে তাহাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। ঘরের বউ ঘরে রহিল, তাহারা নিত্যই দেখিতে পাইবে। ইহাতে গ্রামের সকলে ক্ষুণ্ণ হইয়া নূতন বউ-এর বয়স ও চেহারা লইয়া নানা নিন্দা করিতে লাগিল। গৃহিণী ব্রজেশ্বরকে নির্জনে পাইয়া প্রফুল্লকে কোথায় পাইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রজেশ্বর বিধাতার দয়ায় পাইয়াছে বলিয়া পিতাকে জানাইবার কথা বলায় তাহার মাতা নিজেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। বৌভাতের পর—প্রফুল্ল যে নূতন বউ—তাহা ব্রজেশ্বরের মাতা হরবল্লভকে জানাইতেই হরবল্লভ প্রথমে একটু উত্তেজিত হইবার চেষ্টা করিলেও পরে গৃহিণীর কথায় চুপ করিয়া গেলেন। স্থির হইল, প্রফুল্লর কথা বলা হইবে না। সকলে নূতন বউ বলিয়াই জানিবে। ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লও তাহা শুনিল।

পরের বাড়ির বউ দেখার ব্যাপারে প্রতিবাসীদের যে উদগ্র উৎসাহ দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তার সুন্দর চিত্র এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রজেশ্বর নূতন বউ লইয়া আসিয়াছে শুনিয়া ছেলে বুড়া কানা খোঁড়া সকলেই ছুটিয়াছে। বাড়ির বউ-ঝিরা লজ্জার মাথা খাইয়া শ্বশুর-ভাশুর না মানিয়া ছুটিয়াছে ইত্যাদির জীবন্ত বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

টীকা: কুলীনের ঘরে অমন ঢের হয়—প্রফুল্লর বয়স বেশি জানিয়া অনেকে ধেড়ে বউ লইয়া নানা আলোচনা করিতেছিল। কেহ কেহ কুলীনের মেয়ে অনেক সময় বয়স্কা হয় বলিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিল।

এ হারাধন আবার কোথায় পেলে বাবা?—ব্রজেশ্বরের মাতা প্রথম দিন

হইতেই প্রফুল্লকে স্নেহের চোখে দেখিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রফুল্লকে 'হারাধন' বলিতেছেন্।

সুপ্ত ব্যাঘ্রকে কে যেন বাণে বিঁধিল—হরবল্লভ একদিন যাহাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন সেই ব্রজেশ্বরের নূতন বউ শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার সুপ্ত ক্রোধ যেন প্রকাশ পাইতে চায়। অন্যদিকে তিনি জানেন যে সে মরিয়া গিয়াছে। তবুও সেই প্রফুল্লই আবার তাঁহার ঘরে আসিবে ইহা যেন তিনি কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু করারও নাই। পাকস্পর্শ ইত্যাদি নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছে।

মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি ?—ব্রজেশ্বরের মাতার সম্বন্ধে বলা হইতেছে। প্রফুল্লর খবর হরবল্লভকে দিয়া তাঁহার মত পরিবর্তন করানো হরবল্লভ-গৃহিণীর বাহাদুরি বটে। একবার তিনি হারিয়াছিলেন, এবার তাঁরই জয় হইল। তিনি নিপুণভাবে এই পারিবারিক সমস্যাটি মিটাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাঁর গৃহিণীপনার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহিণীরা যদি এই ভাবে হাল ধরিতে পারেন, তাহা হইলে সংসার-তরণীর ডুবিবার ভয় থাকে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল সাগরকে দেখিতে চাহিলে সাগরকে পিত্রালয় হইতে আনা হইল। সাগর শুনিয়াছিল যে ব্রজেশ্বর আবার এক বয়স্কা মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। শুনিয়া তাহার ঘৃণা হইল। সে শ্বশুর বাড়ি আসিয়া প্রথমে নয়নতারার কাছে নূতন বউ সম্বন্ধে জানিতে গেল। তাহার কাছে জানিল যে বউ সব সময় ঘোমটা টানিয়া বেড়ায়—জাতের ঠিক নাই, বয়সে প্রায় সাগরের মার বয়সী, রূপে 'গালফুলো গোবিন্দের মা'। নয়নতারা ব্রজেশ্বরকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য মুড়োঝাঁটা তুলিয়া রাখিয়াছে। সাগর নূতন বউকে খুঁজিতে গিয়া পুকুরঘাটে পাইল। সেখানে সে বাসন মাজিতেছে। সাগর সবিস্ময়ে দেখিল এই 'নূতন বউ' আর কেউ নয়—সেই দেবীরাণী। প্রফুল্ল তাহাকে বলিল যে দেবী, প্রফুল্ল সকলেই মরিয়াছে—সে এখন এই বাড়ির নূতন বউ নামেই পরিচিত। পরে সাগর প্রফুল্লের কাছে আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা শুনিল। সাগর জিজ্ঞাসা করিল যে, এতদিন রানী-গিরি করিয়া তাহার কি ঘরের সাধারণ কাজ করিতে, পরের হুকুম তামিল করিতে ভালো লাগিবে ! উত্তরে প্রফুল্ল বলিল যে, ভালো লাগিবে বলিয়াই সে আসিয়াছে। সংসার-ধর্ম পালনই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই ধর্ম অত্যন্ত কঠিন, প্রফুল্ল এই ধর্মই সন্ন্যাসিনীর মতো পালন করিবে। প্রফুল্ল আসার পর হরবল্লভের সংসারে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। একমাত্র নয়নতারা ছাড়া আর কারও কোনো ক্ষোভ নাই।

টীকা ঃ আবার বিয়ে ?—ব্রজেশ্বর বিবাহ করিয়া নূতন বউ আনিয়াছে শুনিয়া সাগরের ক্রোধ হইল। কুলীনের ঘরে এই রকম প্রায় হয় বটে, কিন্তু সপত্নীকে স্বীকার করিয়া লওয়া কুলীন অকুলীন কোনো কন্যার পক্ষেই সম্ভব নয়।

সাপকে হাঁড়ির ভিতর···নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল—নয়নতারাও প্রফুল্ল আসা অবধি ক্ষেপিয়া আছে। ব্রজেশ্বর তার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। নিজের ছেলে মেয়েরা মার খায়, এমনকি প্রফুল্লও একদিন ভাব করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়াছে।

বিয়ে কি নিকে—এখানে 'নিকে' বলিতে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বার বিবাহ করা বুঝাইতেছে। নয়নতারা ক্রুদ্ধ হইয়াই 'নিকে' কথাটি অশ্রদ্ধার সঙ্গে বলিয়াছে।

আমি তবে সেই সোনার প্রতিমাখানা দেখে আসি—নয়নতারা এতক্ষণ নূতন বউ-এর যে বর্ণনা দিল তাহাতে তাহার বিসদৃশ রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সাগরের উক্তির অর্থ এই যে, নয়নতারা বর্ণিত কুৎসিৎ চেহারার বউটিকে একবার দেখিয়া আসা দরকার। অনেকে ভাবিয়াছেন সাগর সবকিছু জানিয়াই নয়নতারার কাছে নূতন বউ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াছিল। সাগর 'সোনার প্রতিমা' কথাটি ব্যঙ্গ করিয়াই বলিয়াছে। কারণ পরেই দেখি যে সে প্রফুল্লকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে।

প্রফুল্ল বাসন মাজিতেছে—প্রফুল্ল জমিদার ঘরের বধূ হইয়া কেন বাসন মাজিতেছে—এই প্রশ্ন লইয়া অনেকেই মাথা ঘামাইয়াছেন। রাণীগিরি হইতে বাসন মাজা পর্যন্ত কোনো কাজই যে প্রফুল্লর পক্ষে অসম্ভব নয় তাহা বুঝাইবার জন্যই এইটুকু দেওয়া হইয়াছে। ঘরের বড় বউ হইতে গেলেও তাহাকে নানা লোক, নানা কাজ, নানা সমস্যা লইয়া বিব্রত থাকিতে হইবে। প্রফুল্ল যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহাতে কোনো কাজই তাহার কাছে কঠিন বলিয়া মনে হইতে পারে না। কোনো কাজই ছোট নয়—এ কথা সাগরও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র পরেই বলিয়াছেন যে—প্রফুল্ল কাজ খোঁজে। সে কাজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়—পরের সুখ খোঁজাই তাহার কাজের প্রধান উদ্দেশ্য। স্বামীর ঘরের সকল কাজই তাহার নিজের কাজ বলিয়া সে মনে করিতে পারে। গৃহধর্ম যে নারীর পুণ্যধর্ম—এই নীতি প্রফুল্ল সমগ্র জীবন দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। নারীর যা প্রধান কর্তব্য—প্রফুল্ল সেই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। প্রফুল্ল সকল কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়াই কর্ম করিতেছে। এই শিক্ষা সে দেবীচৌধুরাণী হইবার প্রাক্কালেই লাভ করিয়াছিল। প্রফুল্লর এই নিঃস্বার্থ কর্ম সাগরকেও প্রভাবিত করিয়াছে। সে প্রফুল্লকে বলিয়াছে, 'তবে কিছু দিন আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার চেলা হইব।' ভবানী ঠাকুরের কাছে প্রফুল্ল যে নিষ্কাম ধর্মে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল—তাহাই সে গৃহকার্যে প্রয়োগ করিয়াছে। ইহাও তাহার এক প্রকারের সন্ন্যাসধর্ম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লর কার্যে ও ব্যবহারে হরবল্লভের গৃহে সকলেই মুগ্ধ। বিশেষ করিয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ। শ্বশুর তাহার পরামর্শ লইয়া কাজ করেন। রান্নাঘরের দায়িত্বও তাহাকে লইতে হইল। সাগরের তো কথাই নাই—শেষ পর্যন্ত নয়নতারাও তার বশীভূত হইল। তাহার ছেলেমেয়েগুলি সাগরের তত্ত্বাবধানে রহিল। সাগর প্রফুল্লকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ীতে বেশিদিন থাকিতে পারিত না। প্রফুল্ল সংসারে থাকিয়া যথার্থ সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করে। তাহার পক্ষে কোনো কাজই কঠিন ছিল না—কোনো কাজেই তাহার ক্লান্তি ছিল না। কারণ প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্মপরায়ণা। সে সংসারে থাকিয়াও 'সংসার-গ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল'। প্রফুল্ল অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী হইয়াও কখনও সেই পাণ্ডিত্য জাহির করে নাই। যথার্থ পণ্ডিত যে—সে কখনও আপনাকে জাহির করে না। নয়ন ও সাগরকেও তার মতো সমভাবে ভলোবাসিতে ব্রজেশ্বরকে সে অনুরোধ করে। প্রফুল্লর গুণে হরবল্লভের বিষয়আশয় বৃদ্ধি পাইল। তিনি ধনজন সৌভাগ্যে পরিবৃত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণের কথা স্মরণ করাইয়া তাহা দ্বারা একটি অতিথিশালা নির্মাণ করিতে অনুরোধ করিল। ব্রজেশ্বর 'দেবী নিবাস' নামে এক অতিথিশালা নির্মাণ করিল। যথাকালে পুত্রপৌত্রে সমাবৃতা হইয়া প্রফুল্লও স্বর্গারোহণ করিলে দেশের লোক নিজেদের মাতৃহীন বলিয়া মনে করিল।

অন্য দিকে রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি নিজ নিজ কার্য সমাধা করিয়া পরলোক গমন করিল। কেবল ভবানী পাঠক ডাকাতি বন্ধ করিয়া ইংরাজ শাসকদের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া দ্বীপান্তরে চলিয়া গেলেন।

গ্রন্থের শেষে লেখক প্রফুল্লকে গীতোক্ত 'পরিত্রাণায় সাধুনাং' ইত্যাদি শ্লোকের প্রতীক রূপে পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। উপন্যাসে প্রফুল্ল চরিত্র যে ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহার সঙ্গে এই পরিশিষ্টটুকুর সম্পর্ক কতখানি তাহা ভাবিয়া দেখিবার মতো। অন্যায় অসত্যকে ধ্বংস, সজ্জন পালন, ধর্ম প্রতিষ্ঠা প্রফুল্লের জীবনে কতখানি প্রযোজ্য—এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। মনে হয়, প্রফুল্লর জীবনে যে শিক্ষা শুরু হইয়াছিল তাহার মধ্যে এই মন্ত্রই ভিত্তি ছিল। ভবানী ঠাকুরের শিক্ষা প্রফুল্লর জীবনে বিফলে যায় নাই। অন্যায় অসত্যকে প্রফুল্ল কখনও প্রশ্রয় দেয় নাই। সত্যকে জীবনের সার বলিয়া জানিয়াছে—কর্মে কোনো কামনাবাসনা ছিল না। সর্বোপরি নিজের উদারতায় ও অসীম ধৈর্যে ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখিয়া—তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রফুল্ল নিষ্কাম ভাবেই দান করিয়াছে। অর্থ ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়াইতে পারে। ভবানী

ঠাকুরের শিক্ষা তাহাকে শুধু অর্থাকাঙ্ক্ষাই নয়, সকল আকাঙ্ক্ষা হইতেই নিবৃত্ত করিয়াছে। কেবল একটি জায়গায় ভবানী ঠাকুরের শিক্ষা সফল হয় নাই। প্রফুল্ল একাদশীতে মাছ খাইত। স্বামী সম্বন্ধে তাহার আকুলতা তাহার সকল কর্মপ্রেরণা জোগাইয়াছে—আসক্তি-বিমুখীও করিয়াছে। এখানেই প্রফুল্ল চরিত্রের সার্থকতা।

টীকা ঃ প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল—সমস্ত কামনাবাসনা ত্যাগ করিয়া সংসারধর্ম পালন করা—নিষ্কাম ধর্ম অভ্যাসেরই ফল। নিরাসক্তিই প্রফুল্লকে সন্ন্যাসিনী করিয়াছে। প্রফুল্লর কাজ করাও পরের সুখের জন্য।

প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র—সর্বপ্রকার শিক্ষা লাভে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত প্রফুল্ল চরিত্র। ভবানী ঠাকুরের কাছে যে সার্থক শিক্ষা প্রফুল্ল লাভ করিয়াছে তাহাতে যে কোন অবস্থার সম্মুখীনই হোক না, কিছুই প্রফুল্লকে বিচলিত করিতে পারিবে না। অথচ বাহিরে প্রফুল্ল কখনও তাহা জাহির করে নাই। যথার্থ জ্ঞানী যে তাহার নিজেকে প্রচার করিতে হয় না। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে ভবানীঠাকুরের শিক্ষায় প্রফুল্ল চরিত্র এত সার্থক সেই ভবানী ঠাকুরকে লেখক দ্বীপান্তরে পাঠাইলেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় মনে হয়, ইংরাজরা রাজ্যভার গ্রহণ করার পরে রাজ্য সুশাসিত না হওয়া পর্যন্ত ভবানীঠাকুর ডাকাতি করা বন্ধ করেন নাই। রাজ্য সুশাসিত হইবার পরে তিনি ডাকাতি বন্ধ করিয়া সকল দোষ স্বীকার করিয়া যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেন। ভবানী ঠাকুর যে নিষ্কাম ধর্মকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন প্রফুল্ল তাহাকে পারিবারিক জীবনে প্রয়োগ করিল। নারীর পক্ষে যা স্বাভাবিক তাহাকে সে আরও সুন্দর আরও মহৎ করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইল। হয়ত তাই ভবানী ঠাকুরের একটা 'কিন্তু' ছিল—'পুরুষ হইলে ভালো হইত!'

প্রশ্নমালা ও উত্তরসংকেত

১। দেবী চৌধুরাণীকে কোন জাতীয় উপন্যাস বলা যায়?

উঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্য বিচারের যেমন একটা মাপকাঠি আছে বাংলা সাহিত্যের বিচারের তেমনই একটা মাপকাঠি রহিয়াছে। বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধেও সেই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। উপন্যাসের সামাজিক, ঐতিহাসিক, তত্ত্বমূলক, সমস্যামূলক প্রভৃতি বিষয়গত শ্রেণীর ভাগ করা যায়। এইসব শ্রেণীর উপন্যাসের

বস্তুতান্ত্রিক, রোমান্টিক, মননপ্রধান প্রভৃতি বিভিন্ন অন্তঃ প্রেরণাও রহিয়াছে। এছাড়া ইংরাজীতে যে Novel, Romance, Fiction প্রভৃতি উপন্যাসের শ্রেণী ভাগ করা হইয়াছে—তাহার প্রত্যেকটি পর্যায়ের রচনারই পার্থক্য দেখানো হয়।

বাংলার উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর মাধ্যমেই আমরা সার্থক উপন্যাস লাভ করিয়াছি। তাঁহার হাতেই বাংলা উপন্যাস একেবারে পূর্ণযৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্যলাভ করিয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাস লইয়া আলোচনা করিতে গেলে আমাদের কাল হইতে কিছুটা পিছনে যাইতে হইবে। কারণ বর্তমান কালের বাস্তব প্রবণতা—উপন্যাস সম্বন্ধে 'আমাদের রুচি ও আদর্শের' যে পরিবর্তন ঘটাইয়াছে তার ভিত্তিতে বঙ্কিমের উপন্যাস বিচার করিতে গেলে অবিচারই হইবে। তবে তাঁর 'সমস্ত উপন্যাসের উপরেই একটা বৃহত্তর মতের ছাপ বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।'

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। উপন্যাসটির ভূমিকাতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই।··· দেবী চৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বাধিত হইব।' কিন্তু আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন, 'যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ দেবীচৌধুরাণীর সামাজিক আবহাওয়া একেবারে সত্য।' তাঁহার মতে, 'দেবীচৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাসপর্যায় ভুক্ত করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগকে আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক রূপটি যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তবুও আচার্য যদুনাথ উপন্যাসখানিতে 'তথ্যের একান্ত অভাবে'র কথা বলিয়া পরক্ষণেই বলিয়াছেন—'কিন্তু এই জাতীয় কচকচির উপর কোনো মহা-কাব্যের মূল্য একেবারেই নির্ভর করে না।'আনন্দমঠ' 'সীতারাম' ও 'দেবী চৌধুরাণীতে' বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য রচনা করিতে বসিয়াছিলেন—রাজসিংহ এ তিনটি অপেক্ষা অনেক অধিক ঐতিহাসিক হইলেও তাহাকে কাব্য বলা ভুল হইবে, যদি কাব্য বলিতে জীবনের অন্তস্থলের পর্যালোচন, 'a criticism of life' (ম্যাথু আর্নল্ডের ব্যাখ্যা) বুঝি। এই তিনখানি মহাগ্রন্থে ইতিহাস লেখা, এমন কি ঐতিহাসিক দৃশ্যপট আঁকা পর্যন্ত বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না। মানব হৃদয়কে দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত করা, তাহাকে ঊর্ধ্বতম স্তরে তুলিয়া দেওয়া, এ ক্ষেত্রে ইহাই ছিল তাহার প্রতিভার কাজ।'

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই উপন্যাসে ধর্মসমস্যার প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে 'রোমান্সের আতিশয্য' লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি Novel ও Romance-এর পার্থক্য দেখাইতে গিয়া বলেন,

'Novel অবিমিশ্র ভাবে বাস্তব ; ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনু রাগ সমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প।···Romance-এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরনের ; ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে।' অধ্যাপক প্রবরের মতে 'দেবীচৌধুরাণীর উপাখ্যানের মধ্যে অসাধারণত্বের ঈষৎস্পর্শ থাকিলেও, ইহাতে বাস্তবতারই প্রাধান্য।'

বিভিন্ন সমালোচক উপন্যাসখানিকে যে শ্রেণীভুক্ত করুন না কেন—বঙ্কিমচন্দ্র যে অনুশীলনতত্ত্ব লইয়া আবিষ্ট ছিলেন, তাহাকেই যে এই উপন্যাসে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সকলেই স্বীকার করেন। এই তত্ত্ব—সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা—প্রযুক্ত হইলে কি তার পরিণতি হইতে পারে—জীবনের মধ্যে নিষ্কাম ধর্মকে গ্রহণ করিয়া নিষ্কামকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া কতখানি সার্থকতা লাভ করা যায়—উপন্যাস-খানিতে তাহার বর্ণনা বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষিত হয়। কিন্তু এই তত্ত্বকথা উপন্যাসখানির বাস্তবতাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। ইহাতে তত্ত্ব আসিয়াছে, জীবনের নানা সূক্ষ্ম অনুভূতির সমাবেশ ঘটিয়াছে, রোমান্সের রহস্যলোকের আলো-আঁধারি রূপটি ধরা পড়িয়াছে, সর্বোপরি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বাস্তব চিত্রও রহিয়াছে। বৈরাগ্য, পরহিতব্রত এক কথায় নিষ্কামধর্মকর্ম পারিবারিক জীবনকে ঢাকিয়া ফেলে নাই। বরং পারিবারিক জীবনে নিষ্কামকর্মের সার্থক প্রয়োগ ঘটাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিত্য বিড়ম্বিত পারিবারিক জীবনের উপর প্রশান্তির স্নিগ্ধছায়া সম্পাত ঘটাইয়াছেন।

উপন্যাসের ঘটনাকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথমার্ধ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরের ক্লান্তক্লিষ্ট বাংলা। এরই পটভূমিকায় দেবীচৌধুরাণী নামক একজন নারীর আদ্যোপান্ত কাহিনী। কাহিনীটির আরম্ভ বাস্তব প্রফুল্লর হতভাগ্য জীবন লইয়া—তারপর ভবানী ঠাকুরের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত দেবীচৌধুরাণীর কাহিনী বাস্তব ও রোমান্সের মিশ্র ফল। পরিশেষে দেবীচৌধুরাণীর আবার চিরন্তন নারী প্রফুল্লে রূপান্তর। ইতিহাসের একটি বিশেষ কালের এই কাহিনী বাস্তব ও রোমান্সের মিশ্রণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই উপন্যাসে ইতিহাস আছে, ইতিহাসের মানুষ আছে, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কথা আছে, সামাজিক মানুষের কাহিনী আছে। সব মিলিয়া দেবী চৌধুরাণী একখানি তত্ত্ব ভিত্তিক ও পরিবারকেন্দ্রিক সামাজিক উপন্যাস—যাহার শিল্পরূপে ঐতিহাসিক রোমান্সের রং ধরানো হইয়াছে।

২। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের তাত্ত্বিক ভিত্তি—অনুশীলন—ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন। কিন্তু উপন্যাসে মানবিকতা এই তত্ত্বকে অতিক্রম করিয়াছে।'—এই মন্তব্যের আলোচনা কর।

[উত্তরসংকেত : গ্রন্থভূমিকা ১৯-২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

৩। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে যে প্রকৃতি চিত্র পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা নৈপুণ্যের আলোচনা কর।

[উত্তরসংকেত : গ্রন্থভূমিকা ১২—১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শব্দালেখ্য অঙ্কনে বঙ্কিমের সমকক্ষ বিরল। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে তিনি যে চিত্রগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিদগ্ধ শিল্পীমনের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতি বর্ণনার সার্থক দৃষ্টান্ত কপালকুণ্ডলাতেও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।]

৪। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

[উত্তরসংকেত : গ্রন্থভূমিকা ২৭—৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৫। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের নামকরণ কতখানি সার্থক হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখাও।

[উত্তরসংকেত : গ্রন্থভূমিকা ৩৪—৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৬। 'দেবী চৌধুরাণী' খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস না হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক উপাদান বিরল নয়।—আলোচনা কর।

[উত্তরসংকেত : গ্রন্থভূমিকা-১৬—১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৭। "অনেকের মতে" "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে বাস্তবতার দাবী স্বীকার করা হয় নাই।"—এই অভিমত কতখানি যুক্তিযুক্ত আলোচনা করিয়া দেখাও।

[উত্তরসংকেত : গ্রন্থ ভূমিকা ৩০—৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৮। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে যে সামাজিক পরিবেশ চিত্রিত হইয়াছে—তাহার বর্ণনা দিয়া রসগ্রাহী আলোচনা কর।

[উত্তরসংকেত : গ্রন্থভূমিকা ১০—১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

৯। প্রফুল্ল চরিত্রের বিশদ আলোচনা কর।

[উত্তরসংকেত : গ্রন্থভূমিকা ৪০—৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

১০। ব্রজেশ্বর ও ভবানী পাঠক চরিত্র দুইটির বিশদ আলোচনা কর।

[উত্তরসংকেত : গ্রন্থভূমিকায় ব্রজেশ্বর (পৃ ৪৪—৪৫) এবং ভবানীপাঠক (পৃঃ ৪৭) চরিত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

১১। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির আলোচনা কর।

[উত্তরসংকেত : গ্রন্থভূমিকায় হরবল্লভ, রঙ্গরাজ, দুর্লভ চক্রবর্তী, ব্রজেশ্বরের মাতা, নয়ান বৌ, সাগরবৌ, গোবরার মা, দিবা ও নিশি চরিত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য। চরিত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া অপ্রধান চরিত্র চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্রের নৈপুণ্যের আলোচনা করিতে হইবে।]

১২। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে 'শিল্পী বঙ্কিমের মানবজীবন বোধ ও আধ্যাত্মিক রস-পিপাসার অনিরুদ্ধ দৃষ্টির সার্থক ও সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসখানির কাব্যধর্মিতা ও নাটকীয়তাও অসামান্য'।—আলোচনা কর।

উঃ—উপন্যাসকে যুগপৎ মানবজীবন কাব্য ও মানবজীবন ইতিহাস বলা যায়। কেহ কেহ ইহাকে মানবজীবন-ভাষ্য আখ্যা দিয়াছেন। মানবজীবনের নানা সমস্যা—তার সুখদুঃখ বেদনাজড়িত ক্ষণগুলি—তার সার্থকতা ও ব্যর্থতা, দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রভৃতি উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। মানবজীবন সম্পর্কিত সমস্যার ব্যাপারে লেখক সচেতন থাকুন আর নাই থাকুন—উপন্যাসে তাহা অনিবার্যভাবেই দেখা দিবে। বিদেশী সমালোচকের মতে—'Directly or indirectly and whether the writer himself is conscious of it or not, every novel must necessarily present certain view of life and of some problems of life...' প্রত্যেক মহৎ রচনাতেই রচয়িতার সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক নিজের সুবিধামতো রচনার উপাদান ও উপকরণ সাজাইয়া নিতে পারেন। তবে তাঁহার সকল সময় মনে রাখিতে হইবে—Art grows out of life ; it is fed by life, it reacts upon life......As he deals with life, he must deal with the moral facts and issues everywhere involved in life ; and it is upon his moral power and insight, upon the whole spirit and tendency of his philosophy, that real greatness of his work very largely depends.' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনাকালে এই মন্তব্যগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কাব্যধর্মিতা ও নাটকীয়তার অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবি সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ের মতে, 'বঙ্কিমচন্দ্র কবি ; গদ্যের ক্ষেত্রে লেখনী পরিচালনা করিয়া থাকিলেও তাহার রচনায় কবিত্বশক্তি—কল্পনার দীপনী ও রসনী শক্তি—অসাধারণ।' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে শশাঙ্কমোহনের মন্তব্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার মতে, 'যাঁহারা উপন্যাসকেও একটা সাহিত্য-শিল্প বলিয়া মনে করেন, অর্থের গভীরতা, আদর্শের নৈতিক অভ্যুন্নতি, রচনার সৌষ্ঠব-সামঞ্জস্য এবং মিতাচার, রসের ঘনতা ও আন্তরিকতা, চরিত্রের সৃষ্টি

এবং ঘটনা সংস্থানের নৈপুণ্য হিসাব করিয়া যাঁহারা উপন্যাসের বিচার করেন, তাঁহাদের চক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলিয়া পরিচিত হইতে বিলম্ব হইবে না। সাধারণ গল্পকথকের ন্যায়, কেবল ভূয়োদর্শন, পুঞ্জীকরণ বা আমোদনের প্রণালীই তাহার শরণ্য ছিলনা।......বঙ্কিমের সৃষ্টি প্রাকৃতের অনুকরণ মাত্র নহে—তদপেক্ষা অনেক বড়—উহা শিল্পীর উদ্দেশ্যযুক্ত সংস্করণ।' কবি সমালোচক মোহিতলালের মতে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি 'এক ধরনের উচ্চাঙ্গের কাব্য; উহাতে যে কবি কল্পনা আছে তাহা মানব জীবনের নরনারী চরিত্র ও পুরুষ ভাগ্যের অতি গভীরে দৃষ্টিপাত করিতেছে; কেবল কাব্যরস সৃষ্টিই উহাদের লক্ষ্য নয়, মানবজীবনের যত কিছু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা—যে সমস্যা শক্তিমান পুরুষ মাত্রেরই জীবনে কোন না কোনোরূপে উদ্ভূত হয়—সেই সমস্যাকে তেমনই উচ্চ ও গভীর দৃষ্টিতে ভেদ করিবার প্রয়াস উহাতে আছে। ...উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই একটা আধ্যাত্মিক পিপাসা নরনারী হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে এমন একটা কিছুর সন্ধান করিতেছে, যাহাতে এই জীবনের একটা অর্থ করিতে পারা যায়।'' 'দেবী চৌধুরাণী' আলোচনা কালে এই মন্তব্যগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে।

আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম—এই তিনখানি উপন্যাস একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রচিত। উপন্যাসগুলি রচনার সময়ে বঙ্কিম অনুশীলন তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছেন। এই সময়েই তিনি 'বাঙালীর ইতিহাস', 'বাঙালীর গৌরব' আবিষ্কারে প্রয়াসী। উল্লিখিত উপন্যাসগুলি 'ত্রয়ী' বলিয়া খ্যাত। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিমের প্রচারধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকায় বঙ্কিম স্বাদেশিকতার ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিতে থাকেন। উহার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, আদর্শ হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা। তাঁহার মতে, হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে গীতার নিষ্কাম ধর্ম বা কর্মযোগ, আর ইহাই আসলে অনুশীলন বা কালচারের মূল কথা। বঙ্কিমচন্দ্র 'অনুশীলন তত্ত্ব' 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতিতে ইহার ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। ইহারই শিল্পরূপ আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামে। এই সঙ্গে বাংলার কলঙ্কমোচনও বঙ্কিমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 'দেবীচৌধুরাণীতে' তিনি বলিতে চাহিয়াছেন,—'দেশ ও সমাজ এই দুয়ের কল্যাণসাধন নিষ্কাম কর্মের সাধনা বটে, তাহাতেই মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা; কিন্তু কর্মের ছোট-বড় নাই—তাহাতে ঘনঘটা বা বীরত্বাভিমান নিষ্প্রয়োজন; বিশেষ বাঙালীর পক্ষে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম গার্হস্থ্য জীবনেই পালনীয়—সেই গৃহধর্ম পালনেই, গীতোক্ত কর্মযোগ সাধনার অবকাশ আছে।' 'এই উপন্যাসে বঙ্কিম একটা বড় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন—মহাশক্তির অংশ যে নারী, তাহাকেই গৃহ সংসারে ক্ষুদ্র-

জগতের জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা তো বটেই—অধিকন্তু তাহাকে অনুশীলনের দ্বারা গীতাধর্মের শরীরী বিগ্রহরূপে গড়িয়া লইয়াছেন।' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' প্রবন্ধে বলেন, 'দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার Culture বা অনুশীলনতত্ত্বের সাহায্যে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবার ground বা চিত্রের ক্ষেত্র রচিবার প্রয়াসটা বেশ সুপরিস্ফুট। দেবী চৌধুরাণীর ক্ষেত্র অতি সুন্দর না হইলেও মনোহর বটে। দেবীচৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তিমূর্তি—কমলা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে অথচ তিনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব বৈষ্ণব ঠাকুরাণী'।

দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে যেমন তত্ত্বকথা আছে—তেমনই শিল্পীর জীবনে জিজ্ঞাসা ও রস পিপাসার সার্থক পরিচয়ও বিধৃত। একদিকে দেশ ও সমাজ—জাতীয় জীবনের নানা দুঃখ বেদনার করুণ উজ্জ্বল দিক—অন্যদিকে মানব জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা—দুইই এই উপন্যাসে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল গল্প বলিতে বসেন নাই—তিনি গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে মনের মতো মানুষ গড়ার চেষ্টাও করিয়াছেন। অনেকে এই দুয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াছেন। শিল্প রচনা ও জাতীয় জীবন গঠন করিতে গিয়া বঙ্কিম 'গোলে পড়িয়াছেন' বলিয়া অনেকের মনে হইয়াছে। বাঙ্গালীর জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানুষ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তার বন্ধ্যাত্ব যে কখনও ঘুচিবেনা—এই আশঙ্কা শিল্পীর রচনাকে কিয়ৎপরিমাণে প্রচার-ধর্মী করিয়াছে—এবং তা করা অস্বাভাবিক নয়। একটা মহৎ তত্ত্বকে জীবনে সার্থক-ভাবে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা এবং তাহাকে শিল্পরূপ দিয়া সার্থক করিয়া তোলার প্রয়াস সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার। বঙ্কিম যে অনুশীলন তত্ত্ব প্রচার করিতে থাকেন—দেবী-চৌধুরাণী তাহারই শিল্পরূপ। জীবনকে সমুন্নত বলিষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জীবনকে ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ না রাখিয়া তাহাকে ঘরে বাইরে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্রতে বঙ্কিম ব্যর্থ হন নাই। আমাদের এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বঙ্কিম শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের জন্য গল্প বলিতে বসেন নাই। জাতীয় জীবনকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করাও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি—একথা তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন নাই। জাতিকে তার অখ্যাতি হইতে সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মহান দায়িত্বও তাঁহাকে পালন করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য—তাহার জন্য তিনি এই উপন্যাসে শিল্পকে কিছুটা উদ্দেশ্যমূলক করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে রচনার কাব্যধর্মিতা বা নাটকীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরং যুগপৎ মানবজীবন জিজ্ঞাসার একটা উত্তর দিবার প্রয়াস এবং শিল্পরস পিপাসা ও আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার সার্থক আলেখ্য এই উপন্যাসে মিলে।